সাধারণ বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ
থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

সাধারণ বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণী

রচনা

ড. আ.খ.ম শামসুদ্দোহা
ড. মোঃ গোলাম রসুল মিয়া
ড. মোঃ আব্দুল ওহাব
জহুরুল ইসলাম খান

সম্পাদনা

ড. হাফেজ আহমেদ
মুহম্মদ এলতাস উদ্দিন
জাহান আফরোজ বেগম হাবিবা
ড. সিরাজুল হক

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯–৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারি, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর ২০০০
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ :

কম্পিউটার কম্পোজ
ফাইন ডট লিঃ

প্রচ্ছদ
সেলিম আহ্‌মেদ

চিত্রাঙ্কন
রনজিত দাস
মনিরুজ্জামান শিপু
নাসির বিশ্বাস

মানচিত্রাঙ্কন
গ্রাফোসম্যান

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষা, আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য "শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স" গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে কোনো বিষয়কে বিচার–বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন। বিজ্ঞান শিক্ষা শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছ ও যুক্তিসংগত চিন্তা করতে ও নিজ হাতে কাজ করার দক্ষতা অর্জনে সহায়তা দান করে। সাধারণ বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষাক্রমের সাধারণ উদ্দেশ্য ও শিখনফলের আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। পুস্তকটিতে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, ভূগোল ও জনসংখ্যা শিক্ষার বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আশা করা যায় শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের এ সকল শাখার বিষয়বস্তুর তত্ত্বীয় জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক দক্ষতাগুলোও অর্জন করতে সক্ষম হবে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যে–কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম–১০ম শ্রেণীর ৬০টি পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করে সময়মতো পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি–বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	পরিমাপ	০১
দ্বিতীয়	পদার্থ	১৩
তৃতীয়	বায়ু	২২
চতুর্থ	ধাতু ও অধাতু	৩২
পঞ্চম	পানি	৩৯
ষষ্ঠ	জীব জগৎ	৪৬
সপ্তম	কোষ : জীব দেহের একক	৫৬
অষ্টম	উদ্ভিদ জগৎ	৬১
নবম	উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান	৭১
দশম	বল, চাপ ও গতি	৮৩
একাদশ	কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি	৯২
দ্বাদশ	বিদ্যুৎ শক্তি	৯৯
ত্রয়োদশ	চুম্বক শক্তি	১০৭
চতুর্দশ	ভূপৃষ্ঠ	১১৩
পঞ্চদশ	অমেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি : চিংড়ি	১১৯
ষোড়শ	মানব দেহ : ত্বক, পেশী ও অস্থি (কঙ্কাল)	১২৪
সপ্তদশ	স্বাস্থ্যবিধি : চর্মরোগ	১৩১
অষ্টাদশ	খাদ্য ও পুষ্টি	১৩৭
ঊনবিংশ	জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ	১৪৪
বিংশ	এইডস পরিচিতি	১৫০

প্রথম অধ্যায়

পরিমাপ

তোমার উচ্চতা কত? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে একটি মাপার ফিতা বা মাপকাঠি দিয়ে তোমার উচ্চতা মাপতে হবে। তোমার ওজন কত? এর উত্তর দিতে হলেও একটি ওজন মাপার যন্ত্র দিয়ে তোমার ওজন মাপতে হবে। এখন সময় কত? ঘড়ি দেখে তার উত্তর দিতে হবে। তিনটি উত্তরই দিতে তোমাকে যা করতে হয়েছে তা হচ্ছে পরিমাপ। প্রথমবার পরিমাপ করতে হয়েছে তোমার উচ্চতা, দ্বিতীয়বার তোমার ওজন এবং তৃতীয়বার সময়। উত্তর তিনটি এ রকম হতে পারে– উচ্চতা ১$\frac{১}{২}$ মিটার, ওজন ৪০ কি. গ্রাম, সময় সকাল ১১টা। খেয়াল করলে দেখবে তিনটি উত্তরই কোনো না কোনো সংখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে। এই রকম কোনো কিছু মাপা এবং তা সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করাকেই বলে পরিমাপ।

বিজ্ঞান শিক্ষায় পরিমাপ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই অধ্যায়ে আমরা দৈর্ঘ্য, ভর ও সময় পরিমাপ সম্পর্কে জানব।

পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা

যদি প্রশ্ন করা হয়, একটি ফুটবল বড় না একটি ক্রিকেটবল বড়? তুমি সাথে সাথে জবাব দিবে, ফুটবল বড়। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, ফুটবল বড় না ভলিবল বড় অথবা একটি ক্রিকেট বল বড় না একটি টেনিস বল বড় এবং কত বড়? তখন অত সহজে জবাব দেওয়া যাবে না, প্রয়োজন হবে পরিমাপের। চিত্র ১.১ এতে 'ক' ও 'খ' দুটি সরলরেখা রয়েছে। কোন রেখাটি বেশি লম্বা জিজ্ঞেস করলে তুমি হয় 'ক' অথবা 'খ' রেখাটি বেশি লম্বা বলবে। এবার কিছু দিয়ে মেপে দেখ। দেখবে তোমার অনুমান ঠিক নয়। দুটি রেখার দৈর্ঘ্যই সমান।

সুতরাং আমরা যা দেখি বা অনুমান করি তা অনেক সময় ভুল ধারণা দিতে পারে। সঠিক মান বা পরিমাণ জানতে হলে পরিমাপের প্রয়োজন।

দৈনন্দিন জীবনেও সকল মানুষেরই কিছু না কিছু পরিমাপ করার প্রয়োজন হয়। আমরা যা খাই, যা পরি, যে কাজ করি বা খেলাধুলা করি, তার সাথে পরিমাপ জড়িত। তুমি চাল, ডাল কিনতে চাও–ওজন করে কিনতে হবে। জামা বানাতে চাও–দর্জির কাছে মাপ দিতে হবে। স্কুলের দপ্তরি সময় দেখে ছুটির ঘণ্টা দেয়। ফুটবল মাঠের সীমানা মেপে ঠিক করতে হয়। কেনাবেচা করতে গেলে জমি মাপতে হয়। বাড়িঘর তৈরি করতে, ওষুধ প্রস্তুত করতে প্রয়োজন হয় বিভিন্ন জিনিস পরিমাপ করার। এক কথায়, দৈনন্দিন জীবনে প্রায় প্রতিটি কাজেই প্রয়োজন রয়েছে পরিমাপের।

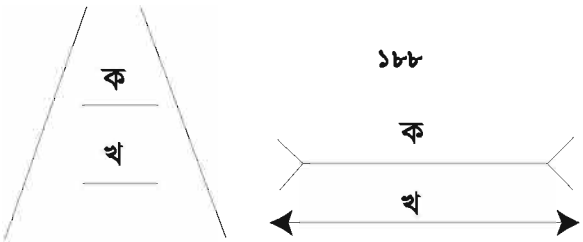

চিত্র ১.১: কোন রেখাটি বেশি লম্বা?

পরিমাপের একক

তোমার স্কুলের একটি বেঞ্চের দৈর্ঘ্য তোমার হাত দিয়ে মাপ। ধর, চার হাত হল। এর অর্থ কী? এর অর্থ হল তোমার হাতের দৈর্ঘ্যের তুলনায় বেঞ্চটির দৈর্ঘ্য চারগুণ। তোমার হাতের দৈর্ঘ্য কতটুকু তা জানা। এখানে হাত হচ্ছে দৈর্ঘ্যের একক। অর্থাৎ যে জানা ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যের সাথে তুলনা করে একটি অজানা দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয় তাকে দৈর্ঘ্যের একক বলে।

একই রকম কোনো বস্তুর ভর ৪০ কিলোগ্রাম বলতে বোঝায় যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্তুর ভরকে এক কিলোগ্রাম হিসেবে ধরা হয়েছে এবং বস্তুটির ভর এই নির্দিষ্ট ভরের ৪০ গুণ। এখানে কিলোগ্রাম ভরের একক।

সাধারণভাবে কোনোকিছু পরিমাপ করতে হলে, যা পরিমাপ করতে হয় তার একটি নির্দিষ্ট অংশকে আদর্শ হিসেবে ধরা হয়। দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য একটি সুবিধাজনক নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য, ভর পরিমাপের জন্য একটি সুবিধাজনক নির্দিষ্ট ভর এবং সময় পরিমাপের জন্য একটি সুবিধাজনক নির্দিষ্ট সময় আদর্শ হিসেবে ধরা হয়। এই জানা আদর্শ অংশের

মানকেই একক বলা হয়। নিজ নিজ এককের সাথে তুলনা করে অজানা কোনো দৈর্ঘ্য, ওজন বা সময় পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ যে নির্দিষ্ট আদর্শ মান বা পরিমাণের সাথে তুলনা করে কোনো কিছু পরিমাপ করা হয় তাকে পরিমাপের একক বলে। পরিমাপ একটি সংখ্যা ও একটি একক দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে পরিমাপের বিভিন্ন একক ব্যবহৃত হয়েছে। আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে মিসরিয়রা দৈর্ঘ্য মাপত হাত দিয়ে। হাতের কনুই থেকে মধ্য আঙুলের ডগা পর্যন্ত দৈর্ঘ্যকে ধরা হত এক হাত। এই পদ্ধতি এখনো কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে। আমাদের দেশেও কখনো কখনো তা ব্যবহার করা হয়।

রোমান বা ইংরেজরা পূর্ণবয়স্ক মানুষের হাতের বুড়ো আঙুলের প্রস্থকে এক ইঞ্চি, পায়ের পাতার দৈর্ঘ্যকে এক ফুট (যা প্রায় ১২ ইঞ্চির সমান) হিসেবে ধরত। মাথা সোজা রেখে হাত পাশে প্রসারিত করে নাকের ডগা থেকে হাতের মধ্য আঙুলের মাথা পর্যন্ত দৈর্ঘ্যকে এক গজ ধরা হত। কিন্তু মানুষের অঙ্গ বিশেষের উপর ভিত্তি করে এই ধরনের পরিমাপ সঠিক হতে পারে না। কারণ সকল মানুষের দৈর্ঘ্য সমান নয়।

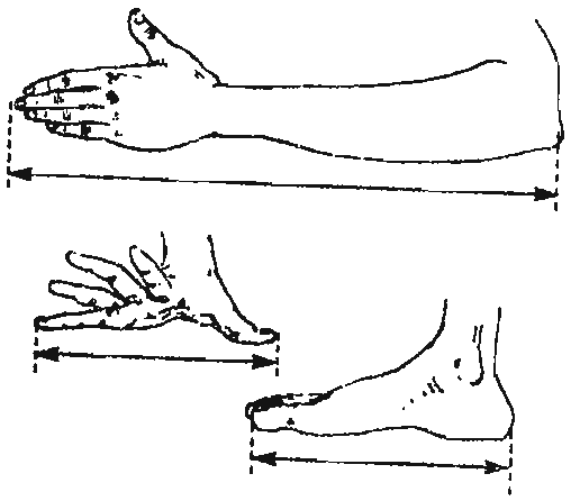

চিত্র ১.২ : মানুষের অঙ্গ ভিত্তিক পরিমাপ

আমাদের দেশে ধান–চাল মাপার জন্য অনেক সময় ব্যবহার করা হয় নির্দিষ্ট আকারের কাঠাপাত্র। আবার সোনা–রূপা ওজন করার জন্য ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন মানের মুদ্রা। এক টাকার মুদ্রাকে যেমন ধরা হত এক তোলা ওজন হিসেবে। সময় পরিমাপের জন্য প্রাচীনকালে ব্যবহার করা হত কোনো বস্তুর ছায়াকে। সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। একটা গাছ বা খুঁটির ছায়া তাই সকালে পশ্চিম দিকে পড়ে। বেলা যত বাড়তে থাকে ছায়ার দৈর্ঘ্য তত ছোট হতে থাকে। দুপুরের পর সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে গেলে ছায়া পূর্বদিকে পড়ে। অতএব, ছায়ার অবস্থান এবং দৈর্ঘ্য দেখে সময়ের মোটামুটি একটা হিসাব করা যায়। তবে তা ঠিক হয় না। বিশেষ করে রাতে বা মেঘলা দিনে এভাবে সময় হিসাব করা যায় না। অতএব, সঠিক পরিমাপের জন্য একক এমন হওয়া প্রয়োজন যা কোনো বিশেষ মানুষ বা সময়ের উপর নির্ভর করে না। সব সময় সকল মানুষের কাছেই যার মান নির্দিষ্ট।

কিছুদিন আগেও পৃথিবীতে পরিমাপের প্রধানত দুইটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল· ব্রিটিশ পদ্ধতি এবং মেট্রিক পদ্ধতি। ব্রিটিশ পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের এককের নাম ফুট, ভরের এককের নাম পাউন্ড এবং সময়ের এককের নাম সেকেন্ড। সেইজন্য এই পদ্ধতিকে ফুট, পাউন্ড, সেকেন্ড পদ্ধতি বা এফ.পি.এস পদ্ধতিও বলে।

মেট্রিক পদ্ধতি আবার দুই প্রকার· সেন্টিমিটার, গ্রাম, সেকেন্ড বা সি.জি.এস পদ্ধতি এবং মিটার, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড বা এম.কে.এস পদ্ধতি। সেন্টিমিটার এবং মিটার দৈর্ঘ্যের একক, গ্রাম এবং কিলোগ্রাম ভরের একক এবং সেকেন্ড সময়ের একক।

পরিমাপের বিভিন্ন রকম এককের পদ্ধতিতে অনেক অসুবিধা হয়। যেমন, তুমি হয়তো দোকানে যেয়ে ১০ কিলোগ্রাম চাল চাবে। আর একজন এসে ২০ পাউন্ড চাল চাবে। দোকানিকে সেজন্য দুরকম বাটখারা রাখতে হবে। দুইভাবে দামের হিসাব করতে হবে। কিলোগ্রাম এবং পাউন্ডের মধ্যে সম্পর্ক কী তা জানতে হবে। আবার আমাদের দেশের এক ব্যবসায়ী হয়তো বিদেশ থেকে কাপড় আমদানি করতে চায়। সে গজ হিসাবে কাপড় কিনতে চাইলো। বিদেশীরা বললো, আমরা তো গজ চিনি না। আমরা মিটার হিসাবে কাপড় বিক্রি করি। এই ধরনের কোনো অসুবিধা হয় না যদি সকল দেশেই এককের একটি মাত্র পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তাই বিশ্বের সকল দেশের বিজ্ঞানীরা ১৯৬৮ সালে

ফ্রান্সের প্যারিস শহরে মিলিত হয়ে সকল দেশের জন্য একটি মাত্র এককের পদ্ধতি চালু করার বিষয়ে একমত হন। পরিমাপের এককের এ পদ্ধতির নাম আন্তর্জাতিক পদ্ধতি (সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল বা সংক্ষেপে এস.আই পদ্ধতি)। এস.আই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ভর এবং সময়ের একক যথাক্রমে মিটার, কিলোগ্রাম এবং সেকেন্ড। অর্থাৎ এম. কে. এস পদ্ধতির মতোই। সমগ্র বিশ্বে এখন আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বিশেষত বৈজ্ঞানিক কাজে বাংলাদেশেও এ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

মৌলিক একক ও লব্ধ একক

দৈর্ঘ্য, ভর এবং সময়ের একক অন্য কোনো এককের ওপর নির্ভর করে না। এদের এককে মৌলিক একক বলে। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে মৌলিক একক মোট সাতটি। যথা (১) দৈর্ঘ্যের একক, (২) ভরের একক, (৩) সময়ের একক, (৪) বিদ্যুৎ প্রবাহের একক, (৫) তাপমাত্রার একক, (৬) আলোর ঔজ্জ্বল্যের একক এবং (৭) বস্তুর পরিমাণের একক। আমরা এই অধ্যায়ে শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের একক নিয়ে আলোচনা করব। মৌলিক একক ছাড়া, অন্য সব এককই একটি মৌলিক এককে আরেকটি মৌলিক একক দিয়ে গুণ অথবা ভাগ করে পাওয়া যায়। এই এককে লব্ধ একক বলে। অর্থাৎ মৌলিক একক ছাড়া আর সব এককই লব্ধ একক। যেমন, ক্ষেত্রফল বা আয়তনের একক। ঘরের দৈর্ঘ্যকে প্রস্থ দিয়ে গুণ করে ঘরের মেঝের ক্ষেত্রফল পাওয়া যায়। দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ উভয়েরই একক এস.আই পদ্ধতিতে মিটার। অতএব, ক্ষেত্রফলের একক=দৈর্ঘ্যের একক x প্রস্থের একক = মিটার x মিটার বা বর্গমিটার, যা একটি লব্ধ একক।

দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের একক (আন্তর্জাতিক এবং সি.জি.এস পদ্ধতি)

দৈর্ঘ্যের একক : আমরা জেনেছি আন্তর্জাতিক বা এস.আই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের এককের নাম মিটার। কতটুকু দৈর্ঘ্য এক মিটারের সমান সেটা ঠিক করেছেন বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা একসাথে বসে ১৮৭৫ সালে। প্লাটিনাম–ইরিডিয়াম মিশ্রিত ধাতুর তৈরি একটি দণ্ডের দুই মাথার প্রান্তে দুইটি দাগ কাটা হয়। শূন্য ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ঐ দুইটি নির্দিষ্ট দাগের মধ্যকার দূরত্বকে তারা এক মিটার ধরেছেন। এই দণ্ডটি ফ্রান্সের প্যারিস শহরের কাছে সেরে (Sëvres) ওজন ও পরিমাপের আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিসে রাখা আছে। বিশ্বের সকল দেশেই এই আদর্শ দৈর্ঘ্যের সমান করে মাপ নিয়ে মিটারের দৈর্ঘ্য ঠিক করা হয়।

এক মিটার দৈর্ঘ্য কতটুকু সে সম্পর্কে তোমার হয়তো ধারণা আছে। তুমি কাপড় কিনতে গেলে দোকানি যে কাঠের দণ্ড দিয়ে কাপড় মেপে দেয় সেটাই এক মিটার লম্বা। তুমি যদি তোমার শ্রেণীকক্ষের দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ মাপতে চাও তবে তা মিটারে মাপতে পার। কিন্তু যদি ছোট কোনো জিনিসের দৈর্ঘ্য মাপতে চাও তাহলে মিটার দিয়ে মাপতে পারবে না। তার জন্য প্রয়োজন একটি ছোট এককের। এই ছোট এককের নাম সেন্টিমিটার যা এক মিটারের ১০০ ভাগের ১ ভাগ। একইভাবে ভরের ছোট এককের নাম গ্রাম যা এক কিলোগ্রামের ১০০০ ভাগের এক ভাগ। সময়ের একক সব ক্ষেত্রেই সেকেন্ড। এই পদ্ধতির নাম সেন্টিমিটার, গ্রাম, সেকেন্ড পদ্ধতি বা সি.জি.এস পদ্ধতি।

অনেক সময় খুব ছোট অথবা বড় দৈর্ঘ্য মাপার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন একটি তারের ব্যাস বা ঢাকা থেকে দিনাজপুরের দূরত্ব। ছোট বা বড় দৈর্ঘ্য মাপার জন্য মিটারের নানারূপ ভগ্নাংশ বা গুণিতাংশ ব্যবহার করা হয়। এই ভগ্নাংশ বা গুণিতাংশ সবসময় একে অপরের ১০ ভাগ বা ১০ গুণ। এই জন্য এই পদ্ধতিকে দশমিক পদ্ধতিও বলা হয়। মিটারের বিভিন্ন দশমাংশ ও গুণিতাংশ নিচে দেওয়া হল।

১ মিলিমিটার (মি.মি)	=	১/১০০০ মিটার (মি.)	=	১/১০ সেন্টিমিটার (সে.মি.)
১ সেন্টিমিটার (সে.মি.)	=	১/১০০ মিটার (মি.)	=	১/১০ ডেসিমিটার (ডেসি. মি.)
১ ডেসিমিটার (ডেসি. মি.)	=	১/১০ মিটার (মি.)		
১ ডেকামিটার (ডেকা. মি.)	=	১০ মিটার (মি.)		
১ হেক্টা মিটার (হে.মি.)	=	১০০ মিটার (মি.)	=	১০ ডেকামিটার (ডেকা. মি.)
১ কিলোমিটার (কি.মি.)	=	১০০০ মিটার (মি.)	=	১০ হেক্টোমিটার (হে.মি.)

অন্যভাবে বলা যায়

১০ মি. মি.	=	১ সে.মি.
১০ সে.মি.	=	১ ডেসি. মি.
১০ ডেসি. মি.	=	১ মি.
১০ মি.	=	১ ডেকা. মি.
১০ ডেকা মি.	=	১ হেক্টা. মি
১০ হেক্টা. মি.	=	১ কি.মি.

ভরের একক : আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে ভরের এককের নাম কিলোগ্রাম (কি. গ্রা. বা কেজি) প্লাটিনাম ইরিডিয়ামের তৈরি একটি নিরেট ধাতব চোঙের ভরকে বিজ্ঞানীরা এক কিলোগ্রাম হিসেবে ঠিক করেছেন। এই আদর্শ কিলোগ্রাম ভরের চোঙটিও আদর্শ মিটারের দন্ডের সাথে প্যারিসের কাছের একই অফিসে রাখা আছে। মুদির দোকানে কোনো জিনিস কেনার সময় হয়তো তুমি এক কিলোগ্রাম ভরের বাটখারা দেখেছ। আদর্শ কিলোগ্রামের সমান করেই এই বাটখারা তৈরি করা হয়েছে। সিজিএস পদ্ধতিতে ভরের এককের নাম গ্রাম। এক গ্রাম এক কিলোগ্রামের এক হাজার ভাগের এক ভাগের সমান। কিলোগ্রাম ও গ্রামের দশমাংশ ও গুণিতাংশ নিচে দেওয়া হল

১০ মিলিগ্রাম (মি. গ্রাম)	=	১ সেন্টিগ্রাম (সে. গ্রা.);	১ মি. গ্রা.	= ১/১০০০ গ্রাম
১০ সে. গ্রা.	=	১ ডেসিগ্রাম (ডেসিগ্রাম (ডেসি গ্রা.);	১ সে গ্রা.	= ১/১০০ গ্রাম
১০ ডেসি. গ্রা.	=	১ গ্রাম (গ্রা.)	১ ডেসি. গ্রা.	= ১/১০ গ্রাম
১০ গ্রাম	=	১ ডেকা. গ্রাম (ডেকা. গ্রা.)		
১০ ডেকা. গ্রা.	=	১ হেক্টো. গ্রাম	= ১০০	গ্রাম
১০ হেক্টো. গ্রা.	=	১ কিলোগ্রাম (কি. গ্রা.)	= ১০০০	গ্রাম
১০০ কি. গ্রা.	=	১ কুইন্টাল	=১০০, ০০০	গ্রাম
১০ কুইন্টাল	=	১ মেট্রিক টন	=১০০০	কি. গ্রা.

গ্রাম, কিলোগ্রাম, কুইন্টাল ও মেট্রিক টন এ একক গুলো সাধারণত দৈনন্দিন জীবনে বেশি ব্যবহার হয়। সোনা, রুপা, ইত্যাদি কম ভরের জিনিস মাপতে গ্রাম, চাল–ডাল তরিতরকারি মাপতে কিলোগ্রাম ব্যবহার করা হয়। আবার চাল, ধান, রড, সিমেন্ট ইত্যাদি যখন বস্তা বা ট্রাক বোঝাই করতে মাপতে হয় তখন কুইন্টাল বা মেট্রিক টন ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, কোনো জিনিস ছোট না বড়, কম না বেশি, তার ওপর নির্ভর করে মূল এককের ভগ্নাংশ অথবা গুণিতাংশ ব্যবহার করা হয়।

ভর ও ওজনের পার্থক্য:

তোমরা হয়তো ভাবছ কিলোগ্রাম তো আমরা কোনো জিনিসের ওজন মাপার জন্য ব্যবহার করি। কিন্তু এখানে সব সময় ভর মাপার কথা হচ্ছে কেন? ভর মানেই কি ওজন? তোমার মনে এ প্রশ্নটি জাগা খুবই স্বাভাবিক। কারণ সাধারণ অর্থে ভরকে ওজন বলা হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় ভর ও ওজন শব্দ দুইটির অর্থ এক নয়। কোনো বস্তুর মধ্যে কতটুকু পদার্থ রয়েছে তার পরিমাণ হচ্ছে ভর। আর কোনো বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল হচ্ছে তার ওজন। কোনো বস্তুর ভর নির্দিষ্ট। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে গেলে তা পরিবর্তন হয় না। কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণ কোনো জায়গায় বেশি, কোনো জায়গায় কম। তাই একই বস্তুর ওজন এক এক জায়গায় এক এক রকম হবে। তুমি যদি চাঁদে যাও তোমার ভর একই থাকবে। কিন্তু তোমার ওজন প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ হয়ে যাবে। কারণ পৃথিবীর আকর্ষণের তুলনায় চাঁদের আকর্ষণ ছয় ভাগের একভাগ। সুতরাং পরিমাপের কিলোগ্রাম একক যখন ব্যবহার করা হয় তখন কোনো জিনিসের ভরকেই বোঝায়। ওজনের একক ভিন্ন। তোমরা 'বল' এর অধ্যায়ে দেখবে যে ওজনের এককের নাম নিউটন। এক কিলোগ্রাম ভরের কোনো বস্তুর ওজন প্রায় ১০ নিউটন।

সময়ের একক : আন্তর্জাতিক এবং সি.জি.এস দুই পদ্ধতিতেই সময়ের একক সেকেন্ড। সময় দেখা যায় না, ধরা যায় না। তাই সময়ের একক একটু ভিন্নভাবে ঠিক করা হয়।

তোমরা জান পৃথিবী নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এর ফলে দিন–রাত্রি হয়। পৃথিবীর নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে এক বার ঘুরতে যে সময় লাগে তাকে বলে সৌর দিন। সৌর দিনের সময় প্রতি দিন সমান নয়। তাই এক বৎসরে সৌর দিনের গড় নিয়ে সৌরদিন বের করা হয়। ৩৬৫ $\frac{১}{৪}$ সৌর দিনে এক বৎসর হয়। এই সময়ে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসে। গড় সৌর দিনকে ২৪ ভাগ করে যে সময় পাওয়া যায় তাকে বলে ১ ঘণ্টা। ১ ঘণ্টার ৬০ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে এক মিনিট এবং এক মিনিটের ৬০ ভাগের এক ভাগ ১ সেকেন্ড অর্থাৎ–

১ গড় সৌর দিন = ২৪ ঘণ্টা
= ২৪ X ৬০ মিনিট
= ২৪ X ৬০ X ৬০ সেকেন্ড
= ৮৬,৪০০ সেকেন্ড।

সব পদ্ধতিতেই :

৬০ সেকেন্ড = ১ মিনিট
৬০ মিনিট = ১ ঘণ্টা
২৪ ঘণ্টা = ১ দিন = ৮৬,৪০০ সেকেন্ড
৭ দিন = ১ সপ্তাহ
৩০ দিন = ১ মাস
১২ মাস = ১ বছর = ৩৬৫ $\frac{১}{৪}$ দিন

ক্ষেত্রফল, আয়তন ও ঘনত্বের একক

ক্ষেত্রফল : তোমার পড়ার টেবিলটা ছোট। পড়ার ঘরটা তার চাইতে বড়। স্কুলের খেলার মাঠ তার চাইতেও বড়। এ কথাগুলোর মানে কী? এর মানে হচ্ছে তোমার পড়ার টেবিলের ওপরের বা পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল–এর চাইতে ঘরের মেঝের ক্ষেত্রফল বেশি। আবার তার চাইতেও বেশি স্কুলের মাঠের ক্ষেত্রফল। অর্থাৎ–ক্ষেত্রফল হচ্ছে টেবিলের পৃষ্ঠ, ঘরের মেঝে বা স্কুলের মাঠ কতটুকু স্থান দখল করে আছে তাই।

কোনো ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যকে প্রস্থ দিয়ে গুণ করলে সেই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ

ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য x প্রস্থ।

অজানা দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য যেমন জানা একটি দৈর্ঘ্যের সাথে তুলনা করতে হয় তেমন অজানা ক্ষেত্রফল পরিমাপের জন্যও জানা একটি ক্ষেত্রফলের সাথে তুলনা করা হয়। এই জানা ক্ষেত্রফল হচ্ছে একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যার প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য এক মিটার। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে এই জানা আদর্শ ক্ষেত্রফল হচ্ছে ক্ষেত্রফলের একক। এই এককের নাম বর্গমিটার। অর্থাৎ–

১ বর্গ মিটার = ১ মিটার x ১ মিটার

সি.জি.এস পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফলের একক হচ্ছে বর্গ সে. মি.। এক বর্গ সে. মি. হচ্ছে এক সে. মি. বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান। অর্থাৎ

১ বর্গ সে. মি. = ১ সে. মি. x ১ সে. মি.

ছোট কোনো ক্ষেত্র মাপার জন্য এই এককের ভগ্নাংশ ব্যবহার করা হয়। আবার খুব বড় ক্ষেত্রের জন্য এই এককের গুণিতাংশ ব্যবহার করা হয়। যেমন

১ বর্গ মি. মি. = ১ মি.মি. x ১ মি. মি.

= $\frac{১}{১০}$ সে. মি. x $\frac{১}{১০}$ সে. মি. = $\frac{১}{১০০}$ বর্গ সে. মি.

১ বর্গ কি. মি. = ১ কি.মি. x ১ কি.মি.

= ১০০০ মি. x ১০০০ মি. = ১০,০০,০০০ বর্গ মি.

কোনো দেশের ক্ষেত্রফল বর্গ কি. মি. এ প্রকাশ করা হয়। যেমন বাংলাদেশের ক্ষেত্রফল ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি.।

পরীক্ষা : এক খন্ড কাগজ, একটি মাপার স্কেল এবং একটি পেন্সিল নাও। চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে সে রকম একটি আয়তক্ষেত্র আঁক (কখগঘ)। যার দৈর্ঘ্য ১০ সে.মি এবং প্রস্থ ৭ সে.মি.।

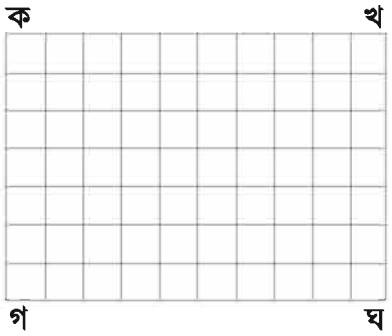

চিত্র ১.৩ ঃ বর্গ খোপের সাহায্যে ক্ষেত্রফল নির্ণয়

আড়াআড়ি এবং লম্বালম্বি ১ সে. মি. দূরে দূরে লাইন টান। প্রতিটি বর্গক্ষেত্রাকার খোপের ক্ষেত্রফল হল ১ বর্গ সে. মি.। কখগঘ আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত?

আয়তক্ষেত্রে মোট কতটা খোপ রয়েছে গুণে দেখ। আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যকে প্রস্থ দিয়ে গুণ কর। উভয় ক্ষেত্রেই দেখবে ফল = ৭০। অর্থাৎ–আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল ৭০ বর্গ সে. মি.। আরও দেখবে যে দৈর্ঘ্যকে প্রস্থ দিয়ে গুণ করলে একই ফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ

আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য x প্রস্থ।

আয়তনের একক : একটি দিয়াশলাই এর বাক্সের চাইতে একটি ইট বড়। এর অর্থ এই যে একটি দিয়াশলাই এর বাক্স যতটা জায়গা দখল করে, একটি ইট তার চাইতে বেশি জায়গা দখল করে থাকে। প্রত্যেক বস্তুই কিছু না কিছু জায়গা দখল করে। কোনো বস্তু যে জায়গা দখল করে তাকে বলে তার আয়তন। একটি ইটের আয়তন একটি দিয়াশলাই এর বাক্সের আয়তনের চাইতে বেশি। একটি পানির জগে ছয় গ্লাস পানি ধরে। জগটির আয়তন গ্লাসের আয়তনের ছয়গুণ।

পরীক্ষা : একই মাপের তিনটি দিয়াশলাই এর বাক্স নাও। এর একটি দিয়াশলাই এর বাক্স টেবিলের ওপর রেখে ঠিক তার ওপরে আরেকটি দিয়াশলাই এর বাক্স রাখ। একটি দিয়াশলাই এর বাক্সের আয়তনের তুলনায় দুইটি দিয়াশলাই এর বাক্সের আয়তন দুই গুণ। উচ্চতাও বেড়েছে দুই গুণ। এরপর তৃতীয় দিয়াশলাইটি তার উপরে রাখ। উচ্চতা কত বাড়লো? আয়তন কত বাড়লো? দুটোই বেড়েছে তিনগুণ। দিয়াশলাই এর বাক্সের তলের ক্ষেত্রফল সমান। উচ্চতা যতগুণ বাড়ছে আয়তনও ততগুণ বাড়ছে। অতএব ক্ষেত্রফলকে উচ্চতা দিয়ে গুণ করে বস্তুর আয়তন পাওয়া যায়।

অর্থাৎ

আয়তন = ক্ষেত্রফল × উচ্চতা

∵ [ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ]

= দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে আয়তনের এককের নাম ঘন মিটার। ১ মি. দৈর্ঘ্য, ১ মি. প্রস্থ এবং ১ মি. উচ্চতার একটি

ঘনক্ষেত্র যে স্থান দখল করে তাকে বলে ১ ঘন মিটার।

১ ঘন মি. = ১ মি. × ১ মি. × ১ মি.

সি.জি.এস. পদ্ধতিতে আয়তনের একক ঘন সেন্টিমিটার।

১ ঘন সে. = ১ সে.মি. × ১ সে. মি. × ১ সে. মি.

তরল পদার্থের আয়তন মাপা হয় লিটারে।

১০০০ ঘন সে. মি. সমান ১ লিটার।

একটি সুষম বস্তু, যেমন ইঁট, দিয়াশলাই বা ঘরের আয়তন সহজেই বের করা যায়। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা মেপে গুণ করলেই হল। কিন্তু একটি অসম বস্তু যেমন এক টুকরো পাথরের আয়তন কীভাবে বের করা যায়? এর জন্য মাপচোঙ ব্যবহার করা হয়। মাপচোঙ আয়তনের একককে দাগ কাটা থাকে যার থেকে সরাসরি আয়তন মাপা হয়।

চিত্র : ১.৪

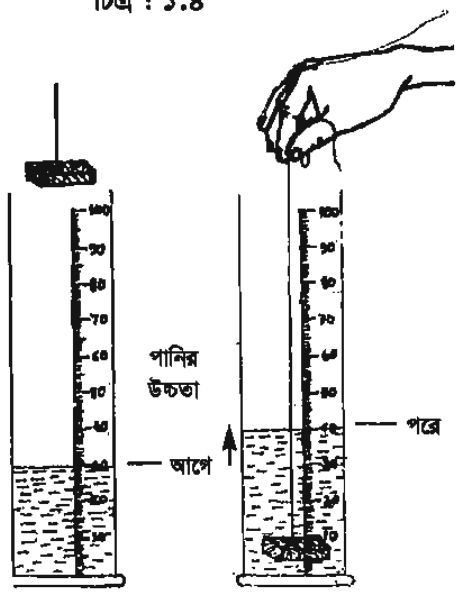

চিত্র ১.৫ : মাপ চোঙের সাহায্যে আয়তন নির্ণয়

পরীক্ষা : ছোট্ট একটি ভারী কাঠের সুষম টুকরা নাও। এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা মেপে আয়তন বের কর। এবার একটি মাপচোঙ নিয়ে তাতে কিছু পানি ঢেলে পাঠ নাও। কাঠের টুকরাটি একটি সুতা দিয়ে বেঁধে মাপচোঙের মধ্যে ডোবাও। টুকরাটি পানির মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে যাবার পর পানির উচ্চতার পাঠ নাও। কাঠের টুকরাটির আয়তন কত? এই আয়তন কি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা গুণ করে পাওয়া আয়তনের সমান? দেখবে যে পানির উচ্চতা বাড়ার পরিমাণ কাঠের টুকরাটির আয়তনের সমান। কাঠের টুকরাটি তুলে ফেল। মাপচোঙের পানির উচ্চতার পাঠ নাও। এবার এক টুকরা পাথর সুতা দিয়ে বেঁধে পানিতে ডোবাও। পানির উচ্চতার পাঠ নাও।

পাথরের টুকরাটির আয়তন কত?

ঘনত্বের একক : তোমার বন্ধুকে একটি ধাঁধাঁ জিজ্ঞেস কর : এক কিলোগ্রাম লোহার ভর বেশি, না এক কিলোগ্রাম তুলার? সে যদি বলে লোহার, তাহলে সে হেরে যাবে; যদি বলে তুলার, তাহলেও হেরে যাবে। আসলে, উভয়ের ভরই সমান। কিন্তু সমান আয়তনের লোহা তুলার চাইতে ভারী। তাই এক কিলোগ্রাম লোহা এবং এক কিলোগ্রাম তুলার ভর সমান হলেও তুলার আয়তন অনেক বেশি। লোহার ঘনত্ব বেশি। তুলার ঘনত্ব কম।

সমান আয়তনের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভর ভিন্ন হয় তাদের ঘনত্বের জন্য। কোনো বস্তুর একক আয়তনের ভরকে তার ঘনত্ব বলে, অর্থাৎ

$$\text{ঘনত্ব} = \frac{\text{ভর}}{\text{আয়তন}}$$

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে ভরের একক কি.গ্রা. এবং আয়তনের একক ঘন মি.। অতএব ঘনত্বের একক কি.গ্রা. প্রতি ঘন মি.। একইভাবে সি.জি.এস. পদ্ধতিতে ঘনত্বের একক হচ্ছে গ্রাম প্রতি ঘন সে. মি.। সি.জি.এস পদ্ধতিতে পানির ঘনত্ব ১ গ্রাম প্রতি ঘন সে. মি.। এর অর্থ ১ ঘন সে.মি. পানির ভর ১ গ্রাম। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে পানির ঘনত্ব ১০০০ কি.গ্রা. প্রতি ঘন মি.। যে বস্তুর ঘনত্ব যত বেশি সেই বস্তু তত বেশি ভারী। লোহার ঘনত্ব ৮ গ্রা. প্রতি ঘন সে. মি., কাঠের ঘনত্ব ০.৮ গ্রা. প্রতি ঘন সে. মি। লোহা কাঠের চাইতে ভারী।

আন্তর্জাতিক এবং সি.জি.এস পদ্ধতির এককের তুলনা :

যার পরিমাপ	আন্তর্জাতিক পদ্ধতি		সি.জি.এস. পদ্ধতি		সম্পর্ক
	এককের নাম	সংক্ষেপে	এককের নাম	সংক্ষেপে	
দৈর্ঘ্য	মিটার	মি.	সেন্টিমিটার	সে. মি.	১ মি: = ১০০ সে. মি.
ভর	কিলোগ্রাম	কি.গ্রা.	গ্রাম	গ্রা.	১ কি.গ্রা. = ১০০০ গ্রাম.
সময়	সেকেন্ড	সে.	সেকেন্ড	সে.	
ক্ষেত্রফল	বর্গ মিটার	বর্গ মি.	বর্গ সেন্টি মিটার	বর্গ সে. মি.	১ বর্গ মি. = ১০০০০ বর্গ সে. মি.
আয়তন	ঘনমিটার	ঘন মি.	ঘন সেন্টি মিটার	ঘন সে. মি.	১ ঘন মি = ১০০০০০০ ঘন সে. মি.
ঘনত্ব	কিলোগ্রাম প্রতি ঘন মিটার	কি. গ্রা./ঘন মি.	গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টি মিটার	গ্রা./ঘন সে. মি.	১০০০ কি.গ্রা./প্রতি ঘন মি. = ১ গ্রা./ঘন সে. মি.

কয়েকটি সাধারণ পরিমাপের যন্ত্র

কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য, ভর ও সময় পরিমাপের জন্য নানা ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। নিচে কয়েকটি সরল যন্ত্রের বিবরণ দেওয়া হল।

চিত্র ১.৬ মিটার স্কেল

মিটার স্কেল : দৈর্ঘ্য মাপার জন্য মিটার স্কেল ব্যবহার করা হয়। সাধারণত এটি একটি ১ মিটার বা ১০০ সে. মি. দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ধাতু বা কাঠের পাত দিয়ে তৈরি। পাতটির গায়ে ১ সে. মি. পর পর দাগ কাটা আছে। প্রত্যেক সে. মি. কে আবার সমান দশ ভাগে অর্থাৎ মিলিমিটারে ভাগ করে দাগ কাটা আছে। সেন্টিমিটারের দাগগুলো বড়, মিলিমিটারের দাগগুলো ছোট। তোমার স্কুলে সম্ভবত মিটার স্কেল আছে। তোমার শিক্ষক তোমাকে দেখাবেন। তুমি নিজেও মাপার জন্য হয়তো স্কেল ব্যবহার কর।

মিটার স্কেল দিয়ে জিনিসের দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য স্কেলটিকে জিনিসটির দৈর্ঘ্য বরাবর এমনভাবে রাখা হয় যাতে জিনিসটির এক প্রান্ত স্কেলের শূন্য দাগের সঙ্গে মিলে যায়। এখন জিনিসটির অপর প্রান্ত স্কেলের যে দাগের সাথে মিলে যাবে সে দাগের পাঠই তার দৈর্ঘ্য। কোনো কারণে স্কেলের শূন্য দাগের সাথে যদি জিনিসটির এক প্রান্ত মেলাতে অসুবিধা হয় তবে অন্য যে কোনো দাগের সঙ্গে মিলাতে হবে। এবার দু প্রান্তেরই পাঠ নিতে হবে। বেশি পাঠ থেকে কম পাঠের বিয়োগফল জিনিসটির দৈর্ঘ্য। চিত্র ১.৬–এ AB রেখার দৈর্ঘ্য ৫ সে. মি.। পাঠ নেয়ার সময় লক্ষ রাখতে হবে যখন যে প্রান্তের পাঠ নেওয়া হচ্ছে চোখ যেন তখন সেই প্রান্তের ওপরে লম্বভাবে থাকে। এভাবে পাঠ না নিলে বা একই স্থানে চোখ রেখে দু প্রান্তের পাঠ নিলে পাঠে ভুল হবে। আবার ধর তুমি তোমার

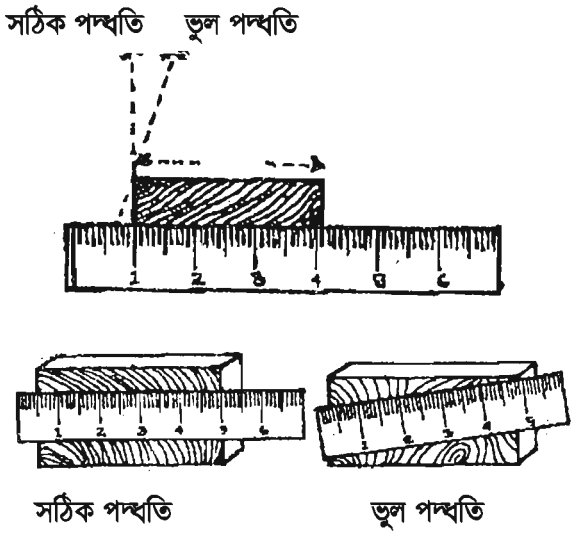

চিত্র ১.৭ : মিটার স্কেল দিয়ে দৈর্ঘ্য পরিমাপের সঠিক পদ্ধতি

পড়ার টেবিলের দৈর্ঘ্য মাপতে চাও। তোমাকে স্কেলটি টেবিলের দৈর্ঘ্য বরাবর এমনভাবে বসিয়ে মাপ নিতে হবে যাতে তা টেবিলের কিনারা বরাবর বা কিনারার সমান্তরাল হয়। যদি বাঁকা করে বসাও তবে সঠিক দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে না।

সুতরাং মিটার স্কেল দিয়ে সঠিক পরিমাপের জন্য মনে রাখতে হবে যে,

(ক) স্কেলের যে বিন্দুর পাঠ নেওয়া হয়, চোখকে সেই বিন্দুর ঠিক উপরে লম্বভাবে রাখতে হয়।

(খ) যে দৈর্ঘ্য মাপা হয় স্কেলটি সেই দৈর্ঘ্যের বরাবর বা সমান্তরাল রাখতে হয়।

সাধারণ নিক্তি : কোনো জিনিসের ভর মাপার জন্য নিক্তি ব্যবহার করা হয়। দোকানদাররা চাল–ডাল ইত্যাদি মাপার জন্য যে দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করে তাকেই সাধারণ নিক্তি বলে। তোমরা সবাই এই নিক্তি দেখেছ। কেউ কেউ হয়তো ব্যবহারও করেছ।

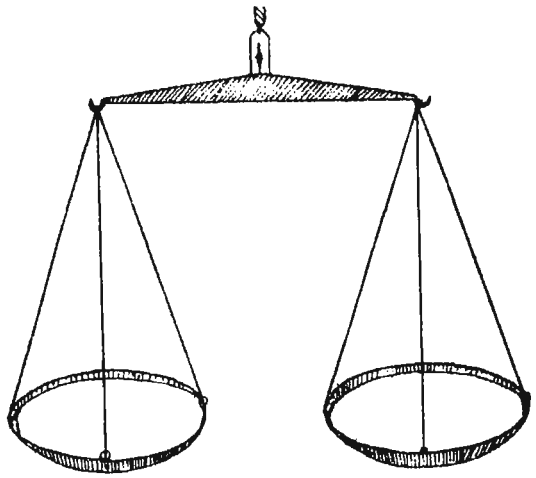

চিত্র ১.৮: সাধারণ নিক্তি

এই নিক্তিতে একটি কাঠের বা লোহার দণ্ড থাকে। দণ্ডটির দুই প্রান্তে দড়ি দিয়ে দুইটি থালা বা বাটি ঝুলিয়ে দেয়া হয় যাকে পাল্লা বলে। পাল্লা লোহার, পিতলের বা বেতেরও হতে পারে। দণ্ডটির ঠিক মাঝখানে একটি দড়ি বা লোহার হুক লাগান থাকে।

এই দড়ি বা লোহার হুক ধরে নিক্তিটা ঝোলান যায়। ঝুলন্ত অবস্থায় দণ্ডটি আনুভূমিক থাকে। নতুবা ওজন ভুল হয়। কোনো জিনিসের ভর মাপতে হলে সাধারণত জিনিসটি ডান দিকের পাল্লায় রাখা হয়। বাম দিকের পাল্লায় বিভিন্ন মাপের বাটখারা রাখা হয়। মাঝখানের দড়ি ধরে নিক্তিটাকে ঝোলাবার পর দণ্ডটি যখন ঠিক আনুভূমিকভাবে থাকে তখন দুদিকের ভর সমান হয়। বাম দিকের পাল্লায় কত ভরের বাটখারা দেয়া হয়েছে তা থেকে জিনিসটির ভর পাওয়া যায়।

সাধারণত নিক্তি দিয়ে ভরের সঠিক পরিমাপ পেতে হলে লক্ষ রাখতে হবে

(ক) যেন ডান দিকের খালি পাল্লার ভর বাম দিকের খালি পাল্লার ভরের সমান হয়। অর্থাৎ খালি পাল্লা মাঝখানের দড়ি ধরে ঝুলিয়ে দিলে দণ্ডটি সমান্তরাল থাকবে।

(খ) যে দড়ি বা হুক ধরে ঝুলিয়ে মাপ নেয়া হয় সেটি যেন দণ্ডটির ঠিক মাঝখানে থাকে। হুক থেকে কোনো এক প্রান্তের দূরত্ব যদি অপর প্রান্তের দূরত্ব থেকে কম বা বেশি হয় তবে সঠিক ভরের পরিমাপ পাওয়া যাবে না।

ঘড়ি : সময় মাপার জন্য ঘড়ি ব্যবহার করা হয়। তোমরা সকলেই ঘড়ি দেখেছ এবং ব্যবহার কর। ঘড়ি দেখে সকালে ঘুম থেকে ওঠ, ঘড়ি দেখে স্কুলে যাও। আবার শোয়ার সময়ও হয়তো ঘড়ি দেখে শুতে যাও। বিভিন্ন রকমের ঘড়ি আছে। যেমন, হাতঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি, টেবিল ঘড়ি ইত্যাদি। এইসব ঘড়ি আবার দুরকমের কাঁটা ঘড়ি এবং ডিজিটাল ঘড়ি। কাঁটা ঘড়িতে ঘণ্টা এবং মিনিটের কাঁটা থাকে। কাঁটা কোন দাগের ওপরে আছে তার পাঠ নিয়ে সময় জানা যায়। ডিজিটাল ঘড়িতে কোনো কাঁটা নেই। কত সময় তা সরাসরি সংখ্যায় দেখা যায়। তুমি যখন সময় দেখছ তখন কয়টা বেজে কত মিনিট হয়েছে তা ঘড়ির দিকে তাকালেই দেখতে পাবে। কোনো কোনো ঘড়িতে আবার সেকেন্ড পর্যন্ত দেখা যায়। যেমন, ডিজিটাল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তুমি হয়তো দেখলে ১০:৩০:১৫। এর অর্থ হল তখন সময় দশটা বেজে ত্রিশ মিনিট পনের সেকেন্ড হয়েছে। প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডের সংখ্যা পরিবর্তন হয়, প্রতি ৬০ সেকেন্ডের পর পর মিনিটের সংখ্যা পরিবর্তন হয় এবং প্রতি ৬০ মিনিট পর পর ঘন্টার সংখ্যা পরিবর্তন হয়। এই ঘড়ি ব্যাটারি দ্বারা চালিত। এগুলোকে ইলেক্ট্রনিক ঘড়িও বলে। আজকাল অধিকাংশ কাঁটা ঘড়িও ইলেক্ট্রনিক।

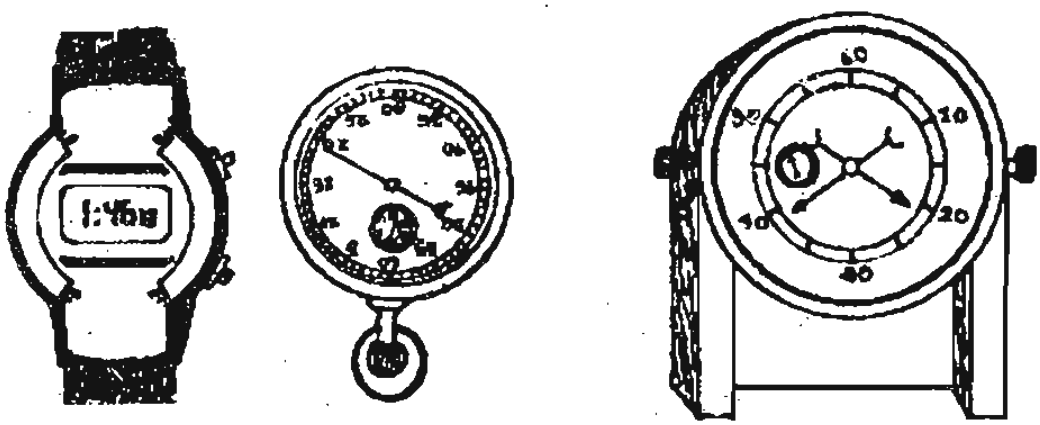

ডিজিটাল ঘড়ি স্টপ ওয়াচ স্টপ ক্লক

চিত্র ১.৯ : বিভিন্ন ধরনের ঘড়ি

পরীক্ষাগারে সময় পরিমাপের জন্য এক ধরনের ঘড়ি ব্যবহার করা হয়ে থাকে যাকে স্টপ ওয়াচ বা স্টপ ক্লক বলে। একটি বোতাম টিপে এই ঘড়ি ইচ্ছামত চালু বা বন্ধ করা যায়। সময় পরিমাপ শুরু করার আগে কাঁটা শূন্য অবস্থানে আনতে হয়। যখন থেকে সময় পরিমাপ শুরু হয় সেই মুহূর্তে বোতাম টিপতে হয়। বোতাম টেপার সাথে সাথে ঘড়ি চলতে শুরু করে। সময় মাপা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আবার বোতাম টিপলে ঘড়ি থেমে যায়। কাঁটার অবস্থান থেকে কতক্ষণ ঘড়ি চলেছে তা জানা যায়। আরেকবার বোতাম টিপলে কাঁটা আবার শূন্যের দাগে ফিরে আসে। খেলাধুলার সময় একজন দৌড়বিদের একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব দৌড়াতে কত সময় লাগে তা পরিমাপের জন্য স্টপ ওয়াচ ব্যবহার করা হয়। স্টপ ওয়াচ অপেক্ষাকৃত ছোট, হাতঘড়ির মত। স্টপ ক্লক একটু বড়, টেবিল ঘড়ির মত দেখতে। টেবিলের উপরে রাখা থাকে। স্টপ ওয়াচ এবং স্টপ ক্লকও ডিজিটাল হতে পারে।

এ অধ্যায়ের নতুন শব্দ

পরিমাপ	লব্ধ একক	মৌলিক একক
আয়তন	ক্ষেত্রফল	মিটার
ঘনত্ব	সেকেন্ড	কিলোগ্রাম
ঘন মিটার	বর্গ মিটার	নিক্তি
মিটার স্কেল	একক	ঘড়ি

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কোনটির একক মৌলিক ?

ক. ক্ষেত্রফলের খ. আয়তনের

গ. ভরের ঘ. ঘনত্বের।

২. পানির ঘনত্ব ১০০০ কিলোগ্রাম/ঘনমিটার। ১০ ঘনমিটার পানির ভর কত ?

ক. ১০ কি. গ্রা. খ. ১০০ কি. গ্রা.

গ. ১০০০ কি. গ্রা. ঘ. ১০০০০ কি. গ্রা.।

৩.

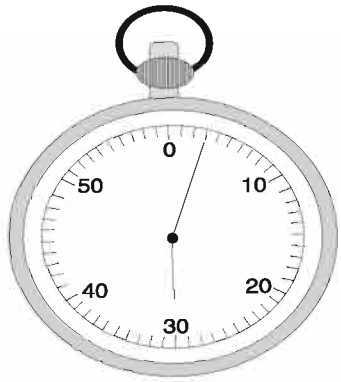

চিত্র

চিত্রের প্রদর্শিত যন্ত্রটির সাহায্যে কী পরিমাপ করা যায় ?

ক. ভর খ. সময়

গ. ওজন ঘ. আয়তন।

৪. ৩নং চিত্রের যন্ত্রটি বহুল ব্যবহৃত হয়

i. দৈনন্দিন কার্যক্রমে

ii. খেলাধুলার ক্ষেত্রে

iii. গবেষণা কার্যক্রমে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রের আলোকে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

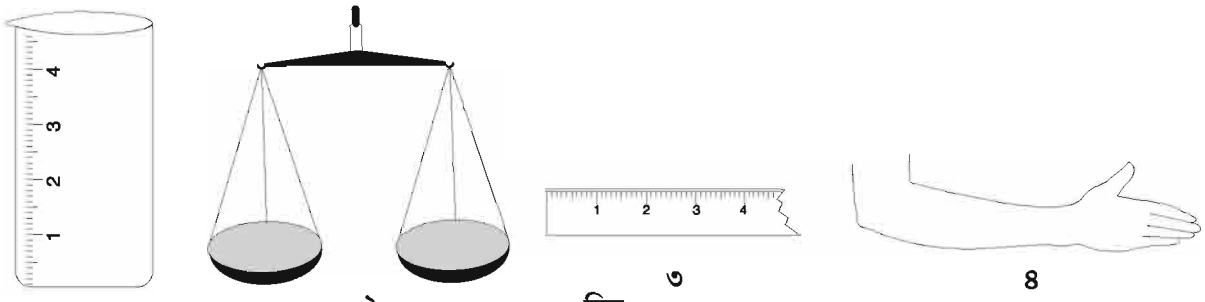

১ ২ ৩ ৪

চিত্র

৫. এক টুকরা পাথরের আয়তন নির্ণয়ের জন্য ওপরের কোন চিত্রটির ব্যবহার করা যায়।

ক. ১ খ. ২

গ. ৩ ঘ. ৪

৬. চিত্রের যন্ত্রগুলো ব্যবহৃত হয়

i. দৈর্ঘ্য ও ভর নির্ণয়ে

ii. ভর ও ঘনত্ব নির্ণয়ে

iii. ক্ষেত্রফল ও ঘনত্ব নির্ণয়ে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

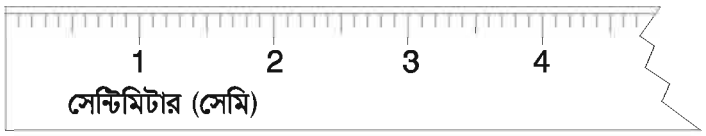

ক

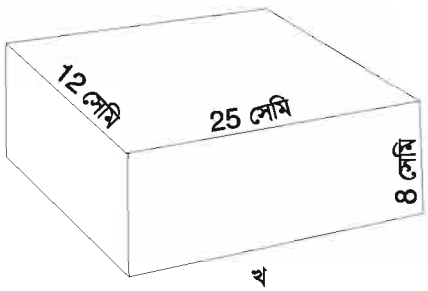

খ

চিত্র

চিত্র অনুসারে নিম্নের প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও

ক. 'সেন্টিমিটার' কী ?

খ. 'ক' চিত্রের সাহায্য কীভাবে দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যায় ?

গ. 'খ' চিত্রের আয়তন নির্ণয় কর।

ঘ. 'ক' যন্ত্রটি তারের ব্যাস মাপার জন্য উপযোগী কিনা মতামত দাও ?

২. পৃথিবীতে ৬০ কিলোগ্রাম ভরের একজন লোক চাঁদে আরোহণ করল। আরোহণের পর তার নিজেকে বেশ হালকা মনে হল। পৃথিবীতে ১ কিলোগ্রাম বস্তুর ওজন প্রায় ১০ নিউটন।

ক. কিলোগ্রাম কী ?

খ. চাঁদে লোকটির নিজেকে হালকা মনে হল কেন?

গ. পৃথিবীতে লোকটির ওজন নির্ণয় কর।

ঘ. চাঁদ ও পৃথিবীতে লোকটির ভর ও ওজনের পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পদার্থ

আমাদের চারপাশে অসংখ্য জিনিস ছড়িয়ে আছে। যেমন চেয়ার, টেবিল, বই, কলম, ইট, কাঠ, গাছপালা, চাল, ডাল, পানি, বাতাস ইত্যাদি। এসব জিনিসের সাধারণ নাম পদার্থ। তোমার বইটা হাতে নাও, দেখবে এর কিছু ওজন রয়েছে। বইটা টেবিলের ওপর রাখ, এটি কিছুটা স্থান দখল করল। তোমার পড়ার টেবিলটা হাত দিয়ে আস্তে ধাক্কা দাও। টেবিলটা নড়বে কিন্তু সরবে না। অর্থাৎ তুমি যে বল প্রয়োগ করলে তাতে সে বাধা দেয়। বাতাস দেখা যায় না। কিন্তু বাতাস যে আছে তা তুমি অনুভব করতে পার। এভাবে সব পদার্থের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তার কম বেশি ওজন রয়েছে, তা কিছু না কিছু স্থান দখল করে এবং বল প্রয়োগে বাধা দেয়। পদার্থ দেখা যায়, স্পর্শ করা যায় বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা যায়।

সুতরাং **যার ওজন আছে,** যা কিছু জায়গা দখল করে, যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা যায় এবং যা বল প্রয়োগে বাধা দেয় তাকে বিজ্ঞানের ভাষায় পদার্থ বলে।

পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা

বিশ্ব জগতে অসংখ্য পদার্থ রয়েছে। অবস্থাভেদে সকল পদার্থকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থ।

ইট, কাঠ, পাথর, চেয়ার, টেবিল, বই, খাতা ইত্যাদি পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এগুলোর আকার ও আয়তনের কোনো পরিবর্তন হয় না। এগুলোকে কঠিন পদার্থ বলে। পানি, তেল, দুধ ইত্যাদির নির্দিষ্ট আয়তন আছে কিন্তু নির্দিষ্ট আকার নেই। এদের যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। এগুলোকে তরল পদার্থ বলে। বায়বীয় পদার্থের আকার বা আয়তন কোনটিই নির্দিষ্ট নয়। বায়বীয় পদার্থের পরিমাণ যতই কম বা বেশি হোক না কেন, যখন যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রের আকার এবং আয়তন লাভ করে। বায়ু, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি বায়বীয় পদার্থ।

একই পদার্থ তিন অবস্থায় থাকতে পারে

একই পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন অবস্থায় থাকতে পারে। পানি এর একটি উত্তম উদাহরণ। সাধারণ তাপমাত্রায় পানি একটি তরল পদার্থ। পানি ঠান্ডা করলে কঠিন বরফে এবং পানিকে তাপ দিলে বাষ্পে পরিণত হয়। এ পানি কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন অবস্থাতেই থাকতে পারে। সাধারণত কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে প্রথমে তরলে এবং তরল পদার্থকে তাপ দিলে বাষ্পে পরিণত হয়। কিন্তু কর্পূর, নিশাদল ইত্যাদি কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে তা তরলে পরিণত না হয়ে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয়। এসব পদার্থকে উদ্বায়ী পদার্থ বলে। সাধারণ তাপমাত্রাতেও এসব উদ্বায়ী পদার্থ ধীরে ধীরে বাষ্পে পরিণত হয়।

মৌলিক, যৌগিক পদার্থ

সব বস্তুই বিশেষ ধরনের পদার্থ দ্বারা তৈরি। গঠন ও ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে পদার্থকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থ। যেমন এক টুকরা লোহাকে ভাঙতে ভাঙতে যত ক্ষুদ্র কণাই করা হোক না কেন প্রত্যেক ক্ষুদ্র কণাতেই লোহার ধর্ম ও গুণাগুণ বিদ্যমান থাকে। আবার হাইড্রোজেনকে বিশ্লেষণ করলে হাইড্রোজেন ছাড়া আর অন্য কোনো নতুন পদার্থ পাওয়া যায় না। অতএব যে পদার্থকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে ঐ পদার্থ ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম বিশিষ্ট পদার্থ পাওয়া যায় না তাকে মৌলিক পদার্থ বলে। এই পৃথিবীতে ১০৯টি মৌলিক পদার্থ আছে। এর মধ্যে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় ৯২টি, বাকি ১৭টি গবেষণাগারে তৈরি করা যায়।

যে পদার্থকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট একাধিক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় তাকে যৌগিক পদার্থ বলে। যেমন পানিকে বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে দুইটি ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট পদার্থ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে খাবার লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইডকে ভাঙলে সোডিয়াম ও ক্লোরিন পাওয়া যাবে। পানি, চিনি, লবণ, তেল, মাটি ইত্যাদি যৌগিক পদার্থ।

মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের মধ্যে পার্থক্য

মৌলিক পদার্থ	যৌগিক পদার্থ
১। যে পদার্থকে ভাঙলে ঐ পদার্থ ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না তাকে মৌলিক পদার্থ বলে। যেমন সোনা, রুপা, তামা, লোহা, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ।	১। যে পদার্থকে ভাঙলে একের অধিক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় তাকে যৌগিক পদার্থ বলে। যেমন পানি, চিনি, তেল, লবণ, সাবান, সোডা ইত্যাদি যৌগিক পদার্থ।
২। মৌলিক পদার্থসমূহ স্বাধীন অবস্থায় নিজ নিজ ধর্ম বা গুণ অক্ষুণ্ন রাখতে পারে।	২। যে সমস্ত মৌলিক পদার্থ দ্বারা যৌগিক পদার্থ তৈরি তাদের ধর্ম থেকে এদের ধর্ম সম্পূর্ণ আলাদা।
৩। মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশের নাম পরমাণু। পরমাণুতে মৌলের ধর্ম অটুট থাকে।	৩। যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম ভাগের নাম অণু। অণুতে যৌগের ধর্ম অটুট থাকে।
৪। মৌলিক পদার্থের অণু একই রকমের পরমাণু দ্বারা গঠিত।	৪। যৌগিক পদার্থের অণু ভিন্ন রকমের পরমাণু দ্বারা গঠিত।
৫। পৃথিবীতে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ১০৯টি।	৫। পৃথিবীতে যৌগিক পদার্থ অসংখ্য (৫০ লক্ষেরও বেশি)।

মিশ্র পদার্থ

তোমরা জান লোহা এবং গন্ধক ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট মৌলিক পদার্থ। লোহার গুঁড়া দেখতে কিছুটা কালো বর্ণের এবং গন্ধকের চূর্ণ হলুদ বর্ণের। একটি কাগজের উপর কিছুটা লোহার গুঁড়া ও গন্ধকের চূর্ণ নিয়ে ভালভাবে মেশাও। মিশ্রণটি তৈরির সময় লোহা ও গন্ধকের গুঁড়া মেপে নেবার প্রয়োজন নেই। ভাল করে মিশিয়ে মিশ্রণটি কাগজের উপর ছড়িয়ে দাও এবং পর্যবেক্ষণ কর। সম্ভব হলে আতশ কাচ দিয়েও দেখতে পার। কী দেখছ? লোহা ও গন্ধকের গুঁড়ার উপাদানগুলো পাশাপাশি অবস্থান করছে। লোহা ও গন্ধকের মিশ্রণ থেকে লোহার গুঁড়া ও গন্ধকের চূর্ণ আবার আলাদা করা যাবে কি? এসো, আমরা লোহা ও গন্ধকের মিশ্রণ থেকে উপাদানগুলোকে পৃথক করি।

পরীক্ষা ২.১ : মিশ্র পদার্থের উপাদান

পৃথকীকরণ

লোহা ও গন্ধকের মিশ্রণটি কাগজের উপর ভালভাবে ছড়িয়ে দাও। এবার এক খন্ড চুম্বক মিশ্রণটির উপর দিয়ে কয়েকবার টেনে নাও। কী দেখছ? চুম্বকের আকর্ষণে লোহার গুঁড়া মিশ্রণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা না হওয়া পর্যন্ত চুম্বকটি মিশ্রণের ওপর দিয়ে টানতে থাক। এমন এক সময় আসবে যখন আর কোনো লোহার গুঁড়া চুম্বকের গায়ে লাগবে না। তখন বুঝবে মিশ্রণ থেকে লোহার গুঁড়া সম্পূর্ণরূপে আলাদা হয়ে গেছে। এবার ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখবে কাগজের ওপর হলুদ বর্ণের গন্ধকের চূর্ণ পড়ে আছে। এভাবে তোমরা লোহা ও গন্ধক চূর্ণের মিশ্রণ থেকে উপাদানগুলো সহজে পৃথক করতে পার।

চিত্র ২.১ : লোহা ও গন্ধকের গুঁড়া পর্যবেক্ষণ

লোহা ও গন্ধকের গুঁড়ার এই মিশ্রণটি একটি সাধারণ মিশ্রণ বা মিশ্র পদার্থ। মিশ্র পদার্থ তৈরির সময় উপাদানগুলো যে কোনো অনুপাতে মেশানো যায় এবং এক্ষেত্রে তাপ প্রয়োগ করতে হয় না। মিশ্র পদার্থে বিভিন্ন উপাদানগুলোর নিজ নিজ ধর্ম ও গুণাগুণ পুরোপুরি বজায় থাকে। উপরের পরীক্ষা থেকে তোমরা আরও লক্ষ করেছ মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলো সহজে পৃথক করা যায়। তাহলে বলা যায় যে, দুই বা ততোধিক মৌলিক বা যৌগিক পদার্থ যে কোনো অনুপাতে মেশালে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তার মধ্যে যদি মিশ্রিত পদার্থগুলোর নিজ নিজ গুণের কোনো পরিবর্তন না হয়, মিশ্রিত উপাদানগুলো পাশাপাশি অবস্থান করে এবং উপাদানগুলোকে সহজে পৃথক করা যায় তবে তাকে মিশ্র পদার্থ বলে। যেমন বায়ুর মধ্যে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প, ধূলিকণা ইত্যাদি আছে। বায়ুর মধ্যে এগুলোর প্রত্যেকটির নিজ নিজ গুণ পুরোপুরিভাবে বজায় থাকে। বায়ুতে এই উপাদানগুলো নির্দিষ্ট অনুপাতে থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন জায়গার বায়ুতে উপাদানগুলো ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে থাকে এবং উপাদানগুলোকে সহজে পৃথক করা যায়। তাই বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ।

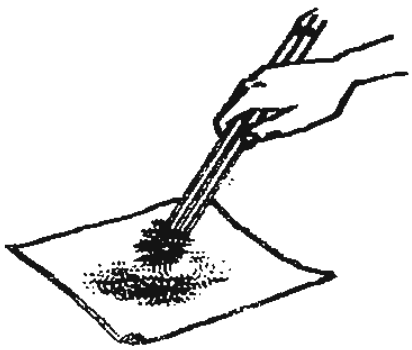

চিত্র ২.২ : লোহা ও গন্ধকের গুঁড়ার মিশ্রণ থেকে উপাদানগুলো পৃথকীকরণ

পরীক্ষা ২.২ : যৌগিক পদার্থ প্রস্তুতকরণ

লোহার গুঁড়া ও গন্ধকের চূর্ণ আনুপাতিক হারে মিশিয়ে একটি টেস্টটিউবে নিয়ে স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে ধীরে ধীরে তাপ দাও। কিছুক্ষণ পর দেখবে গন্ধক গলে লোহার গুঁড়ার সাথে মিশে লালচে বর্ণের এক প্রকার পদার্থ তৈরি হয়েছে। টেস্টটিউবটি ঠান্ডা হবার পর টেস্টটিউবের ভিতরের পদার্থটি এক টুকরা কাগজের উপর নিয়ে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ কর। কী দেখছ? এখন আর মিশ্রণটির মধ্যে লোহার গুড়া কিংবা গন্ধকের চূর্ণ কোনোটিই দেখা যাচ্ছে না। কারণ তাপের ফলে লোহা ও গন্ধক রাসায়নিক বিক্রিয়া করে একটি নতুন পদার্থে পরিণত হয়েছে। এ পদার্থটির নাম আয়রন সালফাইড। আয়রন সালফাইডের বর্ণ ও ধর্ম লোহা অথবা গন্ধকের বর্ণ ও ধর্ম হতে সম্পূর্ণ আলাদা। এ নতুন পদার্থ হতে উপাদানগুলোকে সহজ উপায়ে পৃথক করা যাবে কি? এসো তাহলে নিচের পরীক্ষাটি করে দেখা যাক।

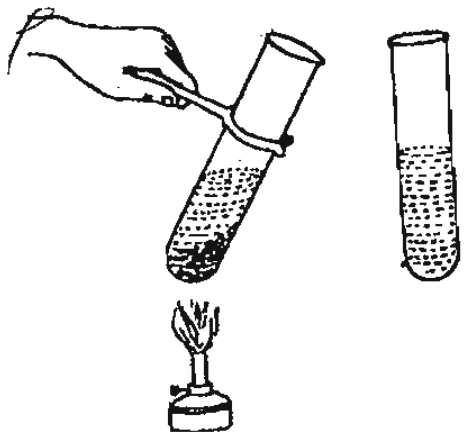

চিত্র ২.৩ : লোহা ও গন্ধকের গুঁড়ার মিশ্রণকে তাপ দেওয়া হচ্ছে

পরীক্ষা ২.৩ : যৌগিক পদার্থ পৃথকীকরণের প্রচেষ্টা

এক টুকরা কাগজের উপর কিছু আয়রন সালফাইড নাও এবং এর ওপর দিয়ে চুম্বক ধীরে ধীরে টেনে নাও। কী দেখছ? চুম্বকের গায়ে কোনো লোহার গুঁড়া লেগেছে কি? না, চুম্বকে কোনো লোহার গুঁড়া লাগেনি এবং কাগজের ওপরও কোনো গন্ধকের চূর্ণ দেখা যাচ্ছে না। এ পরীক্ষা থেকে তোমরা দেখতে পেলে লোহা ও গন্ধকের গুঁড়া দিয়ে তৈরি আয়রন সালফাইড নামক এই নতুন পদার্থ থেকে লোহা ও গন্ধককে সহজ উপায়ে পৃথক করা যায় না। আয়রন সালফাইড একটি যৌগিক পদার্থ।

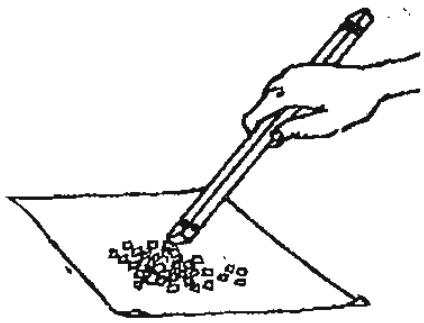

চিত্র ২.৪ : আয়রন সালফাইড যৌগের আয়রন চুম্বকে আকৃষ্ট হয় না

তাহলে আমরা বলতে পারি, দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ

নির্দিষ্ট অনুপাতে পরস্পর রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে যুক্ত হয়ে ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট যে নতুন পদার্থ তৈরি করে তাকে যৌগিক পদার্থ বলে। যেমন লোহার গুঁড়া ও গন্ধক চূর্ণ তাপের ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে আয়রন সালফাইড নামক যৌগ তৈরি করেছে। যৌগিক পদার্থ তৈরির সময় তাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় এবং যৌগিক পদার্থ হতে উপাদানগুলোকে সহজে পৃথক করা যায় না। পানি, লবণ, সাবান, সোডা, তেল, চিনি ইত্যাদি সবই যৌগিক পদার্থ। সাধারণ মিশ্রণ ও যৌগিক পদার্থের মধ্যে পার্থক্য নিচের ছকে দেখানো হল :

মিশ্র ও যৌগিক পদার্থের মধ্যে পার্থক্য

যৌগিক পদার্থ	মিশ্র পদার্থ
১। যৌগিক পদার্থে উপাদানগুলোর ওজন নির্দিষ্ট অনুপাতে হয়। যেমন পানিতে ১ ভাগ ওজনের হাইড্রোজেনের সাথে ৮ ভাগ ওজনের অক্সিজেন থাকে।	১। সাধারণ মিশ্রণে উপাদানগুলোর ওজন যে কোনো পরিমাণের হতে পারে। যেমন বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ। এতে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন-ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প, ধূলিবালি ইত্যাদি আছে।
২। যৌগিক পদার্থের মৌলের উপাদানগুলোর ধর্ম নষ্ট হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ নতুন ধর্মের ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হয়।	২। সাধারণ মিশ্রণে উপাদানগুলোর ধর্মের কোনো পরিবর্তন হয় না এবং উপাদানগুলো পাশাপাশি থাকে।
৩। যৌগিক পদার্থ তৈরির সময় উপাদানগুলোতে তাপ প্রয়োগ অথবা তা হতে তাপ নিষ্কাশনের প্রয়োজন হয়।	৩। সাধারণ মিশ্রণ তৈরির সময় তাপ প্রয়োগ অথবা নিষ্কাশনের প্রয়োজন হয় না।
৪। যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলো সহজে আলাদা করা যায় না।	৪। সাধারণ মিশ্রণের উপাদানগুলোকে সহজে আলাদা করা যায়।
৫। যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলো সব জায়গায় সমান বা সমসত্ত্ব হয়। যেমন পানি যেখান থেকে নেয়া হোক না কেন এতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত সমান থাকে।	৫। সাধারণ মিশ্রণে উপাদানগুলো সমসত্ত্ব বা অসমসত্ত্ব দুই-ই হতে পারে। যেমন চিনির শরবত সমসত্ত্ব মিশ্রণ। কিন্তু লবণ ও বালির মিশ্রণ অসমসত্ত্ব মিশ্রণ।

মিশ্রণকে পৃথক করার সাধারণ প্রণালি

বালি ও পানির মিশ্রণকে ছেকে বালি ও পানি পৃথক করা যায়। পানি ও লবণের দ্রবণকে তাপ দিয়ে লবণ পৃথক করা যায়। পরীক্ষাগারে মিশ্রণের উপাদানগুলো আলাদা করার জন্য কতকগুলো সাধারণ প্রণালি ব্যবহার করা হয়। থিতান, পরিস্রাবণ, বাষ্পীকরণ ইত্যাদি পরীক্ষাগারের সাধারণ প্রণালির অন্তর্ভুক্ত। নিচে প্রণালিগুলোর বর্ণনা দেওয়া হল :

থিতান

একটি কাচপাত্র বা বিকারে কিছুটা পানি নাও। পানিতে সামান্য বালি মিশিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া কর। বালি মিশ্রিত পানি লক্ষ কর ঘোলা দেখাচ্ছে। বালি ও পানির এই ঘোলা মিশ্রণ বেশ কিছুক্ষণ স্থির ভাবে রেখে দাও। কিছুক্ষণ পর লক্ষ কর।

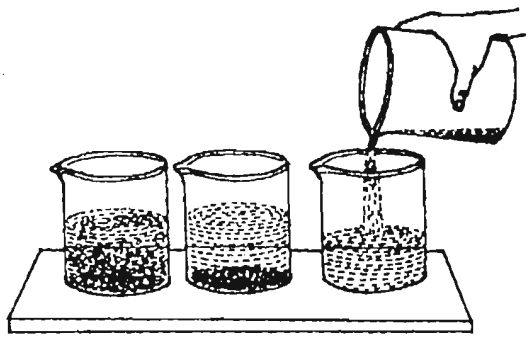

চিত্র ২.৫ : থিতান পদ্ধতিতে উপাদানগুলো পৃথকীকরণ

কী দেখছ? বালির কণাগুলো পাত্রের তলায় জমা হয়েছে এবং

উপরের পানি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ দেখাচ্ছে।এভাবে কোনো তরল পদার্থের মধ্যে ভারি অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থকে পৃথক করার প্রণালিকে থিতান বলা হয়। অদ্রবণীয় ভারি কঠিন পদার্থ থিতিয়ে পড়লে পাত্রটিকে কাত করে উপর থেকে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার তরল পদার্থ অন্য পাত্রে ঢেলে পৃথক করাকে **আস্রাবণ** বলে। যে ভারী কঠিন পদার্থ পাত্রের তলায় পড়ে থাকে তাকে তলানি বলে।

পরিস্রাবণ বা ছাঁকন

তোমরা বাড়িতে চা বানাতে দেখেছ কি? গরম পানিতে চায়ের পাতার গুঁড়া দিলে চায়ের লিকার তৈরি হয়। চায়ের পাতা কিন্তু পানিতে গলে না। চায়ের পাতার অদ্রবণীয় অংশ চায়ের লিকার থেকে ছেঁকে পৃথক করা হয়। নদী বা পুকুরের ময়লা পানিতে অনেক সময় অদ্রবণীয় পদার্থ থাকে। ময়লার কণাগুলো অনেক সময় পানিতে ভাসমান অবস্থায় থাকে, আবার কখনও কলসিতে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রেখে দিলে কলসির তলায় তলানি হিসেবে জমা হয়। ময়লা পানি ছেঁকে পানি থেকে ময়লা পৃথক করা যায়।

উপরের পরীক্ষায় তোমরা পানি ও বালির মিশ্রণ থেকে থিতান পদ্ধতিতে উপাদানগুলোকে পৃথক করেছ। এ পদ্ধতিতে উপাদানগুলো পৃথক করার জন্য বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়। অপেক্ষা না করে পানি ও বালির মিশ্রণ থেকে পরিস্রবাণ বা ছাঁকন প্রণালির সাহায্যে পানি ও বালি পৃথক করা যায়। এসো বালি ও পানির মিশ্রণ থেকে পরিস্রাবণ বা ছাঁকন প্রণালিতে উপাদানগুলোকে পৃথক করি।

পরীক্ষা ২.৪ : বালি ও পানির মিশ্রণকে ছাঁকন প্রণালিতে পৃথকীকরণ

একটি বিকার বা গ্লাসে বালি ও পানি মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি কর। মিশ্রণটিকে একটি নাড়ন কাঠি দিয়ে ভালভাবে নাড়তে থাক।একটি ছাঁকন কাগজ নাও। চিত্রানুযায়ী ছাঁকন কাগজটিকে প্রথমে দুই ভাঁজ এবং তারপর পুনরায় দুই ভাঁজ কর। এবারে এক দিকে তিন ভাঁজ এবং অন্য দিকে এক ভাঁজ রেখে ছাঁকন কাগজটিকে কলার মোচার আকার কর। ছাঁকন কাগজের মোচাটিকে ফানেলের মধ্যে বসিয়ে কয়েক ফোটা পানি দিয়ে ভিজিয়ে দাও যাতে কাগজটি ফানেলের গায়ে আটকে থাকে।

এখন ফানেলটিকে চিত্রের ন্যায় একটি স্ট্যান্ডের ক্ল্যাম্পের সাথে আটকাও। ফানেলের শেষ প্রান্ত একটি খালি বিকারের ভিতরে গায়ে লাগিয়ে রাখ।

একটি কাচশলাকা বা গ্লাস রড এর সাহায্যে বালি মিশ্রিত পানি ফানেলের মধ্যে ছাঁকন কাগজের তিন ভাঁজের উপর অল্প অল্প করে ঢালতে থাক। কী দেখছ? ফানেলের মধ্যে ছাঁকন কাগজের উপর বালি পড়ে আছে এবং নিচের বিকারে স্বচ্ছ পানি জমা হচ্ছে। এভাবে কোনো অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থকে তরল পদার্থ থেকে ছাঁকন প্রক্রিয়ার সাহায্যে পৃথক করাকে পরিস্রাবণ বলে। এ পরীক্ষায় তোমরা ছাঁকন পদ্ধতিতে বালি ও পানির মিশ্রণ থেকে বালি ও পানি পৃথক করেছ।

অতএব, কোনো তরল পদার্থ থেকে ভারী অদ্রবণীয় পদার্থ বা ভাসমান কঠিন পদার্থকে ছেঁকে পৃথক করার প্রণালিকে পরিস্রাবণ বলে। পরিস্রাবণ শেষে ছাঁকন কাগজের ওপর যে কঠিন পদার্থ পড়ে থাকে তাকে অবশেষ বলে। আর ছাঁকনের পর যে পরিষ্কার তরল পদার্থ বিকারে জমা হয় তাকে পরিস্রুত তরল বলে।

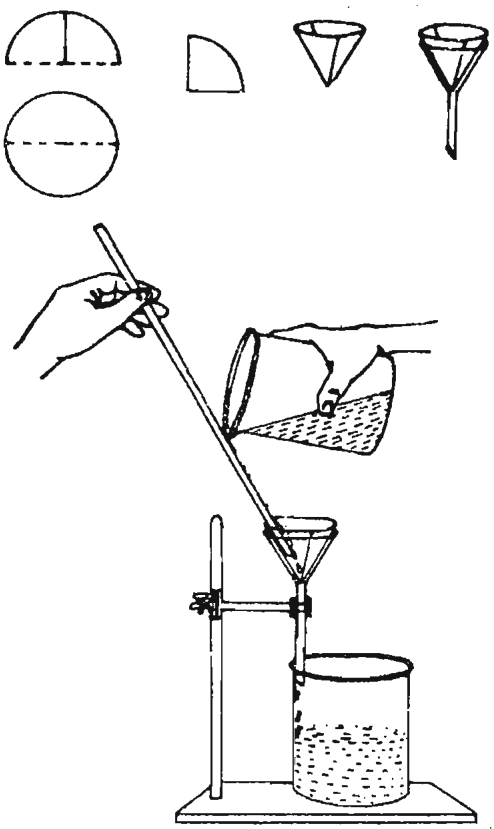

চিত্র ২.৬ : পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে উপাদানগুলো পৃথকীকরণ

বাষ্পীকরণ

গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপে খাল, বিল, পুকুর শুকিয়ে যায়। ভিজা কাপড় রোদে রাখলে পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। ফলে কাপড় শুকিয়ে যায়। একটি প্লেটে দু–এক ফোঁটা পানি খোলা জায়গায় রেখে দিলে দেখা যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে পানি উড়ে গেছে। এভাবে স্বাভাবিক তাপে পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যাওয়াকে বাষ্পীভবন বলে। সমুদ্রের পানি লবণাক্ত, এ পানিতে খাবার লবণ দ্রবীভূত থাকে। পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় সমুদ্রের পানি থেকে অতি সহজেই লবণ উৎপন্ন হয়।

বাড়িতে তোমরা ভাত তরকারি রান্না করতে দেখেছ। ভাত তরকারি রান্নার সময় ভাত বা তরকারির হাঁড়ি চুলার উপর বসিয়ে তাপ দিতে হয়। তাপের ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাত বা তরকারির হাঁড়ি থেকে পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে শুরু করে। এভাবে কোনো তরল পদার্থকে তাপের সাহায্যে বাষ্পে পরিণত করাকে বাষ্পীকরণ বলে।

তোমরা লক্ষ করেছ ছাঁকন বা আস্রাবণ প্রণালিতে কোনো দ্রবণ হতে অদ্রবণীয় কঠিন দ্রব পৃথক করা যায়। চিনি, খাবার লবণ, তুঁতে ইত্যাদি কঠিন পদার্থ পানিতে দ্রবণীয়। ছাঁকন প্রণালিতে এসব দ্রবণীয় কঠিন পদার্থ পৃথক করা যায় না। তাহলে যে সমস্ত কঠিন দ্রব পানিতে দ্রবণীয় সে সমস্ত দ্রব দ্রবণ থেকে কীভাবে ফেরত পাওয়া যাবে? বাষ্পীকরণ প্রণালিতে দ্রবণ হতে দ্রবণীয় কঠিন দ্রব পৃথক করা যায়। এসো, আমরা দ্রবণ হতে দ্রবণীয় কঠিন পদার্থ ফিরে পাওয়ার জন্য নিচের পরীক্ষাটি করি।

পরীক্ষা ২.৫ : তুঁতে পানির দ্রবণ থেকে তুঁতে পৃথকীকরণ

একটি বিকারে কিছুটা পানি নিয়ে এতে সামান্য তুঁতে মেশাও। একটি নাড়ন কাঠি দিয়ে নেড়ে দিলে তুঁতে পানিতে গলে গিয়ে তুঁতে ও পানির রঙিন দ্রবণ তৈরি হবে। এ দ্রবণ থেকে কীভাবে তুঁতে ফেরত পাওয়া যাবে?

একটি স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে তুঁতে ও পানির দ্রবণটিকে তাপ দাও। দেখবে কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্রবণটি গরম হয়ে দ্রবণের পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে শুরু করেছে। প্রায় সম্পূর্ণ পানি উড়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাপ দিতে থাক। এবারে বিকারের তলায় লক্ষ কর, কী দেখছ? নীল তুঁতে বিকারের তলায় পড়ে আছে।

তুঁতে পানির দ্রবণ থেকে বাষ্পীভবন পদ্ধতিতে তুঁতে ফেরত পাওয়া গেল। পানি উড়ে গেল। এ পরীক্ষায় পানিকে ফিরে পাওয়া গেল না। তুঁতে–পানির দ্রবণ থেকে আমরা তুঁতে ও পানি দুটোই ফিরে পেতে চাই। কীভাবে তা পেতে পারি? তুঁতে ও পানি দুটোই ফেরত পাওয়ার জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতির নাম পাতন প্রণালি। এ সম্পর্কে তোমরা উপরের শ্রেণীতে বিস্তারিত জানতে পারবে।

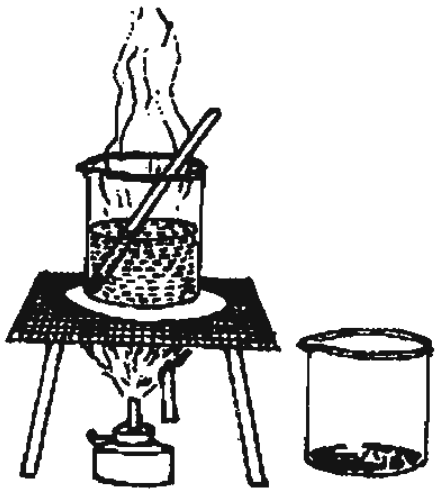

চিত্র ২.৭ তুঁতে পানির দ্রবণ থেকে তুঁতে পৃথকীকরণ

অধ্যায়ের নতুন শব্দ

যৌগিক পদার্থ	অক্সিজেন	পরিস্রুত	
বাষ্পীভবন			
মিশ্র পদার্থ	কার্বন ডাইঅক্সাইড	সোডিয়াম ক্লোরাইড	গন্ধক
উদ্বায়ী পদার্থ	সমসত্ত্ব	ক্লোরিন	নাইট্রোজেন
রাসায়নিক বিক্রিয়া	পরিস্রাবণ	সোডিয়াম	আয়রন সালফাইড
নিশাদল	আস্রাবণ	পাতন	দ্রবণ
হাইড্রোজেন	বাষ্পীকরণ	ঘনীভবন	দ্রব

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. গঠন অনুসারে পদার্থকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ?
ক. ১টি খ. ২টি
গ. ৩টি ঘ. ৪টি

২. যে পদার্থকে ভাঙলে অন্য কোনো ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ পাওয়া যায় না তাকে কী বলে ?
ক. মৌলিক পদার্থ খ. তরল পদার্থ
গ. যোগিক পদার্থ ঘ. মিশ্র পদার্থ

৩. নিচের কোনটি থেকে দ্রব ও দ্রাবক দুটোই ফিরে পাওয়া যায় ?
ক. পাতন খ. পরিস্রাবণ
গ. বাষ্পীভবন ঘ. আস্রাবণ

৪. লবণ পানির দ্রবণ থেকে লবণ ও পানি কোন পদ্ধতিতে ফেরত পাওয়া যাবে ?
ক. বাষ্পীভবন খ. পাতন
গ. উর্ধ্বপাতন ঘ. ঘণীভবন

৫. কোন পদার্থের উপাদানগুলো সমসত্ত্ব বিশিষ্ট হয় ?
ক. ধুলাযুক্ত পানি খ. বিশুদ্ধ পানি
গ. লবণ বালির মিশ্রণ ঘ. লবণ ও পানির মিশ্রণ

৬. পড়ার টেবিলে দুই চার ফোঁটা পানি ফেলে রাখলে কিছুক্ষণ পর তা শুকিয়ে যায়। এ প্রক্রিয়াটি হলো
i. বাষ্পীভবন
ii. বাষ্পীকরণ
iii. উর্ধ্বপাতন।

নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

লবণ চাষী রহিম তার জমিতে সমুদ্রের পানি বাঁধ দিয়ে আটকিয়ে রাখেন। বেশ কিছুদিন পর তার খেতে লবণ জমা হয়। তিনি এ লবণ পরিশোধন করে বাজারে বিক্রি করেন।

৭. রহিম কোন প্রক্রিয়ায় লবণ উৎপন্ন করেন ?

ক. বাষ্পীভবন
খ. বাষ্পীকরণ
গ. উর্ধ্বপাতন
ঘ. ছাকন

৮. রহিম লবণ পরিশোধন করে

i. পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায়
ii. থিতানো প্রক্রিয়ায়
iii. পাতন প্রক্রিয়ায়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. i ও ii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

ক খ

চিত্র

ক. 'ক' পাত্রের উপাদানগুলোকে একত্রে কী বলে ?

খ. 'ক' পাত্র থেকে তুঁতে আলাদা করার পদ্ধতির সাথে অভিস্রবণের ২টি পার্থক্য লেখ।

গ. 'ক' পাত্রের উপাদানগুলো কীভাবে পৃথক করা যায়। বর্ণনা কর।

ঘ. 'খ' পাত্রের উপাদানগুলো 'ক' পাত্রের উপাদানগুলোর ন্যায় আলাদা করা সম্ভব কিনা? যুক্তি দাও।

২.

চিত্র

উপরের চিত্র অনুসারে নিচের প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও।

ক. বিকারে রক্ষিত পদার্থসমহকে একত্রে কী বলা হয় ?

খ. বিকারে পানি ঢাললে কী হবে ব্যাখ্যা কর।

গ. মিশ্রিত উপাদানগুলো কীভাবে পৃথক করা যায় ?

ঘ. দৈনন্দিন জীবনে এ ধরনের পৃথকীকরণ কীভাবে ব্যবহৃত হয়? তা ব্যাখ্যা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

বায়ু

বায়ুর অস্তিত্ব

বায়ু পৃথিবীকে ঘিরে আছে। আমরা বায়ুর মধ্যে ডুবে আছি। বায়ু না থাকলে আমরা দুই তিন মিনিট সময়ও বাঁচতে পারব না। শুধু মানুষ কেন, বায়ু ছাড়া জীবজন্তু, গাছপালা কিছুই বাঁচতে পারে না। এ জন্য বায়ুর অপর নাম জীবন। চাঁদে বায়ু নেই বলে সেখানে কোনো প্রাণী নেই।

বায়ু আমরা চোখে দেখি না। কিন্তু বায়ুর চলাচল আমরা সহজেই অনুভব করতে পারি। বায়ু বইলে গাছের পাতা নড়ে। গ্রীষ্মকালে শীতল বায়ু আমাদের শরীর ঠাণ্ডা করে। প্রবল বেগে বায়ু বয়ে যাওয়াকে ঝড় বলে। ঝড় বড় বড় গাছপালা উপড়ে ফেলে, বাড়িঘর ফেলে দেয়। তোমরা রঙিন বেলুনে বায়ু ভরে উৎসব কর। সাইকেলের টায়ারে বায়ু ভরে তাতে চড়ে যাতায়াত কর। আবার ফুটবল, ভলিবলে বায়ু ভরে তোমরা খেলাধুলা কর। কাজেই আমরা চোখে না দেখলেও বায়ুর যে অস্তিত্ব আছে তা সহজেই বুঝতে পারি। এখন প্রশ্ন হল, আমরা যে বায়ুর সমুদ্রে ডুবে আছি সে বায়ু কি একটি পদার্থ?

বায়ু একটি পদার্থ

পদার্থ কাকে বলে তোমরা আগেই জেনেছ। পদার্থের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা তোমাদের মনে পড়ে কি? পদার্থের ওজন আছে, পদার্থের আয়তন আছে বা পদার্থ জায়গা দখল করে এবং পদার্থ বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে। পদার্থের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানার পর স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, বায়ুর পদার্থের ন্যায় ধর্ম আছে কি? অর্থাৎ, বায়ুর ওজন আছে কিনা, বায়ু স্থান দখল করে কিনা এবং বায়ু বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে কিনা। এক কথায় বায়ু পদার্থ কিনা?

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমরা আগের শ্রেণীতে জেনেছ। তোমরা লক্ষ করেছ বেলুন, ফুটবল, সাইকেলের টায়ার ইত্যাদিতে পাম্পের সাহায্যে বায়ু ভর্তি করলে ফুলে উঠে। বায়ু ভর্তি করলে এগুলো ফুলে উঠে কেন বলতে পার? কারণ বায়ু জায়গা দখল করে। তোমরা বেলুন ফুলিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পার। শুধু তা নয়, বায়ুর কিন্তু ওজনও আছে। তোমরা দুইটি বেলুন ফুলিয়ে একটি কাঠির দুই মাথায় বেঁধে দাও। কাঠিটির ঠিক মাঝখানে সুতা দিয়ে বেঁধে একটি নিক্তির মত কর। এবার একটি বেলুন পিন দিয়ে ফুটা করে দিলে দেখবে কাঠির অন্য প্রান্ত নিচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কেন ঝুঁকে পড়েছে বলতে পার? কারণ একটি বেলুন থেকে ছিদ্র দিয়ে বায়ু বের হয়ে যাওয়ায় এ প্রান্তটি হালকা হয়ে গেছে। তাই অন্য প্রান্তটি ঝুঁকে পড়েছে।

বায়ু বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে। এটিও তোমরা পরীক্ষা করে দেখতে পার। কিছু কাগজ মুচড়ে নিয়ে একটি গ্লাসের ভিতর এমনভাবে ঢুকিয়ে দাও যেন গ্লাসটি উপুড় করলে কাগজটি পড়ে না যায়। এবার এক বালতি পানি নিয়ে গ্লাসটি উপুড় করে ডুবানোর চেষ্টা কর। গ্লাসটিকে সহজেই পানিতে ডুবনো যাচ্ছে কি? বল প্রয়োগ করে গ্লাসটি ডুবাও। সাবধান, গ্লাসটি যেন কাত না হয়। এবার যেভাবে গ্লাসটি পানিতে ডুবিয়েছ, একটুও নাড়াচাড়া না করে তা পানি থেকে উপুড় করা অবস্থাতেই তুলে আন। কাগজটি লক্ষ কর। এটি কি পানিতে ভিজে গেছে? না, একটুও ভিজেনি। আচ্ছা বলতে পার গ্লাসটি কেন সহজেই ডুবানো যাচ্ছিলনা? কেন বল প্রয়োগ করে এটি পানিতে ডুবানো হয়েছে? কেনই বা গ্লাসের কাগজটি পানিতে ভিজেনি। এর কারণ হল গ্লাসের খালি জায়গা বাতাস দখল করে ছিল, যা গ্লাসটিকে পানিতে ডুবতে বাধা দিচ্ছিল। সে কারণেই গ্লাসটিকে পানিতে ডুবানোর জন্য তোমাকে সামান্য বল প্রয়োগ করতে হয়েছিল। আর গ্লাসের ভিতর বাতাস ছিল বলেই কাগজটি পানির সংস্পর্শে আসতে পারেনি। তাই কাগজও ভিজেনি। এ পরীক্ষা থেকে বোঝা যায় বায়ু জায়গা দখল করে এবং বায়ু বল প্রয়োগে বাধা দেয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি বায়ু স্থান দখল করে, বায়ুর ওজন আছে এবং বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে। অতএব, বায়ু একটি পদার্থ।

বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তোমরা পদার্থ ও তার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে জেনেছ। বায়ু একটি মৌলিক বা যৌগিক পদার্থ নয়, বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ। মিশ্র পদার্থ কাকে বলে তোমাদের মনে আছে কি?

দুই বা ততোধিক মৌলিক বা যৌগিক পদার্থ যে কোনো অনুপাতে মেশালে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তার মধ্যে যদি মিশ্রিত পদার্থগুলোর ধর্ম ও নিজ নিজ গুণের কোনো পরিবর্তন না হয়, মিশ্রিত উপাদানগুলো পাশাপাশি অবস্থান করে এবং উপাদানগুলোকে সহজে পৃথক করা যায় তবে তাকে মিশ্র পদার্থ বলে। বায়ু যে একটি মিশ্র পদার্থ নিচে যুক্তির মাধ্যমে তার প্রমাণ দেওয়া হল।

১। মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলোকে সহজে পৃথক করা যায়। বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ বলেই এর উপাদানগুলোকে সহজে পৃথক করা যায়।

২। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ৪ ভাগ নাইট্রোজেন ও ১ ভাগ অক্সিজেন মিলিত হয়ে যখন বায়ু উৎপন্ন করে তখন তাপের কোনো পরিবর্তন হয় না। এই মিশ্রণটির ধর্ম বাতাসের ধর্মের অনুরূপ। অতএব বলা যায় যে বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ।

৩। বায়ুতে কখনও অক্সিজেন বেড়ে যায়, আবার কখনও কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যায়। এই উপাদানগুলো সব জায়গার বায়ুতে সমান থাকে না। জলাভূমির বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও মিথেন গ্যাস বেশি থাকে। বড় বড় শহরের বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি থাকে। কারণ শহরে জনবসতি ঘন। যানবাহন ও কলকারখানা বেশি। এদের নির্গত ধোঁয়াতে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেশি থাকে। তাছাড়া গ্রামের চেয়ে শহর অঞ্চলে গাছপালাও অনেক কম। যেখানে বৃক্ষ বেশি সেখানকার বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ একটু বেশি। এজন্য বনাঞ্চলে ও শস্য ক্ষেতের বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ সাধারণ বায়ুর চেয়ে বেশি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কিছুটা কম। আবার উপরের বায়ুতে নিচের বায়ু অপেক্ষা অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে। এ জন্য পর্বতারোহী ও বিমান যাত্রীদের অতিরিক্ত অক্সিজেন সঙ্গে নিতে হয়, যাতে শ্বাসকার্যে কোনো অসুবিধা না হয়। এ সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা গেল বিভিন্ন স্থানের বায়ুতে এর উপাদানের তারতাম্য দেখা যায়। তাই বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ। বায়ু যৌগিক পদার্থ হলে সব জায়গাতেই বায়ুর উপাদান সর্বদা সমান থাকত।

৪। বায়ুর ঘনত্ব সব জায়গায় এক নয়। অর্থাৎ বায়ু হল অসমসত্ব। বায়ু যৌগিক পদার্থ হলে সমসত্ব হত, অর্থাৎ সব জায়গার বায়ুর ঘনত্ব একই হত।

৫। বায়ুর মধ্যে উপাদানগুলোর ধর্ম লোপ পায় না। বায়ুর ধর্ম হল উপাদানগুলোর ধর্মের সমষ্টি। বায়ুর মধ্যে উপাদানগুলোর ধর্ম বর্তমান থাকে। যেমন অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন উভয়ে বর্ণহীন, গন্ধহীন গ্যাস। বায়ুও বর্ণহীন, গন্ধহীন গ্যাস। অক্সিজেন জ্বলতে সাহায্য করে, বায়ুও জ্বলতে সাহায্য করে। বায়ু যৌগিক পদার্থ হলে এর মধ্যে অক্সিজেন বা নাইট্রোজেনের কোনো ধর্ম বজায় থাকত না, লোপ পেত।

এ সমস্ত যুক্তি থেকে প্রমাণ করা যায় যে বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ।

বায়ুর উপাদান

আমরা জেনেছি যে বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ। বায়ুর দুইটি প্রধান উপাদান হল অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। এছাড়া বায়ুর মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প, খুব সামান্য পরিমাণে হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন ইত্যাদি নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং ধূলিকণা রয়েছে। আয়তন ও ওজন হিসেবে বায়ুর উপাদানগুলোর মোটামুটি শতকরা পরিমাণ নিচে দেওয়া হল :

ছক ৩.১ : বায়ুর উপাদান ও এর শতকরা পরিমাণ

বায়ুর উপাদান	ওজন হিসেবে শতকরা পরিমাণ	আয়তন হিসেবে শতকরা পরিমাণ
নাইট্রোজেন	৭৫.৫০	৭৭.১৬
অক্সিজেন	২৩.১০	২০.৬০
জলীয় বাষ্প	০.০৬	১.৪০
কার্বন ডাইঅক্সাইড	০.০৪	০.০৪
নিষ্ক্রিয় গ্যাস	১.৩০	০.৮০

বায়ুর মধ্যে উপাদানগুলোর উপস্থিতি পরীক্ষা

(ক) বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের উপস্থিতি পরীক্ষা

বায়ু ছাড়া আগুন জ্বলে না। বায়ুর যে উপাদান আগুন জ্বলতে সাহায্য করে তার নাম অক্সিজেন। যে কোনো দহনের জন্য বায়ুর প্রয়োজন। এছাড়া আমাদের শ্বাসকাজের জন্য বায়ু অত্যন্ত প্রয়োজন।

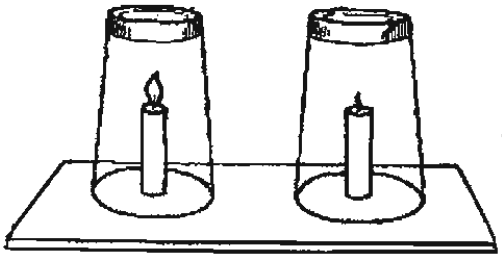

(ক) (খ)

চিত্র ৩.১ : বায়ু ছাড়া আগুন জ্বলে না

একটি জ্বলন্ত মোমবাতি একটি কাচের গ্লাস বা জার দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দাও যেন বাইরে থেকে বায়ু ঢুকতে না পারে (চিত্রে–ক)। কিছুক্ষণ পর দেখবে মোমবাতিটি নিভে গেল (চিত্রে–খ)। এ পরীক্ষা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বায়ু ছাড়া আগুন জ্বলে না।

এখন প্রশ্ন হলো : বায়ুর সবটুকু কি আগুন জ্বলতে সাহায্য করে? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য নিচের পরীক্ষাটি সম্পাদন কর:

একটি জ্বলন্ত মোমবাতিকে একটি বড় বাটিতে বসাও। সাবধানে বাটিতে পানি ঢাল যেন মোমবাতির প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত পানি উঠে। একটি খালি গ্লাস বা জার (আসলে খালি নয়, বায়ু ভর্তি) সাবধানে বাটি ও মোমবাতির উপর উপুড় করে বসাও যাতে গ্লাসের মুখ পানির নিচে থাকে। পানির উপরিতল বরাবরে গ্লাসে একটি দাগ দিয়ে রাখ। এবারে পরীক্ষাটি ভালভাবে লক্ষ কর এবং পরীক্ষা থেকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে চেষ্টা কর:

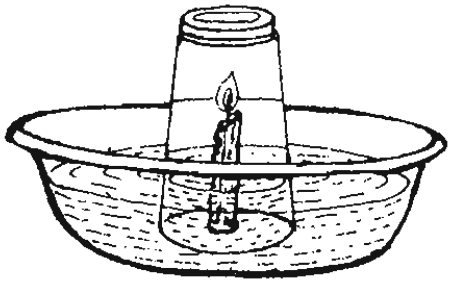

চিত্র ৩.২ : বায়ুতে অক্সিজেনের উপস্থিতি পরীক্ষা

১। বাতিটি কি নিভে গেল? বাতিটি কি সাথে সাথে নিভে গেল না কিছুক্ষণ পর নিভে গেল?

২। গ্লাস বা জারের ভেতরের পানি কি উপরে উঠেছে? কতটুকু উপরে উঠেছে?

তোমরা লক্ষ করলে দেখতে পাবে

১। বাতিটি নিভে গেল। মোমবাতিটি কিছুক্ষণ জ্বলার পর ধীরে ধীরে তা নিভে গেল।

২। গ্লাসের ভেতরের পানি ধীরে ধীরে উপরে উঠছে। কিছুক্ষণ পর গ্লাসের খালি অংশের (আসলে বায়ুপূর্ণ ছিল) পাঁচ ভাগের এক ভাগ পানিতে ভরে গেল।

গ্লাসের পাঁচ ভাগের একভাগ পানিতে ভরে গেছে এবং চার ভাগ খালি রয়েছে। মোমবাতির দহনে গ্লাসের সবটুকু বায়ু ব্যয় হয়নি বা পুড়ে যায়নি। সবটুকু বায়ু পুড়ে গেলে সম্পূর্ণ গ্লাসটিই পানিতে পূর্ণ হতো।

বায়ুর যে এক পঞ্চমাংশ বা ৫ ভাগের ১ ভাগ দহনে ব্যয় হয়েছে, বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন অক্সিজেন। সুতরাং বাতাসের প্রায় ৫ ভাগের ১ ভাগ হল অক্সিজেন। অক্সিজেন ছাড়া আগুন জ্বলে না, অক্সিজেন ছাড়া শ্বাসকার্যও চলে না। তাহলে তোমরা দেখতে পেলে বাতাসের প্রায় ৫ ভাগের ১ ভাগ অক্সিজেন। বাকি ৪ ভাগ কী?

পূর্বের পরীক্ষাটি তোমার আর একবার কর এবং জ্বলন্ত মোমবাতিটি যখন নিভে যাবে তখন পানির উপর থেকে জার বা গ্লাসটির মুখে ঢাকনা দিয়ে উপুড় করা অবস্থায় সাবধানে তুলে আন। একটি জ্বলন্ত কাঠি এর ভিতর ঢুকাও। কী হল? জ্বলন্ত কাঠিটি খুব তাড়াতাড়ি নিভে গেল। তাহলে বোঝা গেল বায়ুর অবশিষ্ট ৫ ভাগের ৪ ভাগে এমন কিছু আছে যা আগুন জ্বলতে সাহায্য করে না। বিজ্ঞানীরা বায়ুর এই উপাদানটির নাম দিয়েছেন নাইট্রোজেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি, বায়ুর ৫ ভাগের ৪ ভাগে আছে নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য উপাদান। নাইট্রোজেন দহনে সাহায্য করে না।

(খ) বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতি পরীক্ষা

বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতি পরীক্ষা তোমরা বাড়িতে করতে পার। একটি বাটিতে কিছুটা পরিষ্কার চুনের পানি নিয়ে রেখে দাও। বাটির মুখে ঢাকনা দেবে না। একদিন পর লক্ষ করলে দেখবে চুনের পানির উপর সাদা সর পড়েছে। বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড চুনের পানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই সর উৎপন্ন করেছে। এই সাদা সরটি হল ক্যালসিয়াম কার্বনেট। বায়ুর মধ্যস্থ কার্বন ডাইঅক্সাইড চুনের পানি বা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সাদা রঙের অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন করে।

চিত্র ৩.৩ : বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতি পরীক্ষা

বায়ুর মধ্যে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে তা প্রমাণের জন্য শ্রেণীকক্ষে নিচের পরীক্ষাটি করবে। পরীক্ষাটির জন্য প্রয়োজন হবে একটি চওড়া মুখওয়ালা বোতল বা কনিক্যাল ফ্লাস্ক, দুইটি কাচনল এবং পরিষ্কার চুনের পানি।

বোতল বা কনিক্যাল ফ্লাস্কে পরিষ্কার চুনের পানি নিয়ে ফ্লাস্কের মুখে কর্ক লাগিয়ে কর্কের মধ্যে দুইটি নল লাগাও। একটি নল যেন ফ্লাস্কের তলা পর্যন্ত পৌঁছায়, আর একটি নল যেন সামান্য ভিতরে প্রবেশ করানো থাকে। এবার ছোট নলটিতে মুখ দিয়ে বাতাস টানতে থাকো। দেখবে বড় নলের মধ্য দিয়ে বাতাস চুনের পানির মধ্যে ঢুকছে আর বুদবুদ কেটে বেরিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ ধরে এভাবে বাতাস টানার পর দেখবে পরিষ্কার চুনের পানি ঘোলা হয়ে গেছে। এর দ্বারা বোঝা গেল, বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে।

(গ) বায়ুতে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি পরীক্ষা

একটি কাচের গ্লাসে কিছু বরফ নিয়ে বরফসহ গ্লাসটিকে কিছুক্ষণ বাতাসে রেখে দাও। গ্লাসের বাইরের পিঠ লক্ষ কর। কী দেখছ? গ্লাসের বাইরের পিঠে বিন্দু বিন্দু পানি জমা হয়েছে। এ পানি কোথা থেকে এলো?

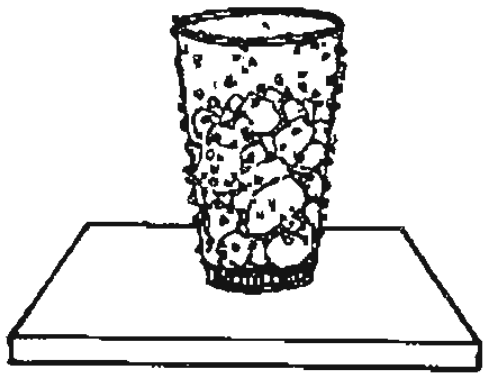

চিত্র ৩.৪ : বায়ুতে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি পরীক্ষা

এ পানি বাতাস থেকে এসেছে। বাতাসের জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা গ্লাসের সংস্পর্শে এসে শীতল ও ঘণীভূত হয়ে পানির কণায় পরিণত হয়েছে এবং গ্লাসের বাইরের গায়ে তা বিন্দু বিন্দু পানি হিসেবে জমা হয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি বাতাসে জলীয় বাষ্প আছে।

(ঘ) বায়ুতে ধূলিকণার উপস্থিতির পরীক্ষা

বাতাসে ধূলিকণা আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তোমরা নিচের কাজটি করবে। সকালে যখন জানালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঘরে ঢোকে, তখন আলোর পথটিকে ভালভাবে লক্ষ করলে দেখবে অসংখ্য ধূলিকণা বাতাসে ভেসে

বেড়াচ্ছে। এ থেকে বোঝা যায় বাতাসে ধূলিকণা আছে।

দহন ও শ্বাসকার্যে বায়ুর প্রয়োজনীয়তা

বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের উপস্থিতি পরীক্ষায় তোমরা জেনেছ বায়ু ছাড়া আগুন জ্বলে না। বায়ুর যে উপাদান আগুন জ্বলতে সাহায্য করে তার নাম অক্সিজেন। এই পরীক্ষা থেকে তোমরা আরও জেনেছ যে বায়ুর প্রায় ৫ ভাগের ১ ভাগ অক্সিজেন। ৫ ভাগের বাকি ৪ ভাগ আছে নাইট্রোজেন ও অন্যান্য উপাদান। বাতাসের নাইট্রোজেন ও অন্যান্য উপাদান দহন কার্যে সাহায্য করে না। একমাত্র অক্সিজেনই দহনে সাহায্য করে।

আমরা বায়ু সমুদ্রে ডুবে আছি। বায়ু ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। এ জন্য বায়ুর আর এক নাম জীবন। শ্বাসকার্যে আমরা প্রতি মুহূর্তে বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ করছি। যে বাতাস আমরা গ্রহণ করি তাতে সাধারণত অধিক অক্সিজেন থাকে (শতকরা ২০ ভাগ)। যে বাতাস আমরা ত্যাগ করি তাতে অপেক্ষাকৃত কম অক্সিজেন (শতকরা ১৬ ভাগ) এবং বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড (শতকরা ৪ ভাগ) থাকে। উভয় প্রকার বাতাসেই নাইট্রোজেনের পরিমাণ সমান থাকে। শ্বাস নেওয়ার সময় আমরা বাতাস টেনে নেই। এই বাতাসের কিছু অক্সিজেন আমাদের রক্তের সাথে ফুসফুসে চলে যায় এবং দূষিত রক্তের সঙ্গে মিশে রক্তকে বিশুদ্ধ করে।

ফলে

১। দেহে শক্তি উৎপন্ন হয়।

২। দেহে তাপ উৎপন্ন হয় এবং এই তাপই প্রাণিদেহের উষ্ণতা বজায় রাখে।

৩। কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্ত থেকে বেরিয়ে ফুসফুসে আসে ফলে নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমরা যে বায়ু ছেড়ে দেই তাতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়।

নিঃশ্বাসের বাতাসে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য নিচের পরীক্ষাটি কর।

পরীক্ষা

একটি পাত্রে পরিষ্কার চুনের পানি নিয়ে পাত্রটি থেকে এক বাটি চুনের পানি বাতাসে রেখে দাও। ধীরে ধীরে চুনের পানি ঘোলা হয়ে যাবে এবং উপরে সর পড়বে। এভাবে চুনের পানি সাদা হতে বেশ সময় লাগবে। তাই এই পরীক্ষাটি তোমরা বাড়িতে করবে। এবার পাত্রটি থেকে আর এক বাটি পরিষ্কার চুনের পানি নাও।

পাটকাঠি কিংবা বাঁশের ফাপা কঞ্চি কিংবা স্ট্র কিংবা গ্লাস টিউব চুনের পানিতে ডুবিয়ে ফু দাও। দেখবে চুনের পানি খুব তাড়াতাড়ি ঘোলা হয়ে গেছে। চুনের পানিতে ফু দেওয়ার ফলে চুনের পানি তাড়াতাড়ি ঘোলা হল কেন?

আমাদের নিঃশ্বাসের সাথে আমরা যে বায়ু ত্যাগ করি তাতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেশি থাকে। চুনের পানিতে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত হওয়াতে চুনের পানি তাড়াতাড়ি ঘোলা বা সাদাটে হয়েছে। কার্বন ডাই অক্সাইড পরিষ্কার চুনের পানিকে ঘোলা করে।

চিত্র ৩.৫ : নিঃশ্বাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতি পরীক্ষা

বায়ু অমূল্য সম্পদ। বায়ু ছাড়া কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ কিছুই বাঁচতে পারে না। আমরা যে শুধু শ্বাসকাজেই বায়ু ব্যবহার করি তা নয়, বায়ু সমগ্র উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের জন্য খাদ্য

যোগায়। আমাদের নিঃশ্বাস থেকে প্রতি মুহূর্তে বায়ুমণ্ডলে প্রচুর কার্বন ডাইঅক্সাইড যোগ হচ্ছে। গাছপালা তাদের খাদ্য প্রস্তুতের জন্য বায়ু থেকে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করছে এবং সালোক–সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ নিজেদের খাদ্য নিজেই তৈরি করছে। খাদ্য তৈরির জন্য উদ্ভিদ মাটি থেকে শিকড়ের সাহায্যে পানি গ্রহণ করে। বিক্রিয়াটি দেখানো হল:

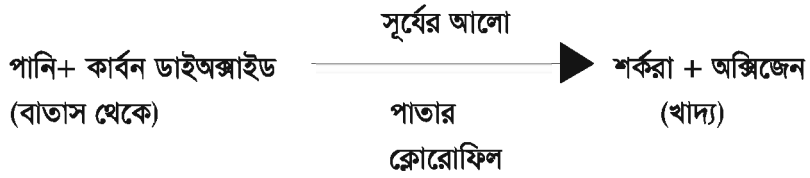

আমরা মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু উদ্ভিদ থেকেই আমাদের খাদ্য পেয়ে থাকি। খাদ্য তৈরির সময় গাছপালা বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। আমরা মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু বায়ু থেকে এই অতিরিক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং পুনরায় নিঃশ্বাসের মাধ্যমে অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করি। এভাবেই প্রকৃতির রাজ্যে সৃষ্টি হয় এক অদ্ভুত ভারসাম্যতা।

উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে নাইট্রোজেনের গুরুত্ব

আমরা জানি বায়ুর প্রায় ৫ ভাগের ৪ ভাগ নাইট্রোজেন। প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য নাইট্রোজেন এর গুরুত্ব অপরিসীম। বায়ুতে যদি নাইট্রোজেন না থাকত তবে শ্বাস–প্রশ্বাসের সময় আমরা শুধু অক্সিজেন গ্রহণ করতাম। আমরা জানি অক্সিজেন দহন ক্রিয়ায় সাহায্য করে। শ্বাস–প্রশ্বাসে শুধুমাত্র অক্সিজেন গ্রহণ করলে দহন ক্রিয়া অতি দ্রুত সম্পন্ন হত। ফলে জীবন ধারণ সম্ভব হত না।

অক্সিজেনের সাথে নাইট্রোজেন মিশ্রিত থাকায় বায়ু লঘু থাকে। ফলে শ্বাসকার্য ও শরীরের অভ্যন্তরে দহন ক্রিয়া সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে এবং পরিমিত গতিতে সম্পন্ন হয়। বায়ুতে যদি নাইট্রোজেন না থাকতো তবে দহন ক্রিয়া এত তীব্র হত যে কোথাও আগুন লেগে গেলে তা নিভানো যেতো না।

উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের পুষ্টির জন্য নাইট্রোজেন বিশেষ প্রয়োজন। ছোলা, মটর, শিম প্রভৃতি কতিপয় উদ্ভিদ বায়ু থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। এছাড়া অবশিষ্ট বিশাল উদ্ভিদ জগত ও প্রাণিজগতের কেউ বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেন সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। উদ্ভিদ মাটির সঙ্গে মিশ্রিত নাইট্রেট লবণ থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। তৃণভোজী প্রাণী সরাসরি উদ্ভিদ থেকে এবং মাংসভোজী প্রাণী অন্য প্রাণিদেহ থেকে প্রোটিন হিসেবে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে থাকে। উদ্ভিদ ও প্রাণী সকলেই নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। ফলে প্রকৃতি থেকে নাইট্রোজেন শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মে নাইট্রোজেন বায়ু থেকে মাটিতে, মাটি থেকে উদ্ভিদে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে এবং প্রাণী থেকে পুনরায় মাটিতে এবং মাটি থেকে বায়ুতে ফিরে আসে। ফলে বাতাসে নাইট্রোজেন চক্র চলে। পরবর্তী শ্রেণীতে তোমরা এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে।

পরিচিত সারে নাইট্রোজেনের উপস্থিতি

নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক সার হল ইউরিয়া এবং অ্যামোনিয়াম সালফেট। ইউরিয়া সারে শতকরা ৪৬ ভাগ এবং অ্যামোনিয়াম সালফেট সারে শতকরা ২১ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। এই দুইটি সার ব্যবহারে গাছের শাখা প্রশাখা দ্রুত বাড়ে। গাছপালাকে ঘন সবুজ রং প্রদান করে এবং ফলন বাড়ায়।

বায়ু দূষণ ও তার প্রতিরোধ

দূষিত বায়ু

যে বায়ুতে দূষিত গ্যাস, রোগজীবাণু, ধূলিকণা ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে তাকে দূষিত বায়ু বলে।

বিশুদ্ধ বায়ু

যে বায়ুতে পরিমিতি পরিমাণ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে কিন্তু ধূলিকণা, ধোঁয়া, কোনো প্রকার দূষিত গ্যাস, রোগজীবাণু বা অন্য কোনো খারাপ পদার্থ নেই তাকে বিশুদ্ধ বায়ু বলে।

বায়ু দূষণের কারণ

যে সব কারণে বায়ু দূষিত হয় নিচে তার বিবরণ দেওয়া হল:

১। ধুলাবালি, ধোঁয়া, কালির ঝুল, জীবাণু, পাটের আঁশ ও অন্যান্য জৈব ও অজৈব পদার্থ বায়ুকে দূষিত করে থাকে।

২। আবর্জনা, খোলা নর্দমা, হাজামজা পুকুর, পচা জলাশয়, খোলা পায়খানা ইত্যাদি থেকে নির্গত গ্যাস বায়ু দূষিত করে।

৩। কলকারখানার নির্গত ধোঁয়া, রেলগাড়ি, মটরগাড়ি, লঞ্চ, টেম্পোর তেল, পেট্রোল পোড়া গ্যাস ও ধোঁয়া বায়ুর সঙ্গে মিশে বায়ুকে দূষিত করে।

৪। জীবজন্তুর গলিত মৃতদেহ হতে যে গ্যাস বের হয় তা বায়ুকে দূষিত করে থাকে।

৫। কেরোসিন তৈল, পাথুরিয়া কয়লা দহনের ফলে সালফার ডাইঅক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, রান্নার ধোঁয়া ইত্যাদি বায়ুকে দূষিত করে থাকে।

৬। বায়ু বাহিত রোগ যেমন, বসন্ত, যক্ষা ইত্যাদি রোগীর হাঁচি, কাশি, কফ, থুথুর সঙ্গে নানা রোগজীবাণু বায়ুতে মিশে বায়ুকে দূষিত করে।

৭। ইটের কারখানা, সিগারেটের ধোঁয়া, চামড়ার কারখানা, শূটকীর খলা, শ্মশান ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন গ্যাস বায়ুকে দূষিত করে থাকে।

বায়ু বিশুদ্ধকরণ ও দূষণ প্রতিরোধ

বায়ু নিম্নোক্ত দুইটি উপায়ে বিশুদ্ধ করা যায়। যথা ১. প্রাকৃতিক উপায়ে ও ২. কৃত্রিম উপায়ে

১। প্রাকৃতিক উপায়ে

(ক)সূর্যকিরণের সাহায্যে : সূর্যকিরণের অতি–বেগুণি রশ্মি ও উত্তাপ বায়ুতে ভাসমান রোগজীবাণু ও অন্যান্য ক্ষতিকর জীবাণু ধ্বংস করে বায়ু বিশুদ্ধ করে। এছাড়া সূর্যকিরণ সমস্ত আর্দ্র জিনিস শুষ্ক করে পচন রোধ করে। ফলে বায়ু বিশুদ্ধ থাকে।

(খ) গাছপালার সাহায্যে : গাছপালার সবুজ পাতা আলোর সাহায্যে বায়ু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে খাদ্য প্রস্তুত করে ও অক্সিজেন ত্যাগ করে, ফলে বায়ু বিশুদ্ধ হয়।

(গ) বৃষ্টিপাতের সাহায্যে : বৃষ্টির সঙ্গে বায়ুর গ্যাস ও ভাসমান পদার্থ ভূমিতে পতিত হয় ও মাটির সঙ্গে মিশে যায়। ফলে বায়ু বিশুদ্ধ হয়।

(ঘ) ওজোনের সাহায্যে : আকাশের বজ্রপাত ওজোন গ্যাস সৃষ্টি করে। এই ওজোন গ্যাস বায়ুতে ভাসমান জীবাণু ধ্বংস করে বায়ু বিশুদ্ধ করে।

২। কৃত্রিম উপায়ে

বাসগৃহ, কলকারখানা ও এর আশপাশের বায়ু নানা কারণে দূষিত হয়। এসব এলাকায় কৃত্রিম উপায়ে বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা করে বায়ু বিশুদ্ধ করা যায়। পল্লী অঞ্চল অপেক্ষা শহরাঞ্চলে এই পদ্ধতি অধিক উপযোগী।

(ক) বায়ু সঞ্চালনের সাহায্যে : কোনো বন্ধ স্থানে গতিহীন বায়ু অপসারণ এবং সে জায়গায় শুষ্ক, শীতল ও গতিশীল বায়ু আনয়নকে বায়ু সঞ্চালন বলে।

(খ) **প্রপালশান পদ্ধতি :** ঘরে এক দিকে দেওয়াল ছিদ্র করে সেখানে একটি বৈদ্যুতিক পাখা বসান হয়। এ পাখার সাহায্যে বাহির থেকে বিশুদ্ধ বায়ু টেনে ঘরের ভিতরে আনা হয় এবং ঘরের দূষিত বায়ু বের হয়ে যায়।

(গ) **বায়ু নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার মাধ্যমে :** গৃহের অভ্যন্তরে বায়ু বিশুদ্ধ রাখা যায়। রেলগাড়ি, মটরগাড়ি, সিনেমা হল, হোটেল, অফিস বাসগৃহ ইত্যাদিতে আজকাল এর বহুল প্রচলন হচ্ছে।

এছাড়া বর্জ্য পদার্থ যেখানে সেখানে না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে ঢেকে রাখা, বাড়ি ঘরের আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, নর্দমা পরিষ্কার রাখা এবং অযথা আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া সৃষ্টি না করলে বায়ু দূষণ মুক্ত থাকে।

এ অধ্যায়ের নতুন শব্দ

ঘনত্ব	আর্গন	ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড
শ্বাসকার্য	নিষ্ক্রিয় গ্যাস	সালোকসংশ্লেষণ
কনিক্যাল ফ্লাস্ক	ক্যালসিয়াম কার্বনেট	নাইট্রেট
জলীয় বাষ্প	ভারসাম্যতা	প্রোটিন
ফুসফুস	বায়ু দূষণ	নাইট্রোজেন চক্র
মিথেন গ্যাস	প্রপালশান পদ্ধতি	অ্যামোনিয়াম সালফেট
হিলিয়াম	বায়ু সঞ্চালন	
নিয়ন	বর্জ্য পদার্থ	

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কোন জায়গার বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে ?
   ক. শহরের বায়ুতে খ. শিল্প কারখানা এলাকার বায়ুতে
   গ. বনাঞ্চল ও শস্য ক্ষেতের বায়ুতে ঘ. জলাভূমির বায়ুতে

২. বায়ুর কত অংশ আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে ?
   ক. সম্পূর্ণ অংশ খ. চার পঞ্চমাংশ
   গ. এক পঞ্চমাংশ ঘ. তিন চতুর্থাংশ

৩. কোন বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেশি থাকে ?
   ক. উপরের বায়ুতে খ. বনাঞ্চলের বায়ুতে
   গ. সমুদ্রের উপরের বায়ুতে ঘ. বড় বড় শহরের বায়ুতে

৪. একটি কাচের গ্লাসে কিছু বরফ রেখে দিলে গ্লাসের বাইরের পিঠে বিন্দু বিন্দু পানি জমে কেন ?
   ক. বাতাসে অক্সিজেন থাকার জন্য
   খ. বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকার জন্য
   গ. বরফ গলে গ্লাসের বাইরের দিকে জমা হওয়ার জন্য
   ঘ. বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকার জন্য

৫. গাছপালা খাদ্য প্রস্তুতের জন্য বায়ু থেকে কী গ্রহণ করে ?
   ক. অক্সিজেন খ. হাইড্রোজেন
   গ. নাইট্রোজেন ঘ. কার্বন ডাইঅক্সাইড

৬. বায়ুতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ সব সময়ই সমান থাকে

i. নাইট্রোজেন চক্রের কারণে
ii. জীব নাইট্রোজেন ব্যবহার করে না
iii. দহনে নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হয় না

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

চিত্র থেকে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

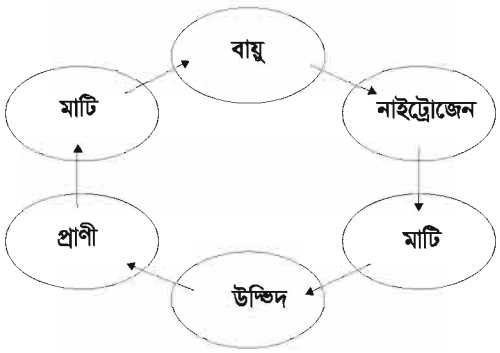

চিত্র

৭. প্রদর্শিত চিত্রটি কী নির্দেশ করে ?

ক. নাইট্রোজেন চক্র
খ. প্রাণী ও উদ্ভিদের সম্পর্ক
গ. মাটি ও বায়ুর সম্পর্ক
ঘ. উদ্ভিদ ও বায়ুর সম্পর্ক

৮. চিত্রটি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে

i. উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কারণে
ii. শিম জাতীয় উদ্ভিদের কারণে
iii. মাটিতে নাইট্রেট লবণের উপস্থিতির কারণে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

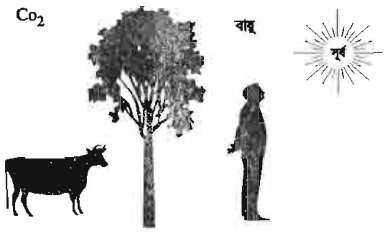

চিত্র

ক. সূর্যালোকে গাছটি বাতাসের কোন উপাদান গ্রহণ করে ?
খ. ছবিতে সূর্যালোকের প্রয়োজন কেন ?
গ. চিত্রে গাছ কীভাবে খাদ্য প্রস্তুত করে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. চিত্রে কার্বন ডাইঅক্সাইড না থাকলে ঐ পরিবেশের কী ঘটবে? ব্যাখ্যা কর।

২.

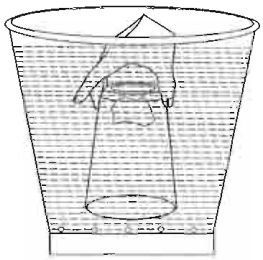

চিত্র

ক. চিত্রে কোন দিকে বল প্রয়োগ করা হয়েছে ?
খ. উক্ত দিকে কেন বল প্রয়োগ করা হয়েছে?
গ. চিত্র আনুযায়ী গ্লাসের ভিতরে কাগজের অবস্থা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উপরের পরীক্ষা থেকে বায়ু সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

৩.

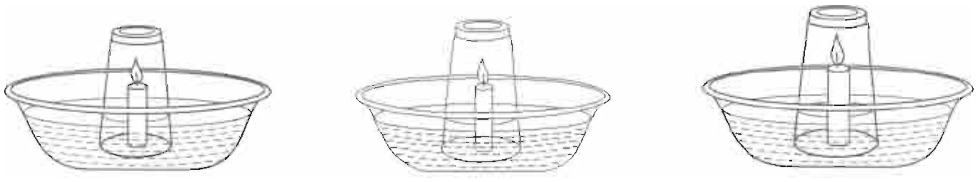

১ ২ ৩

চিত্র

ক. কোন চিত্রের মোমবাতিটি আগে নিভে যাবে ?
খ. মোমবাতিটি কেন আগে নিভে যাবে ?
গ. যদি লম্বা একটি জলন্ত মোমবাতি ২য় গ্লাস দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয় তবে চিত্র ৩ এর ক্ষেত্রে কী হবে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ১ ও ২ নম্বর পরীক্ষার আলোকে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কত হবে তা যুক্তিসহ লিখ।

চতুর্থ অধ্যায়

ধাতু ও অধাতু

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তোমরা পদার্থ এবং তার শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে জেনেছ। এবার মনে কর তো পদার্থ কাকে বলে? পদার্থ কত প্রকার ও কী কী? এ অধ্যায়ে তোমরা মৌলিক পদার্থের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানবে।

আমরা জানি পৃথিবীতে এ পর্যন্ত ১০৯টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে ৯২টি প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। বাকিগুলো গবেষণাগারে তৈরি করা হয়েছে। এই মৌলিক পদার্থ বা মৌলগুলোকে তাদের ধর্মের ওপর ভিত্তি করে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা ধাতু ও অধাতু। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, সালফার ইত্যাদি অধাতু মৌলের উদাহরণ। লোহা, তামা, সোনা, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম, টিন ইত্যাদি ধাতব মৌলের উদাহরণ। এসো, ধাতু বা অধাতু কাকে বলে এবং আমাদের পরিচিত কয়েকটি ধাতু ও অধাতুর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করি।

ধাতু

যে মৌল সাধারণ অবস্থায় কঠিন এবং দৃঢ়, উজ্জ্বল ও চকচকে এবং আলোক প্রতিফলিত করতে পারে, ওজনে ভারি, আঘাত করলে ঝন ঝন শব্দ হয় এবং যা তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী, সেই মৌলকে ধাতু বলে। লোহা, তামা, সোনা, রুপা, দস্তা, টিন, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি কয়েকটি ধাতুর উদাহরণ।

অধাতু

যে মৌল সাধারণ অবস্থায় কঠিন, তরল বা গ্যাসীয়, যা ওজনে হালকা, যা উজ্জ্বল বা চকচকে নয় এবং আলোক প্রতিফলিত করে না, যা গঠনে ভঙ্গুর, যাকে আঘাত করলে ধাতব শব্দ উৎপন্ন হয় না, যা তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী সেই মৌলকে অধাতু বলে। যেমন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার, কার্বন, হিলিয়াম, নিয়ন, আয়োডিন ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম ধর্মী কয়েকটি ধাতু ও অধাতু

পারদ ধাতু হলেও তরল। সোডিয়াম ধাতু পানির চেয়ে হালকা। কার্বন এবং সালফার অধাতু হলেও সাধারণ অবস্থায় কঠিন। গ্রাফাইট (কার্বন) অধাতু হলেও বিদ্যুৎ পরিবাহী। হীরক (কার্বন) অধাতু হলেও উজ্জ্বল আলোক প্রতিফলনে সক্ষম এবং কঠিনতম পদার্থ। আয়োডিন অধাতু হলেও চকচকে।

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কয়েকটি ধাতুর ধর্ম ও ব্যবহার

লোহা

ধাতুর মধ্যে লোহা সবচেয়ে বেশি পরিচিত এবং বহুল ব্যবহৃত। সাধারণ অবস্থায় লোহা কালো বর্ণের। কিন্তু বিশুদ্ধ লোহা উজ্জ্বল সাদা বর্ণের। লোহা চুম্বকে আকৃষ্ট হয়।

দৈনন্দিন জীবনে নানা কাজে আমরা লোহা ব্যবহার করে থাকি। দা, বটি, খুরপি, ছুরি, কাঁচি, কোদাল, কুড়াল, লাঙল, নিড়ানী ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনে এবং কৃষিকাজে ব্যবহার হয়। অনেক যন্ত্রপাতি লোহা দিয়ে তৈরি হয়। মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, নানা প্রকার অস্ত্র, লঞ্চ, জাহাজ, সেতু, শিল্পকারখানা, দালান কোঠা নির্মাণ করতে লোহা ব্যবহৃত হয়। যে দেশ যত বেশি লোহা ব্যবহার করে সে দেশ তত বেশি উন্নত। এক কথায় লোহার ব্যবহার কোনো দেশের উন্নতি পরিমাপের একটি নির্ধারক।

তামা

তামা এক বিশেষ তামাটে লাল রং এর উজ্জ্বল ধাতু। এটি নরম, ঘাতসহ ও নমনীয়। এর তাপ ও বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা খুবই বেশি। এ কারণে বাসায় বা অন্য যে কোনো স্থানে বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য তামার তার ব্যবহার করা হয়। এক টুকরা বৈদ্যুতিক তার নিয়ে পরীক্ষা করে দেখবে ওর মধ্যে বেশ কয়েকটি সরু তামার তার আছে। তামা আমরা নানা কাজে ব্যবহার করি। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও বৈদ্যুতিক লাইনের তারের জন্য তামা ব্যবহার করা হয়।

দৈনন্দিন জীবনেও তামার নানা ধরনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বাসন কোসন, মুদ্রা, ধাতব মূর্তি, জাহাজের প্রপেলার ইত্যাদি তৈরির কাজে তামা ব্যবহার করা হয়। পিতল, কাঁসা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি সংকর ধাতু তামা থেকে তৈরি। তোমাদের স্কুলের ঘণ্টাটিও তামার সংকর থেকে তৈরি। পৃথিবীতে প্রধান তামা উৎপাদনকারী দেশগুলো হল আমেরিকা, কানাডা, চিলি, মেক্সিকো, বেলজিয়াম, রোডেশিয়া, স্পেন, জার্মানী, রাশিয়া, জাপান ও ভারত।

অ্যালুমিনিয়াম

অ্যালুমিনিয়াম একটি হালকা নীলাভ সাদা ধাতু। এটা তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী। রান্নার জন্য বাসন পত্র, ডেগচি, কড়াই ইত্যাদি প্রস্তুত করতে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়। উড়োজাহাজ, মোটরগাড়ি, সেতু, সিড়ি ইত্যাদি নির্মাণ করতে অ্যালুমিনিয়ামের সংকর ধাতু ব্যবহার করা হয়। তিসির তেলের সাথে অ্যালুমিনিয়াম মিশিয়ে উজ্জ্বল ও চক চকে জানালা, দরজার ফ্রেম ইত্যাদি তৈরি করা হচ্ছে। ৯৫ ভাগ অ্যালুমিনিয়াম, ৪ ভাগ তামা, ০.৫ ভাগ ম্যাগনেসিয়াম ও ০.৫ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ ধাতু মিশিয়ে ডুরালুমিন নামক সংকর ধাতু তৈরি করা হয়। ডুরালুমিন অত্যন্ত হালকা। উড়োজাহাজ তৈরি করতে ডুরালুমিন ব্যবহার করা হয়।

রুপা

অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ রুপা ব্যবহার করে আসছে। রুপা প্রকৃতিতে আকরিক হিসেবে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকা, কানাডা, পেরু, মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে রুপা পাওয়া যায়।

রুপা উজ্জ্বল সাদা বর্ণের ধাতু। এটা খুব ঘাতসহ বলে একে সহজে পাতলা ও সরু তারে পরিণত করা যায়। রুপা তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী। অলংকার ও মুদ্রা তৈরি করতে রুপা ব্যবহার করা হয়। বিশুদ্ধ রুপা ও তামা মিশিয়ে নানা প্রকার ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরি করা হয়। দর্পণে প্রলেপ দেওয়ার জন্যও রুপা ব্যবহার করা হয়।

টিন

প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ টিন ব্যবহার করে আসছে। মিশর, চীন প্রভৃতি দেশের লোকেরা টিন ও কপারের সংকর ধাতু ব্রোঞ্জ ব্যবহার করত। বার্মায় (বর্তমানে মিয়ানমার) প্রচুর টিন পাওয়া যায়। দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ায় বিশ্বের প্রায় ৮০ ভাগ টিন পাওয়া যায়। টিন একটি সাদা বর্ণের পদার্থ। এর ঘাতসহতা খুব বেশি। একে পাতলা টিনে পরিণত করা যায়। সংকর ধাতু তৈরি করতে, বাসনপত্র ও পাত তৈরি করতে, টিন প্রলেপন ও রঙের কালাই করতে টিন ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে শহর ও গ্রাম অঞ্চলে ঘবরাড়ি তৈরি করতে সাধারণত টিন ব্যবহার করা হয়।

সোনা

সোনা অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু। তোমরা প্রায় সকলেই সোনা দেখেছ। এটি চকচকে ও সোনালী রঙের। আমাদের দেশে মেয়েরা স্বর্ণের তৈরি অলংকার ব্যবহার করে। শুধু আমাদের দেশে নয়, বিদেশেও মেয়েরা স্বর্ণের অলংকার ব্যবহার করে। স্বর্ণ মজুদের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশে মুদ্রার মান নির্ণয় করা হয়।

কৃষি যন্ত্রপাতিতে লোহা ও ইস্পাতের ব্যবহার

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের শতকরা প্রায় ৮০ জন লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষি কাজে যে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তাকে কৃষি যন্ত্রপাতি বলে। কৃষির দেশীয় ও আধুনিক যন্ত্রপাতি তৈরি করতে লোহা ও ইস্পাত ব্যবহার করা হয়। ইস্পাত সংকর ধাতু। লোহা থেকে ইস্পাত তৈরি করা হয়। কৃষিকাজে ব্যবহৃত কাস্তে, কুড়াল, কোদাল, খুরপি, নিড়ানী, লাঙলের ফলা, শাবল, দা, ছুরি ইত্যাদি সব যন্ত্রপাতিই লোহার তৈরি।

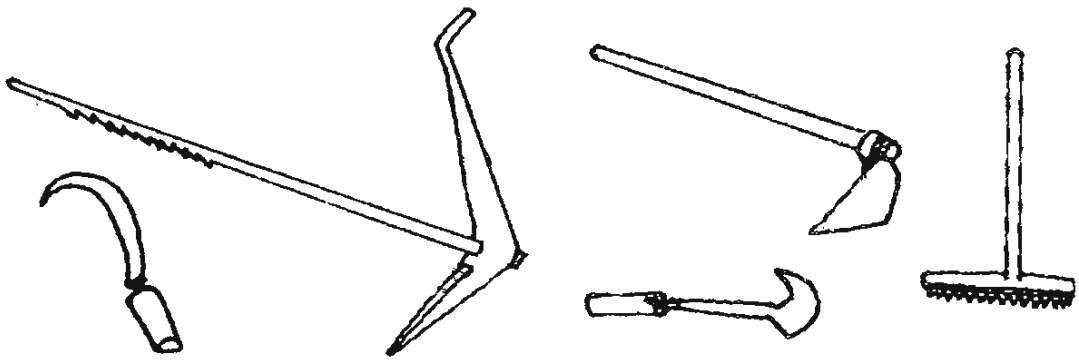

চিত্র ৪.১ কয়েকটি কৃষি যন্ত্রপাতি

মোলবোর্ড লাঙল, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, পাওয়ার পাম্প, বপন যন্ত্র, উড়ানী, মাড়াইকল, স্প্রেয়ার ইত্যাদি কৃষিকাজের আধুনিক যন্ত্রপাতি। এসব যন্ত্রপাতি কিসের তৈরি বলতে পার? এগুলো ইস্পাতের তৈরি। তাহলে তোমরা বুঝতে পারলে কৃষিকাজে ছোট বড়, দেশী–বিদেশী যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তা প্রায় সবগুলোই লোহা ও ইস্পাত দিয়ে তৈরি। এক কথায় কৃষিকাজের জন্য লোহা ও ইস্পাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

অধাতুর ধর্ম ও ব্যবহার

অধাতু কাকে বলে তা তোমরা এ অধ্যায়ের প্রথমেই জেনেছ। হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, সালফার, ক্লোরিন, আয়োডিন, হিলিয়াম, নিয়ন, ক্রিপটন ইত্যাদি কয়েকটি অধাতব মৌল। নিচে এসব অধাতুর ধর্ম ও ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

হাইড্রোজেন

হাইড্রোজেন সবচেয়ে হালকা মৌলিক পদার্থ। ১৭৫৬ সালে বৃটিশ বিজ্ঞানী ক্যাভেন্ডিস সর্বপ্রথম এই গ্যাস আবিষ্কার করেন। হাইড্রো–শব্দটির অর্থ পানি এবং জেন–শব্দটির অর্থ উৎপন্নকারী। অর্থাৎ হাইড্রোজেন শব্দের অর্থ পানি উৎপন্নকারী উপাদান। বায়ুতে, তেলের খনিতে, আগ্নেয়গিরির গ্যাসে সামান্য পরিমাণ হাইড্রোজেন মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায়। পরীক্ষাগারে ধাতুর সাথে এসিডের বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়।

হাইড্রোজেন একটি বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন গ্যাস। এই পৃথিবীতে যত পদার্থ আছে তার মধ্যে হাইড্রোজেন সবচেয়ে হালকা। এ কারণে হাইড্রোজেন গ্যাস আকাশযান ও বেলুন উড্ডয়নের কাজে ব্যবহৃত হয়। হাইড্রোজেন গ্যাস নিজে জ্বলে কিন্তু অন্যকে জ্বলতে সাহায্য করে না। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলে পানি উৎপন্ন করে। আয়তন অনুপাতে পানিতে দুইভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন আছে। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মিলিত শিখাকে অক্সি–হাইড্রোজেন শিখা বলে। এই শিখা ধাতু গলানো ও ঝালাইয়ের কাজে ব্যবহার করা হয়। অ্যামোনিয়া, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, ইউরিয়া সার প্রস্তুত করতে হাইড্রোজেন ব্যবহার করা হয়। হাইড্রোজেন ও কার্বন মিলে নানা ধরনের যৌগ গঠন করে। চিনি, সাবান, তেল, পেট্রোল, গ্যাসোলিন ইত্যাদি সব যৌগে যথেষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেন রয়েছে।

অক্সিজেন

১৭৭৪ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী প্রিস্টলি অক্সিজেন আবিষ্কার করেন। প্রায় একই সময় সুইডিশ বিজ্ঞানী শীলে ও ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিঁয়ে এই গ্যাস আবিষ্কার করেন। অক্সি–শব্দটির অর্থ অম্ল, জেন–শব্দটির অর্থ উৎপন্নকারী। তাহলে অক্সিজেন শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় অম্ল বা এসিড উৎপন্নকারী। প্রায় সব এসিডের একটি উপাদান অক্সিজেন। বায়ুর প্রায় ৫ ভাগের ১ ভাগ অক্সিজেন এবং ৪ ভাগ নাইট্রোজেন। পরীক্ষাগারে অক্সিজেন গ্যাস তৈরি করা যায়।

অক্সিজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন গ্যাস। অক্সিজেন পানিতে দ্রবণীয়। অক্সিজেন পানিতে দ্রবীভূত থাকে বলেই মাছ এবং জলজ উদ্ভিদ শ্বাস–প্রশ্বাস ক্রিয়া নির্বাহ করতে পারে। অক্সিজেন নিজে জ্বলে না কিন্তু অন্যকে জ্বলতে সাহায্য করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য অক্সিজেন অতীব প্রয়োজন। আমরা শ্বাসকার্যে অক্সিজেন গ্রহণ করি। মুমূর্ষু রোগীদের শ্বাসকার্য চালনা করতে অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়। ডুবুরী, পর্বতারোহী, নভোযানের চালকরা শ্বাসকার্য চালানোর জন্য অক্সিজেন ব্যবহার করে। অক্সি–হাইড্রোজেন শিখা উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়। রকেটে জ্বালানি হিসেবে তরল অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়। লৌহ ও ইস্পাতের কারখানায়ও প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন লাগে।

নাইট্রোজেন

১৭৭২ সালে ডেনিয়েল রাদারফোর্ড নাইট্রোজেন আবিষ্কার করেন। বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে। বায়ুর ৫ ভাগের ৪ ভাগই নাইট্রোজেন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের পুষ্টি সাধনের জন্য নাইট্রোজেনের প্রয়োজন। পরীক্ষাগারে নাইট্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করা যায়।

নাইট্রোজেন একটি বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন গ্যাস। নাইট্রোজেন একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এই গ্যাস নিজে জ্বলেনা এবং অন্যকেও জ্বলতে সাহায্য করে না। রাসায়নিক সার উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হয়। প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য নাইট্রোজেনের গুরুত্ব অপরিসীম। বায়ু অধ্যায়ে তোমরা এ সম্পর্কে জেনেছ।

সালফার বা গন্ধক

প্রকৃতিতে মৌলিক আকরিক হিসেবে সালফার পাওয়া যায়। ডিম, সরিষা, পিঁয়াজ, রসুন, চুল, পশম ইত্যাদিতে সালফার আছে। সালফার হালকা হলুদ বর্ণের দানাদার কঠিন পদার্থ। সালফার দিয়াশলাই তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। মলম, ওষুধ, কীটনাশক, রঞ্জক, কাগজ ইত্যাদি তৈরি করতে সালফার ব্যবহার করা হয়।

কয়লা

ভূপৃষ্ঠে সমস্ত মৌলিক পদার্থের মধ্যে কার্বন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। হীরক, গ্রাফাইট প্রভৃতি কার্বনের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। প্রোটিন, শর্করা ও স্নেহ জাতীয় পদার্থগুলোও কার্বনের যৌগ। প্রকৃতিতে কার্বনের সবচেয়ে বেশি অস্তিত্ব আছে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে। প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রাথমিক ও অপরিহার্য উপাদান হল কার্বন। প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের প্রতিটি অংশই কার্বন যৌগ দ্বারা তৈরি। কাঠ কয়লা, প্রাণিজ কয়লা, ভূসা কয়লা, কোককয়লা ও গ্যাস কার্বন কার্বনের বিভিন্ন রূপ। কার্বন জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জীবাণুনাশক হিসেবে, বারুদের উপাদান, ছাপার কালি, জুতার কালি প্রভৃতিতে কার্বন ব্যবহৃত হয়।

ধাতু ও অধাতুর তুলনা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় কয়েকটি ধাতু এবং অধাতুর ধর্ম এবং ব্যবহার সম্বন্ধে তোমরা জেনেছ। ছকে ধাতু ও অধাতুর পার্থক্যের একটি তুলনামূলক বিবরণ দেওয়া হল।

ধাতু ও অধাতুর তুলনা

ধাতু	অধাতু
১। ধাতু সাধারণত উজ্জ্বল।	১। অধাতু সাধারণত উজ্জ্বল নয়।
২। ধাতু সাধারণত শক্ত ও ওজনে ভারী।	২। অধাতু সাধারণত নরম ও হালকা।
৩। ধাতুকে আঘাত করলে ঝনঝন শব্দ হয়।	৩। অধাতুকে আঘাত করলে ঝনঝন শব্দ হয় না।
৪। ধাতুর মধ্য দিয়ে তাপ ও বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে।	৪। অধাতুর মধ্য দিয়ে তাপ ও বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে না।
৫। ধাতু ঘাতসহ ও নমনীয়। কাজেই ধাতুকে পিটিয়ে পাতলা পাতে পরিণত করা যায় এবং সরু তারেও পরিণত করা যায়।	৫। অধাতু ঘাতসহ ও নমনীয় নয়। তাই অধাতুকে পিটিয়ে পাতলা পাতে কিংবা তারে পরিণত করা যায় না।
৬। ধাতু সাধারণত উচ্চ তাপে গলে।	৬। অধাতু নিম্ন তাপে গলে।

৭। ধাতু স্বাভাবিক উষ্ণতায় সাধারণত কঠিন।	৭। অধাতু স্বাভাবিক উষ্ণতায় সাধারণত কঠিন বা গ্যাসীয়।
৮। ধাতুতে আলো প্রতিফলিত হয়।	৮। অধাতুতে আলোর প্রতিফলন হয় না।
৯। ধাতু সাধারণত হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক এসিডে দ্রবণীয়।	৯। অধাতু সাধারণত হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক এসিডে অদ্রবণীয়।

সংকর ধাতু

সংকর ধাতু কী কী কাজে লাগে? এসো সে সম্পর্কে আলোচনা করি। প্রশ্ন হল সংকর ধাতু কী? সংকর শব্দের অর্থ হল মিশ্রিত। দুই বা ততোধিক ধাতু গলিয়ে মিশ্রণ তৈরির পর ঠান্ডা করলে যে কঠিন পদার্থ গঠিত হয় তাকে সংকর ধাতু বলে। ইস্পাত, পিতল, কাঁসা, ডুরালুমিন ইত্যাদি সংকর ধাতু। সংকর ধাতু এর মূল উপাদান হতে বেশি শক্তিশালী। খোলা অবস্থায় বায়ুতে অনেকদিন ফেলে রাখলেও সংকর ধাতুতে মরিচা ধরে না এবং তেমন কোনো ক্ষতি হয় না।

নিচের ছকে কয়েকটি সংকর ধাতু, সংকর ধাতুর গুণাগুণ এবং ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হল :

সংকর ধাতু	প্রধান ধাতু মৌল	অন্যান্য মিশ্রণ মৌল	বিশেষ গুণ	ব্যবহার
ইস্পাত	লোহা	০.২৫–১.৫% কার্বন ও সামান্য ক্রোমিয়াম	শক্ত, অভঙ্গুর, মরিচা ধরে না।	রেল লাইন, রেলের চাকা, জাহাজ, দালান কোঠার ফ্রেম, ক্রেইন, যুদ্ধের যন্ত্রপাতি, ডাক্তারি যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন, থালাবাসন, চামচ ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।
পিতল	তামা	তামা ৬০–৮০% দস্তা ৪০–২০%	মরিচা ধরে না।	স্ক্রু, বন্দুকের গুলির কার্তুজ, অলংকার, বাসনপত্র ইত্যাদি তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়।
কাঁসা	তামা	তামা ৭৫–৯০% টিন ২৫–১০%।	সুন্দর রং	মুদ্রা, বাসনপত্র, ধাতব মূর্তি, ঘন্টা, প্রপেলার, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়।
ডুরালুমিন	অ্যালুমিনিয়াম	অ্যালুমিনিয়াম ৯৫% তামা ৪% ম্যাঙ্গানিজ ০.৫% ম্যাগনেসিয়াম ০.৫%	খুব হালকা	উড়োজাহাজ ও মোটর গাড়ি তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়।

এ অধ্যায়ের নতুন শব্দ

বিদ্যুৎ পরিবাহী	সংকর ধাতু	মোলবোর্ড লাঙল
পাওয়ারটিলার	ট্রাক্টর	গ্যাসোলিন
ক্যাভেন্ডিস	প্রিস্টলি	রাদারফোর্ড

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কোনটি ধাতু ?

ক. কার্বন খ. সালফার

গ. গ্রাফাইট ঘ. পারদ

২. কোনটি অধাতু ?

ক. সোডিয়াম খ. আয়োডিন

গ. তামা ঘ. দস্তা

৩. অধাতু হলেও বিদ্যুৎ পরিবাহী কোনটি ?

ক. গ্রাফাইট খ. হীরক

গ. সালফার ঘ. কার্বন

৪. কোন গুণটি অধাতুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ?

ক. আঘাত করলে ঝন ঝন শব্দ হয় খ. তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী

গ. নিম্ন গলনাংক ঘ. উজ্জ্বল ও চকচকে

৫. চিনি, সাবান, তেল, পেট্রোল ইত্যাদি কিসের যৌগ ?

ক. অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন খ. কার্বন ও হাইড্রোজেন

গ. কার্বন ও নাইট্রোজেন ঘ. কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন

৬. গ্যাস ভর্তি একটি বেলুনকে ছেড়ে দেওয়ার পর বেলুনটি উড়ে গেল। বেলুনটিতে আছে

ক. হাইড্রোজেন গ্যাস খ. অক্সিজেন গ্যাস

গ. নাইট্রোজেন গ্যাস ঘ. কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস

৭. ৬নং প্রশ্নের বেলুনের গ্যাসটি

i. অন্যকে জ্বলতে সাহায্য করে

ii. নিজে জ্বলে

iii. আগুন নিভাতে সাহায্য করে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মরিয়ম বেগম একজন গৃহিনী। শহরে থাকেন। প্রয়োজনে সে গ্রামের বাড়ি যায়। যাওয়ার পূর্বে সে তার ব্যবহার্য বিভিন্ন ধাতব তৈজষপত্র যেমন হাড়ি, পাতিল, দা, বটি, ডেগচি, বাসন, চামচ স্টোরে তালা দিয়ে যায়। কিছুদিন পর বাসায় ফিরল। সে দেখল তার দা বটির গায়ে বাদামী আস্তরণ পড়েছে। হাড়ি, পাতিল, ডেগচি, চামচ একই রকম আছে। তৈজষপত্রগুলোর মধ্যে কিছু ধাতুর এবং কিছু সংকর ধাতুর তৈরী।

ক. দা বটিতে পড়া বাদামী আস্তরণের নাম কী ?

খ. ধাতু ও সংকর ধাতু অনুযায়ী ব্যবহৃত তৈজষপত্রগুলো শ্রেণীকরণ কর ?

গ. অন্যান্য তৈজষপত্রে বাদামী আস্তরণ পড়েনি কেন ?

ঘ. তৈজষ পত্রগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন ধাতু ও সংকর ধাতুর ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা কর।

২. একটি সংকর ধাতুতে আছে

অ্যালুমিনিয়াম	:	৯৫ ভাগ
তামা	:	০৪ ভাগ
ম্যাগনেসিয়াম	:	০.৫ ভাগ
ম্যাঙ্গানিজ	:	০.৫ ভাগ

ক. সংকর ধাতুটির নাম কী ?

খ. একে সংকর ধাতু বলা হয় কেন?

গ. অ্যালুমিনিয়ামের পরিবর্তে লোহা ব্যবহার করলে কী হত ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উড়োজাহাজ নির্মাণে এ ধরনের ধাতুর ব্যবহার করার কারণ ব্যাখ্যা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

পানি

পৃথিবীতে যত প্রকার তরল পদার্থ আছে তারমধ্যে পানি সবচেয়ে সহজলভ্য। পৃথিবী পৃষ্ঠের চারভাগের তিন ভাগই পানি। মানব দেহের শতকরা ৭০ ভাগ পানি। মাছ, মাংস, তরকারি প্রভৃতির অধিকাংশে শতকরা ৬০ থেকে ৯০ ভাগ পানি থাকে। পানি ছাড়া কোনো জীব বাঁচতে পারে না। এজন্য পানির অপর নাম জীবন।

পানি একটি যৌগিক পদার্থ

পানি একটি তরল পদার্থ। পানির কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই, যখন যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থ সম্পর্কে তোমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে জেনেছ। প্রশ্ন হল পানি কোন জাতীয় পদার্থ মৌলিক, যৌগিক না মিশ্র?

প্রাচীনকালে মানুষ পানিকে একটি মৌলিক পদার্থ বলে মনে করত। ১৭৮১ সালে বিজ্ঞানী ক্যাভেন্ডিস হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে পানি তৈরি করে প্রমাণ করেন যে, পানি একটি যৌগিক পদার্থ। পানি যে যৌগিক পদার্থ তা নিচের যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায়

১। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বিশুদ্ধ পানি পরীক্ষা করে দেখা গেছে প্রতি ৯ ভাগ ওজনের পানিতে ৮ ভাগ অক্সিজেন এবং ১ ভাগ হাইড্রোজেন থাকে। পানি যদি মিশ্র পদার্থ হত তবে বিভিন্ন স্থানের পানির উপাদানগুলোর ওজন অনুপাত বিভিন্ন হত।

২। পানি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত এবং পানিতে এগুলোর ধর্ম সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়।

৩। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে পানি উৎপন্ন করার সময় তাপ উৎপন্ন হয়। পানি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সাধারণ মিশ্রণ হলে তাপের উদ্ভব হত না।

৪। পানি সাধারণত মিশ্রণ হলে মিশ্রণ থেকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সহজেই পৃথক করা যেত। কিন্তু রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা ছাড়া পানি থেকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে পৃথক করা যায় না।

৫। যৌগিক পদার্থে বিভিন্ন উপাদানগুলো সমসত্ত্ব হয়। পানিতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের উপাদান সমসত্ত্ব বিশিষ্ট।

৬। যৌগিক পদার্থকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলে একাধিক ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। পানিকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়।

এ সমস্ত যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় যে পানি একটি যৌগিক পদার্থ, মিশ্র পদার্থ নয়।

পানির উপাদান–হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পৃথকীকরণ

পানি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এ দুইটি মৌলিক পদার্থ নিয়ে গঠিত। সামান্য এসিড মিশ্রিত পানির মধ্যে বিদ্যুৎ চালনা করলে পানির যৌগ ভেঙে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস তৈরি হয়। এভাবে রাসায়নিক পরিবর্তনের সাহায্যে একটি যৌগিক পদার্থকে তার উপাদানে ভেঙে ফেলাকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ বলে। পানিকে রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার উপাদান মৌলে পৃথক করা যায়। পানির উপাদানগুলোকে পৃথক করার জন্য এসো নিচের পরীক্ষাটি করি।

পরীক্ষা

এ পরীক্ষার জন্য নিচের দিকে দুইটি গোলাকার ছিদ্রসহ একটি কাচের বা প্লাস্টিকের বাটি, রবারের ছিপি, চারটি টর্চ ব্যাটারী, দুইটি পুরনো টর্চের ব্যাটারীর কার্বন দন্ড, কিছু তামার তার, পানি, সালফিউরিক এসিড ও গ্যাস সংগ্রহের জন্য দুইটি টেস্টটিউবের প্রয়োজন হবে। প্রথমে বাটির নিচের খোলা ছিদ্র দুইটি রবারের ছিপি দিয়ে বন্ধ কর। ছিপিগুলোর মধ্য দিয়ে দুইটি তামার তার পাত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। টর্চ লাইটের পুরনো ব্যাটারী থেকে কার্বন দন্ড

দুইটি বের কর। কার্বন দন্ড দুইটি বের করার সময় লক্ষ রাখবে যেন দন্ডের মাথায় যে তামার বাটি থাকে তা যেন খুলে না যায়। এবার পাত্রের ভেতরের তার দুইটি কার্বন দন্ডের মাথায় অবস্থিত তামার বাটির সাথে আটকে দাও। ছিপির বাইরে তারের অন্য প্রান্ত দুইটি, চারটি টর্চ ব্যাটারীর সঙ্গে যুক্ত কর। ব্যাটারীগুলোকে একটি কাঠের তৈরি ব্যাটারী কেসের মধ্যে রাখলে ভাল হয়। কার্বন দন্ড দুইটি বাটির মধ্যে ভালভাবে বসিয়ে দাও। বাটির মধ্যে সামান্য সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত পানি ঢেলে দাও। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবে কার্বন দন্ডগুলো থেকে বুদবুদ বের হচ্ছে। এখন দন্ড দুইটির উপর সমান আয়তনের দুইটি পানি ভর্তি টেস্টটিউব উপুড় করে বসাও। টেস্টটিউব দুইটি ধারকের সাহায্যে আটকে দাও। দেখবে, টেস্টটিউবের মধ্যে পানি আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসছে এবং গ্যাসীয় পদার্থে নল দুইটি ভরে যাচ্ছে।

লক্ষ করলে দেখবে নল দুইটিতে যে গ্যাস জমেছে তার পরিমাণ সমান নয়। একটিতে যতটুকু গ্যাস জমেছে অন্যটিতে গ্যাসের পরিমাণ তার অর্ধেক। এক সময় গ্যাস দ্বারা নল দুইটি পূর্ণ হলে নলের মুখে আঙ্গুল চেপে নল দুইটি বের করে এনে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এ গ্যাস দ্বারা পূর্ণ নল দুইটির একটি অক্সিজেন, অন্যটি হাইড্রোজেন। যে টেস্টটিউবটি তাড়াতাড়ি গ্যাস দ্বারা পূর্ণ হয়েছে সেটির মুখে একটি জ্বলন্ত পাটকাঠি ধরলে দেখবে পাটকাঠিটি নিভে যাবে, অথচ টেস্টটিউবের মুখে গ্যাস নীল শিখায় জ্বলছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে গ্যাসটি হাইড্রোজেন। অনুরূপভাবে যে টেস্টটিউবটি ধীরে ধীরে গ্যাস দ্বারা পূর্ণ হয়েছে তার মধ্যে একটি শিখাহীন জ্বলন্ত পাটকাঠি ধরলে দেখবে কাঠিটি উজ্জ্বল শিখাসহ জ্বলছে। এতে বোঝা যায় গ্যাসটি অক্সিজেন।

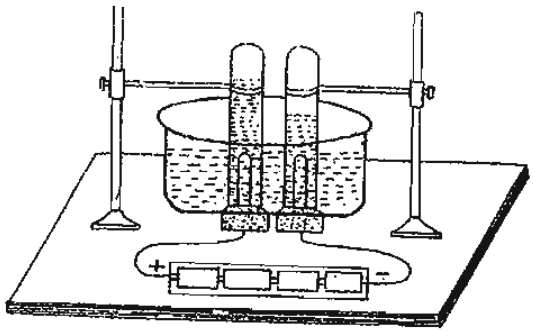

চিত্র ৫.১ : পানি বিশ্লেষণ

এ পরীক্ষা দ্বারা বোঝা গেল পানির মধ্যে বিদ্যুৎ চালনা করলে পানি বিশ্লেষিত হয়ে ২ আয়তন হাইড্রোজেন ও ১ আয়তন অক্সিজেন উৎপন্ন করে। অর্থাৎ পানি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক মৌলিক পদার্থ নিয়ে গঠিত।

$$\text{পানি} \xrightarrow[\text{বিশ্লেষণ}]{\text{তড়িৎ}} \underset{(২\ \text{আয়তন})}{\text{হাইড্রোজেন}} + \underset{(১\ \text{আয়তন})}{\text{অক্সিজেন}}$$

উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন রক্ষায় এবং দৈনন্দিন জীবনে পানির প্রয়োজনীয়তা

পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া জীবের অস্তিত্বের কথা চিন্তা করা যায় না। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনে পানির হাজারও রকমের প্রয়োজন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনে পানির কয়েকটি প্রয়োজনের কথা আলোচনা করা হল :

দেহের জীবকোষ তৈরি করতে পানির প্রয়োজন। লালা রসের পানিই খাদ্য গলধঃকরণে সাহায্য করে। পানিতে দ্রবীভূত হয়ে খাদ্যের উপাদানসমূহ শরীরে শোষিত হয়। রক্তের পানির মাধ্যমেই খাদ্য শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে আনীত হয় এবং সে খাদ্য দেহ গঠন ও শক্তি উৎপন্ন করে। আবার এই পানির সাহায্যেই শরীরের দূষিত পদার্থ নিঃসরণ হয়।

কাপড় কাঁচতে, গোসল করতে, রান্না করতে, বাসনপত্র পরিষ্কার করতে প্রচুর পানির প্রয়োজন। আমাদের দেশে কাপ্তাই এ পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। এ কেন্দ্রে পানির গতি শক্তির সাহায্যে জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় এবং তা বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা হয়। এই বিদ্যুতের সাহায্যে আমরা বাতি জ্বালাই, ফ্যান, রেডিও, টিভি ইত্যাদি চালাই। আবার ছোট বড় সব ধরনের শিল্প কারখানায় প্রচুর পানির প্রয়োজন। পানি ছাড়া কৃষিকাজ করা যায় না। আমাদের দেশে অনেক সময় দেখা যায় যে, যখন কৃষি কাজের জন্য বৃষ্টির প্রয়োজন তখন বৃষ্টি হয় না। ফলে কৃষকরা কৃষি জমিতে পানি সেচ দিয়ে ফসল উৎপন্ন করে।

উদ্ভিদের জন্য পানির বিশেষ প্রয়োজন। বীজের অঙ্কুরোদগম হতে আরম্ভ করে যত দিন উদ্ভিদ বেঁচে থাকে তত দিন পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে উদ্ভিদের পর্যাপ্ত পানির প্রয়োজন। উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে মাটি থেকে প্রচুর পানি গ্রহণ করে। এই পানি বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে ক্লোরোফিল ও সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করে খাদ্য তৈরি করে। উদ্ভিদে প্রস্তুতকৃত খাদ্য খেয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণী বেঁচে থাকে।

পানির উৎসসমূহ

প্রকৃতিতে আমরা চারটি উৎস থেকে পানি পেয়ে থাকি। উৎসগুলো হল:

১। বৃষ্টির পানি
২। ঝরনার পানি
৩। নদীর পানি
৪। সমুদ্রের পানি

১। বৃষ্টির পানি

প্রাকৃতিক পানির মধ্যে বৃষ্টির পানিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ। সাগর, নদী, খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি থেকে পানি সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে বাতাসে মিশে যায়। উপরের ঠাণ্ডা বাতাসে এই বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে এবং এই মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির পানিতে নদীনালা, খালবিল, ডোবাপুকুর ইত্যাদি ভরে যায়। পাহাড়ী অঞ্চলে বৃষ্টি বেশি হয়। এই বৃষ্টির পানি গড়িয়ে আবার নদী ও সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। পানির এই গতি চক্রকে পানিচক্র বলে। পানিচক্রকে ছবিতে দেখানো হল:

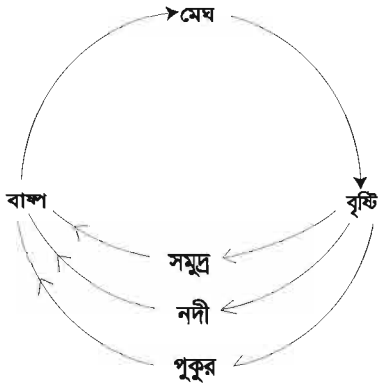

চিত্র ৫.২: পানি চক্র

২। ঝরনার পানি

বৃষ্টির পানি ভূ–পৃষ্ঠে পতিত হয়ে মাটির ভিতরে প্রবেশ করে। এ সময় বালি, মাটি, পাথর ইত্যাদি দ্বারা এই পানি পরিস্রুত হয়। মাটির নিচে জমা হতে হতে বেশ কিছুদিন পর ঝরনার আকারে বের হয়ে আসে। কূপ ও টিউবওয়েল খনন করলেও এ পানি পাওয়া যায়। এ পানিতে মাটির নানা প্রকার পদার্থ দ্রবীভূত থাকে। সেজন্য অনেক সময় ঝরনার পানি একেবারে বিশুদ্ধ হয় না। তবে এই পানি বালি ও কাঁকরের স্তর ভেদ করে বের হয় বলে অনেকটা পরিষ্কার দেখায়।

৩। নদীর পানি

পাহাড়ের গলিত বরফ, তুষার, বৃষ্টি ও ঝরনার পানি প্রভৃতি প্রবাহিত হয়ে নদীতে পড়ে। নদীর পানিতে দ্রবীভূত ও ভাসমান পদার্থ থাকে। আশপাশের অনেক জায়গার ময়লা নদীতে এসে মিশে যায়। এ কারণে নদীর পানি বিশেষ করে বর্ষাকালে ঘোলা হয়। নদীর স্রোত তার গতিপথে অনেক জিনিস নিয়ে যায়। এ জিনিসগুলোর মধ্যে কতগুলো পানিতে দ্রবণীয় আর কতগুলো অদ্রবণীয়। দ্রবণীয় অংশে থাকে লবণ জাতীয় পদার্থ আর অদ্রবণীয় অংশে থাকে বালি, কাদামাটি ইত্যাদি। বর্ষাকালে নদীর পানিতে প্রচুর পরিমাণে কাদামাটি থাকে বলে পানি ঘোলাটে দেখায়।

৪। সমুদ্রের পানি

সমুদ্রই পানির প্রধান উৎস। নদীর পানি এসে সমুদ্রে পড়ে। সমুদ্রের পানি দেখতে পরিষ্কার। কিন্তু সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ খুব বেশি। সমুদ্রের পানিতে লবণের ভাগ বেশি। তাই এই পানি লবণাক্ত ও পানের অযোগ্য।

এছাড়াও আমরা কূয়া, নলকূপ, পুকুর ও লেক থেকে পানি পাই। কূয়া, নলকূপ ও পুকুরের পানি আমরা রান্নাবান্না ও খাবারের পানি হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। বর্তমানে শহর অঞ্চলে ও কৃষি খেতে গভীর নলকূপ বসিয়ে পানি সরবরাহ করা হয়।

বিশুদ্ধ ও দূষিত পানি

আমাদের ব্যবহারের পানি বিশেষ করে পান করার পানি দূষিত কিনা তা দেখা একান্ত প্রয়োজন। পানি নানাভাবে দূষিত হয়ে থাকে। যে পানিতে নানা প্রকার রোগজীবাণু, ময়লা, আবর্জনা ইত্যাদি থাকে এবং পান করলে আমাদের রোগ হয় তাকে দূষিত পানি বলে।

একমাত্র বৃষ্টির পানি ব্যতীত প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যায় না। বৃষ্টির পানি সাধারণত বিশুদ্ধ। তবে বাতাসে ধূলোবালি ভেসে বেড়ায় বলে প্রথম দিকের বৃষ্টির পানি বিশুদ্ধ নয়। শিল্প এলাকায় বৃষ্টির পানি কিন্তু বিশুদ্ধ নয়।

পুকুর, খালবিল ও নদীর পানি নানা কারণে দূষিত হয়। পানি দূষিত হওয়ার কয়েকটি সাধারণ কারণ উল্লেখ করা হল।

পানি দূষিত হওয়ার কারণ

১। পুকুর বা নদীর পানিতে বাসন-কোসন মাজা, গোসল করা, ময়লা কাপড়চোপড় কাচা, গরু-মহিষ গোসল করানো, পাট পচানো, পায়খানা প্রস্রাব করা, মৃত দেহ ফেলা প্রভৃতি উপায়ে নদীনালা, খালবিল, পুকুরের পানি দূষিত হয়।

২। কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, ডায়রিয়া ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত রোগীর মলমূত্র, বিছানাপত্র, জামাকাপড় পানিতে ধুলে রোগজীবাণু পানিতে মিশে গিয়ে পানি দূষিত করে।

৩। পানিতে গাছের পাতা, খড়কুটা, গাছ গাছড়া, শৈবাল ইত্যাদি পচে গলে পানি দূষিত হয়।

৪। কূপের পাড় নিচু থাকলে এবং সেখানে থালাবাসন মাজলে, কাপড় কাচলে, চারপাশে নোংরা আবর্জনা, আস্তকুড় থাকলে এদের চোঁয়ানো পানি কূপে প্রবেশ করে কূপের পানিকে দূষিত করে। সাবান ও ডিটারজেন্টের ব্যবহার পানিকে ভীষণভাবে দূষিত করে।

৫। কলকারখানার বর্জ্য পদার্থে বিষাক্ত ও ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ মিশে থাকে। বর্জ্য পদার্থ যদি নদী বা পুকুরে ফেলা হয় তাহলে পানি দূষিত হয়। এতে মাছ মরে যায়।

৬। কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়। এ সমস্ত বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে নদী বা পুকুরে গিয়ে পড়ে। এতে নদী বা পুকুরের পানি দূষিত হয় এবং মাছ মরে যায়।

৭। জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহার নদী বা পুকুরের বিভিন্ন জীবের ক্ষতিসাধন করতে পারে। বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে রাসায়নিক সার নদী বা পুকুরে গিয়ে পড়ে। এতে নদী বা পুকুরে শৈবাল ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ বেশি করে জন্মে।

এ সমস্ত উদ্ভিদ পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন ব্যবহার করে। এতে নদী বা পুকুরের অক্সিজেন কমে যায়। ফলে মাছের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাব হয়। অক্সিজেনের অভাবে মাছ মরে যায়, পচা মাছ পানিকে দূষিত ও দুর্গন্ধযুক্ত করে। এই পচা পানি ব্যবহার করা অত্যন্ত ক্ষতিকর। অক্সিজেনের অভাবে পানির শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদও কমে যায়।

বিশুদ্ধ পানি

যে পানি স্বচ্ছ, বর্ণহীন, গন্ধহীন, যাতে কোনো ভাসমান জৈব কিংবা অজৈব পদার্থ থাকে না এবং যাতে কোনো রোগজীবানু নেই তাকে বিশুদ্ধ পানি বলে।

বিশুদ্ধ পানি পানে কোনো বিপদের আশঙ্কা থাকে না। তাই আমাদের সকলেরই বিশুদ্ধ পানি পান করা উচিত। নলকূপের পানি সাধারণত বিশুদ্ধ পানি।

পানি বিশুদ্ধ করার উপায়

কী কী কারণে পানি দূষিত হয় তা তোমরা জেনেছ। যে সমস্ত কাজ করলে পানি দূষিত হয় সে সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকলে পানি দূষিত হতে পারে না। পানি সাধারণত দুইটি উপায়ে বিশুদ্ধ করা যায়। যথা প্রাকৃতিক উপায়ে এবং কৃত্রিম উপায়ে।

প্রাকৃতিক উপায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ

প্রাকৃতিক উপায়ে অহরহ এক দিকে যেমন পানি শোধিত হচ্ছে অন্য দিকে আবার দূষিত হচ্ছে। সুতরাং পান করার পানির জন্য প্রাকৃতিক শোধনের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। সংরক্ষিত পুকুর, কূপ বা অগভীর নলকূপের পানি যা সহজে দূষিত হতে পারে না কেবল সে পানিই পানের উপযুক্ত। প্রাকৃতিক উপায়ে পানি নানাভাবে শোধিত হয়ে থাকে। যেমন

১। সূর্যের কিরণ পানির রোগ জীবাণু ধ্বংস করে এবং দুর্গন্ধ নষ্ট করে।

২। পানিতে যে অক্সিজেন দ্রবীভূত থাকে তা জৈব পদার্থকে দোষমুক্ত করে ও পানিকে দুর্গন্ধমুক্ত করে।

৩। পানির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী বাস করে। এ সমস্ত জলজ প্রাণী পানির ময়লা আহার করে পানিকে অনেকটা দূষণমুক্ত করে।

৪। জলজ উদ্ভিদ পানিতে অক্সিজেন ছেড়ে পানিকে বিশুদ্ধ করে।

৫। সংরক্ষিত পানিতে রোগজীবাণু বেশি থাকলে তা নিজ হতেই ধ্বংস হয়ে যায়।

কৃত্রিম উপায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ

বিভিন্ন কৃত্রিম উপায়ে পানি বিশুদ্ধ করা যায়। সাধারণত তিনটি উপায়ে পানি বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত করা যায়। যেমন

১। ফুটিয়ে পানি বিশুদ্ধকরণ: পানিতে কাদা, ময়লা ও ভাসমান আবর্জনা প্রথমে ছেকে নিয়ে কমপক্ষে ২০/২৫ মিনিট আগুনের তাপে ফুটিয়ে নিলে পানির রোগ জীবাণু মরে যায়। এভাবে এই ফুটানো পানি ঠান্ডা করে পান করলে রোগের ভয় থাকে না। তবে পানি ফুটানোর পাত্রটিকে উত্তমরূপে ধুয়ে তাপে শুকিয়ে নিলে ভাল হয়। পানি বিশুদ্ধ করার এই পদ্ধতিটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, সস্তা ও সুবিধাজনক।

২। পানিতে ফিটকিরি, ব্লিচিং পাউডার, পটাশ পারম্যাঙ্গানেট, ক্লোরিন ইত্যাদি মিশিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিলে পরিষ্কার হয় এবং নিচে তলানি জমে। তখন উপর থেকে পরিষ্কার পানি ছেঁকে নিয়ে ব্যবহার করা যায়।

৩। পানি বিশুদ্ধকরণের জন্য এক ধরনের ট্যাবলেট পাওয়া যায় যাকে পানি বিশোধন ট্যাবলেট বলে। এই ট্যাবলেট ব্যবহার করে পানি বিশুদ্ধ করা যায়। অনেক সময় বন্যার পানি টিউবওয়েল, কূয়া ইত্যাদির মধ্যে ঢুকে পড়ে পানিকে দূষিত করে। এই সময় পানি বিশুদ্ধ করার জন্য পানি বিশোধন ট্যাবলেট ব্যবহার করা হয়।

পানির অপচয় ও দূষণ রোধ

পানি একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। যে কোনো সম্পদই যথেচ্ছ ব্যবহার করলে শেষ হয়ে যায়। পানি কিন্তু অফুরন্ত নয়। তাই তোমরা কখনও অপ্রয়োজনে পানি ব্যবহার করবে না। ব্যবহারের পর ভাল করে পানির ট্যাপ বন্ধ করে

দেবে যাতে পানির অপচয় না হয়। তোমরা লক্ষ করেছ আমাদের দেশে বর্তমানে গ্রাম ও শহর অঞ্চলে পানির বেশ অভাব দেখা যাচ্ছে। তোমরা শুনে অবাক হবে যে, আমাদের দেশে মাটির নিচে যে পানির স্তর রয়েছে তা ধীরে ধীরে আরও নিচে নেমে যাচ্ছে। এজন্য গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে নদনদী, খাল বিল শুকিয়ে যাচ্ছে। দেশ যেন মরুভূমিতে পরিণত হতে চলেছে। তাই তোমরা সকলেই পানি যাতে অপচয় না হয় সেদিকে বিশেষভাবে সতর্ক হবে।

এ অধ্যায়ে তোমরা পানি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জেনেছ। রান্নাবান্না, হাত–মুখ ধোয়া, গোসল করা, পান করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করবে। পানি ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে পান করাই সবচেয়ে ভাল। বড় বড় শহরে যে পানি সরবরাহ করা হয় সে পানিতে ক্লোরিন ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে পানি বিশুদ্ধ করে সরবরাহ করা হয়। শহরে পানির ট্যাংক নিয়মিতভাবে পরিষ্কার না করলে পানিতে রোগজীবাণু জন্মে। সে জন্য শহরের বাড়িতে পানি ফুটিয়ে পান করা উচিত।

দূষিত পানি ব্যবহার করলে আমাশয়, টাইফয়েড, জন্ডিস, কলেরা ইত্যাদি পানিবাহিত রোগ হয়। পানি দূষণমুক্ত রাখার জন্য তোমরা সব সময়ে সচেষ্ট হবে। যেসব কাজ করলে পানি দূষিত হয় সেসব কাজ থেকে বিরত থাকবে। নদী বা পুকুরের ধারে মলমূত্র ত্যাগ করলে, পুকুরের পানিতে রোগীর বিছানাপত্র, জামাকাপড় ধুলে, থালাবাসন মাজলে, গরু গোসল করালে পানি দূষিত হয়। তাই এ সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকতে সচেষ্ট হবে। আজকাল আমাদের দেশে কৃষকরা ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করছে। এ সব রাসায়নিক পদার্থ বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে পুকুর ও নদীর পানিকে দূষিত করছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধ কৃষকরা যাতে ব্যবহার না করে সে জন্য তাদেরকে বোঝাতে হবে। এসব ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে পানি দূষণ রোধ করা যাবে, তোমরাও সহজেই বিশুদ্ধ পানি পাবে।

এ অধ্যায়ের নতুন শব্দ

ক্যাভেন্ডিস	কীটনাশক ওষুধ	ব্লিচিং পাউডার
সালফিউরিক এসিড	রাসায়নিক সার	পানিচক্র
তড়িৎ বিশ্লেষণ	পটাশ পারম্যাঙ্গানেট	পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র
বর্জ্য পদার্থ	ডিটারজেন্ট	

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কোনটি পানি চক্রের ধাপ ?

ক. নদী → বৃষ্টি → বাষ্প → সমুদ্র → মেঘ

খ. সমুদ্র → মেঘ → বাষ্প → বৃষ্টি → পানি

গ. পানি → নদী → মেঘ → বৃষ্টি → বাষ্প → সমুদ্র

ঘ. পানি → বাষ্প → মেঘ → বৃষ্টি → নদী → সমুদ্র

২. পুকুরের পানি রাসায়নিক সার দ্বারা দূষিত হলে মাছ মরে যায় কেন ?

ক. মাছ দূষিত পানি পান করে
খ. মাছের খাদ্য বিষাক্ত হয়ে যায়
গ. পানিতে অক্সিজেনের অভাব হয়
ঘ. পানিতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়।

৩. পানীয় জলে ক্লোরিন যোগ করা হয় কেন ?

ক. পানি সুস্বাদু করার জন্য
খ. পানির ক্ষতিকর জীবানু নষ্ট করার জন্য
গ. পানির অদ্রাব্য পদার্থ দ্রবীভূত করার জন্য
ঘ. পানির পুষ্টিকর গুণ বৃদ্ধি করার জন্য

৪.

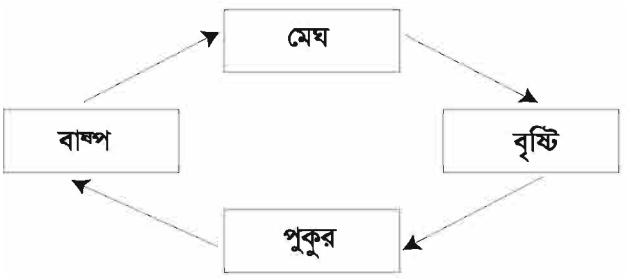

চিত্র

উপরের চিত্রটি নির্দেশ করে

ক. পানি চক্র
খ. বাষ্প ও মেঘের সম্পর্ক
গ. বাষ্প ও বৃষ্টির সম্পর্ক
ঘ. মেঘ ও বৃষ্টির সম্পর্ক

৫. ৪নং চিত্রে প্রদর্শিত পানির অপেক্ষাকৃত বেশি নিরাপদ উৎস

i. পুকুর
ii. বৃষ্টি
iii. মেঘ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন

সজল পান করার জন্য বাসা থেকে ফুটানো পানি স্কুলে নিয়ে যায়। এক দিন সে বাসা থেকে পানি না নেওয়ায় স্কুলের ট্যাপের দূষিত পানি পান করে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়। সে ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি তাকে সব সময় ফুটানো পানি পান করার জন্য বলেন। তিনি সকলকে খাবার স্যালাইন পান করার পরামর্শ দেন এবং বলেন জেনে রেখ "পানির আর এক নাম জীবন"।

ক. পানি দূষণ কী ?
খ. ট্যাপের পানি পান করে সজল ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হল কেন ?
গ. ট্যাপের পানিকে কীভাবে নিরাপদ করা যায়।
ঘ. ডাক্তার "পানির আর এক নাম জীবন" বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীব জগৎ

আমাদের চারপাশের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল, মাটি, পানি, নদীনালা, পাহাড়–পর্বত, যানবাহন, গাছপালা, পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ, ফুল, ফল প্রভৃতি মিলে গড়ে উঠেছে আমাদের পরিবেশ। আমাদের পরিবেশের এই উপাদানগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, যেমন· জীব ও জড়।

গাছপালা, পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ, মানুষ ইত্যাদির জীবন আছে তাই এদের জীব বলা হয়। আর মাটি, পানি, চেয়ার, টেবিল, পাহাড়–পর্বত, চাঁদ, সূর্য ইত্যাদির জীবন নেই। তাদের জড় বস্তু বলা হয়।

এ থেকে দেখা গেল যে, জীব ও জড় বস্তুর মধ্যে মূল পার্থক্য হল জীবন। এ জীবন আছে বলেই জীবের মধ্যে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কিন্তু জড় বস্তুতে সেসব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। নিচে জীবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১। নড়ন ও চলন

তোমরা জেনেছ জীবদেহ অসংখ্য কোষ দিয়ে গঠিত। এই কোষে এক রকম ঘন থকথকে জেলীর মত পদার্থ থাকে। একে প্রোটোপ্লাজম বলে। এ প্রোটোপ্লাজমের জন্যই জীব নড়াচড়া করে। জীবের এ নড়াচড়াকে নড়ন বলে। নড়ন বলতে কিন্তু জীব দেহের জায়গা পরিবর্তন বুঝায় না।

জীবের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়াকে চলন বলে। মানুষ, পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ, মাছ ইত্যাদির চলন সহজে দেখা যায়। গাছপালা মাটিতে এক জায়গায় স্থির থাকে। অন্য জায়গায় যেতে পারে না।

চিত্র ৬.১ : প্রাণীর চলন

কিন্তু এদের দেহের অংশ বিশেষ যেমন· শিকড়, ডাল, আকর্ষী ইত্যাদি নড়াচড়া করে। এ থেকে বোঝা যায় প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রয়োজনমত নড়াচড়া করে। জড়বস্তু নড়ন ও চলনে অক্ষম।

চিত্র ৬.২ : উদ্ভিদের নড়ন

২। অনুভূতি

জীব (কোষের প্রোটোপ্লাজম) উত্তেজনায় সাড়া দেয়। যেমন লজ্জাবতীর পাতা ছুলে পাতা বন্ধ হয়ে যায়। প্রাণীকে আঘাত করলে ব্যথা পায়। শামুককে ছুলে দেহকে খোলসের ভিতরে গুটিয়ে নেয়। অনুরূপভাবে প্রাণী আলো ও তাপের উপস্থিতি বুঝতে পারে। তাই তাদের অনুভূতি আছে। জড়বস্তুতে কোনো অনুভূতি নেই।

চিত্র : ৬.৩ জীবের অনুভূতি

৩। বৃদ্ধি

জীব মাত্রই খাদ্য গ্রহণ করে। এ খাদ্য হজম হয়ে দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণের কাজে লাগে। আমরা জানি যে গাছপালা, মানুষ, পশু–পাখি সকলেই ছোট থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়। ফলে দেহের আকার এবং ওজন বৃদ্ধি পায়। জীবের এরূপ আকার এবং ওজন বেড়ে যাওয়াকে বৃদ্ধি বলে। ছবির সাহায্যে নারিকেল থেকে অঙ্কুরিত বীজ → চারাগাছ → নারিকেল গাছে পরিণত হওয়া, দেখানো হয়েছে।

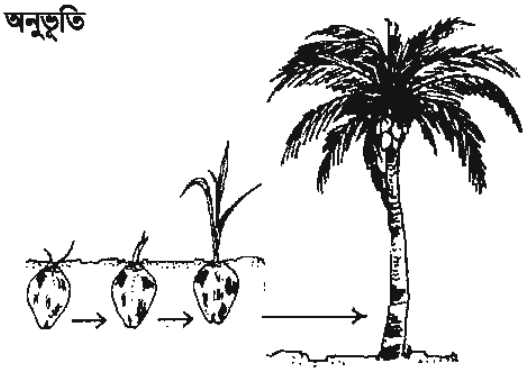

চিত্র : ৬.৪ উদ্ভিদের বৃদ্ধি

৪। শ্বাস–প্রশ্বাস

জীব অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। জড় বস্তুতে এর দরকার হয় না।

৫। প্রজনন বা বংশ বৃদ্ধি

জীবের বংশ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে প্রজনন বলে। যেমন, গাছের বীজ থেকে চারা গাছ জন্মায়। কিন্তু মুরগি ডিম পাড়ে, পরে ডিম ফুটে বাচ্চা হয়।

অপর দিকে মানুষ, গরু, ছাগল, বিড়াল ইত্যাদি বাচ্চা প্রসব করে। প্রজননের মাধ্যমে জীবনের ধারা বজায় থাকে।

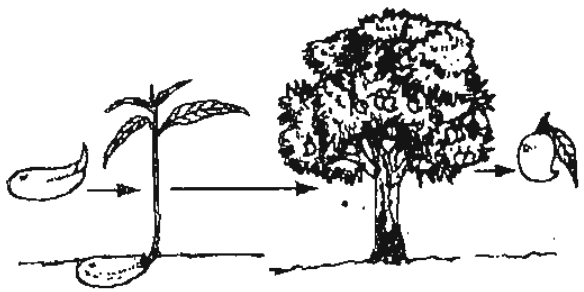

৬। মৃত্যু

উদ্ভিদ ও প্রাণী চিরদিন বেঁচে থাকে না। জীবের জীবন কালকে শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য এই তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। উদ্ভিদ ও প্রাণী শৈশবে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে, যৌবনে প্রজননের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে। তারপর এক দিন প্রাণী ও উদ্ভিদের সব জীবনী শক্তি ফুরিয়ে যায়। অর্থাৎ জীবের মৃত্যু হয়। জড় বস্তুর মৃত্যু নেই।

চিত্র : ৬.৫ জীবের বংশ বৃদ্ধি

জীব ও জড়ের পার্থক্য

	জীব	জড়
১।	জীবদেহ প্রোটোপ্লাজম দিয়ে গঠিত।	১। জড় বস্তুর প্রোটোপ্লাজম নেই।
২।	জীব আপন শক্তি বলে চলাফেরা করতে পারে।	২। জড়ের নিজের কোনো চলন শক্তি নেই।
৩।	জীবের অনুভূতি আছে।	৩। জড়ের অনুভূতি নেই।
৪।	জীব খাদ্য গ্রহণ করে ফলে দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধিত হয়।	৪। জড়বস্তু খাদ্য গ্রহণ করে না।
৫।	জীব শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে।	৫। জড় পদার্থ শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে না।
৬।	জীব পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে।	৬। জড় পদার্থের সে ক্ষমতা নেই।
৭।	জীবের প্রজনন ক্ষমতা আছে।	৭। জড়ের প্রজনন ক্ষমতা নেই।
৮।	জীবের জীবন চক্র নির্দিষ্ট।	৮। জড়ের কোনো নির্দিষ্ট জীবন চক্র নেই।
৯।	জীবদেহের আয়তন নির্দিষ্ট।	৯। জড় বস্তুর আয়তন নির্দিষ্ট নয়।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্য

আমরা জেনেছি যে জীব বলতে উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়কে বুঝায়। জীবের মধ্যে যেগুলো সাধারণত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাফেরা করতে পারে তাদেরকে আমরা প্রাণী বলি। যেমন কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল, হাতি, ঘোড়া, উট, মহিষ, মাছ, সাপ, মশা, মাছি, ফড়িং, কেঁচো ইত্যাদি।

আর জীবের মধ্যে যেগুলো সাধারণত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাফেরা করতে পারে না অর্থাৎ মাটিতে এক জায়গায় স্থির থাকে তাদেরকে উদ্ভিদ বলে থাকি। কিন্তু উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশ যেমন শিকড়, পাতা, কান্ড, ডাল, আকর্ষী ইত্যাদি নড়াচড়া করে।

উদ্ভিদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

উদ্ভিদ সাধারণত সবুজ ও স্বভোজী; কঠিন খাদ্য গ্রহণে অক্ষম; কোষ জড় কোষ প্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত, সাধারণত চলনে অক্ষম এবং শ্বসন, রেচন ও পরিপাক ইত্যাদি তন্ত্রহীন।

প্রাণীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

প্রাণী সাধারণত পরভোজী; চলনে সক্ষম; কঠিন, তরল সব রকম খাদ্য গ্রহণ করতে পারে; কোষে জড় কোষ প্রাচীর নেই এবং এদের স্নায়ু, রেচন, পরিপাক ও শ্বসন ইত্যাদি তন্ত্র আছে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে বেশ কিছু মিল থাকলেও এদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্যও আছে।

নিচে উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রধান পার্থক্যগুলো দেখানো হল

	উদ্ভিদ	প্রাণী
১।	ক্লোরোফিল বা সবুজ কণা থাকে, সে কারণে সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে।	১। ক্লোরোফিল থাকে না বলে নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না। তাই প্রাণী উদ্ভিদের উপর খাদ্যের জন্য নির্ভর করে।
২।	অধিকাংশ উদ্ভিদের চলনের ক্ষমতা নেই।	২। প্রায় সব প্রাণীরই চলনের ক্ষমতা আছে।
৩।	উদ্ভিদ কঠিন খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না।	৩। প্রাণী কঠিন, তরল সব রকম খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।
৪।	সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ ও অক্সিজেন ত্যাগ করে এবং	৪। প্রাণী শ্বসনের সময় অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে।

	শ্বসনের সময় অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে।	কখনই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে না।
৫।	দেহের গঠন ও আকার নির্দিষ্ট; শাখা–প্রশাখা সুনির্দিষ্ট নয়।	৫। দেহের গঠন, আকার ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুনির্দিষ্ট।
৬।	উদ্ভিদের নির্দিষ্ট কোনো তন্ত্র নেই।	৬। প্রাণীর বিভিন্ন তন্ত্র আছে।
৭।	অধিকাংশ উদ্ভিদই স্বভোজী।	৭। অধিকাংশ প্রাণী পরভোজী।
৮।	মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উদ্ভিদ বৃদ্ধি পায়।	৮। নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত প্রাণী বৃদ্ধি পায়।
৯।	উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর আছে।	৯। প্রাণীর কোষ প্রাচীর নেই।

প্রাণিজগত

প্রাণিজগতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণী।

অমেরুদণ্ডী প্রাণী

যেসব প্রাণীর শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড নেই, তাদের অমেরুদণ্ডী প্রাণী বলে। যেমন তেলাপোকা, কেঁচো, চিংড়ি, ঝিনুক, শামুক, কাঁকড়া, ক্রিমি, মশা, মাছি ইত্যাদি।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য।

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মত অমেরুদণ্ডী প্রাণীরও কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচে অমেরুদণ্ডী প্রাণীর কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল:

১। মেরুদণ্ড নেই।

২। কোন অন্তঃকঙ্কাল থাকে না।

৩। চোখ সরল প্রকৃতির বা পুঞ্জাক্ষী।

৪। হৃৎপিণ্ড উন্নত ধরনের নয়।

৫। সাধারণত লেজ থাকে না।

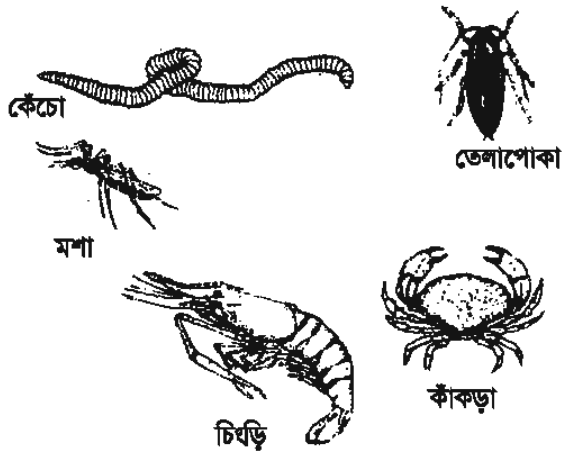

চিত্র ৬.৬ : অমেরুদণ্ডী প্রাণী

মেরুদণ্ডী প্রাণী

যেসব প্রাণীর শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড আছে তাদের মেরুদণ্ডী প্রাণী বলে। যেমন গরু, ছাগল, হাতি, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, ব্যাঙ, সাপ, মাছ, কুমির, বানর, বিড়াল, মানুষ ইত্যাদি।

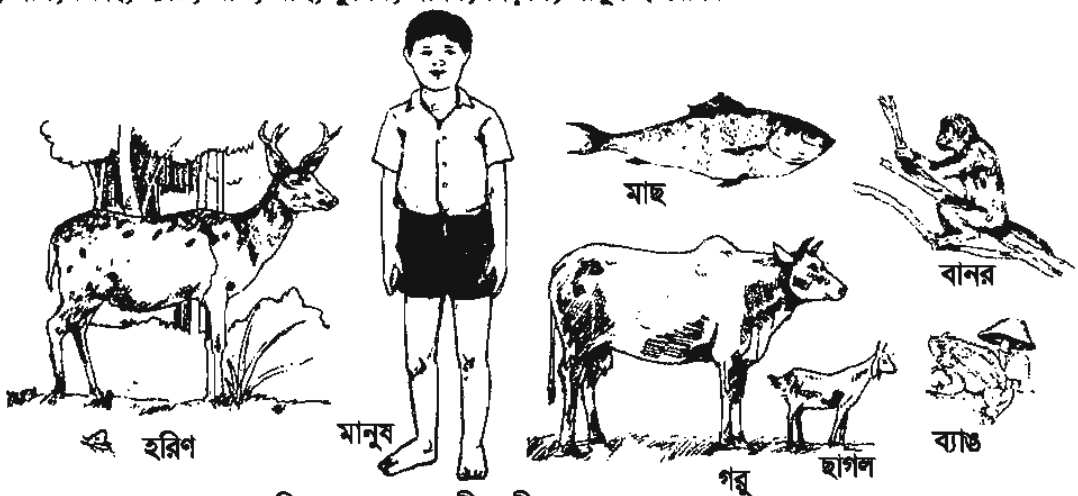

চিত্র ৬.৭ : মেরুদণ্ডী প্রাণী

মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য

অমেরুদণ্ডী প্রাণীর যেমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তেমনি মেরুদণ্ডী প্রাণীরও কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচে মেরুদণ্ডী প্রাণীর কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল :

১। মেরুদণ্ড আছে।

২। অন্তঃকঙ্কাল থাকে।

৩। হৃৎপিণ্ড উন্নত ধরনের।

৪। পাখনা বা পা দুই জোড়ার অধিক নয়।

৫। ফুসফুস বা ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।

৬। চোখ সরল প্রকৃতির।

৭। লেজ আছে (মানুষ ছাড়া)

নিকট পরিবেশের মেরুদণ্ডী প্রাণী

আমাদের নিকট পরিবেশে যে সব মেরুদণ্ডী প্রাণী দেখা যায় এদের পাঁচটি দলে ভাগ করা হয়েছে। নিচে প্রত্যেকটি দলের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(ক) মৎস্যকুল

সকল মাছ এই শ্রেণীভুক্ত। এরা পানিতে বাস করে। যেমন রুই, কাতলা, ইলিশ, কৈ, পুঁটি, টেংরা, শিং, মাগুর, বোয়াল, টাকি ইত্যাদি।

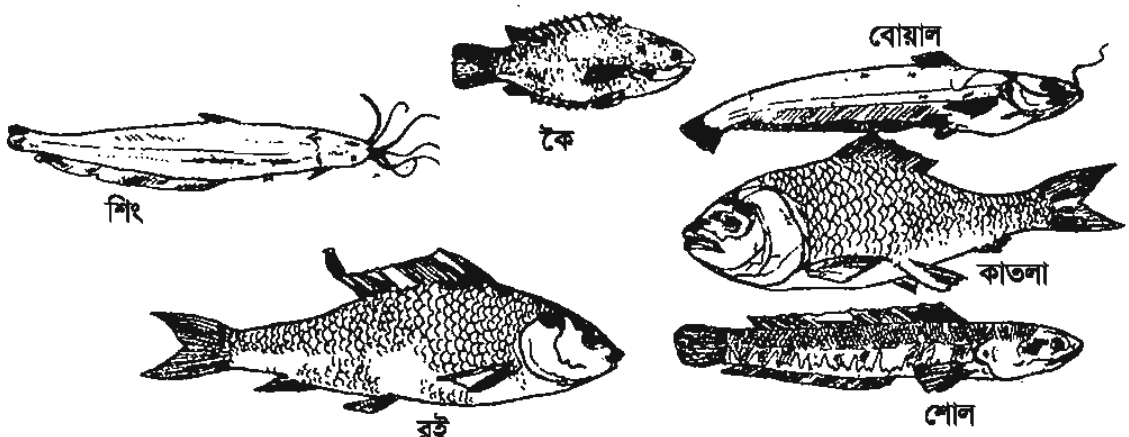

চিত্র ৬.৮ : মৎস্যকুল

বৈশিষ্ট্য

১। অধিকাংশ মাছের গায়ে আঁইশ থাকে। আবার কতকগুলোর আঁইশ থাকে না, যেমন বোয়াল, শিং, মাগুর ইত্যাদি।

২। ফুলকা আছে, ফুসফুস নেই।

৩। দেহে জোড় ও বিজোড় পাখনা আছে এবং তা দিয়ে সাঁতার কাটে।

৪। ফুলকার সাহায্যে শ্বাস–প্রশ্বাস চালায়।

৫। শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী।

(খ) উভচর

যেসব মেরুদণ্ডী প্রাণী জলে এবং স্থলে বাস করতে পারে তাদের উভচর প্রাণী বলে। যেমন সোনা ব্যাঙ ও কুনো ব্যাঙ।

কুনো ব্যাঙ সোনা ব্যাঙ

চিত্র ৬.৯ : উভচর প্রাণী

বৈশিষ্ট্য

১। ত্বক নগ্ন। আঁইশ, লোম, পালক কিছুই নেই।

২। দুই জোড়া পা আছে। পায়ের আঙুলে নখ নেই।

৩। ছোট অবস্থায় ফুলকা থাকে। পরিণত ব্যাঙে ফুলকা লুপ্ত হয়ে ফুসফুস গঠিত হয়।

৪। শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী।

(গ) সরীসৃপ

যেসব প্রাণী বুকে ভর দিয়ে চলে তাদের সরীসৃপ বলে। যেমন সাপ, টিকটিকি, কুমির ইত্যাদি।

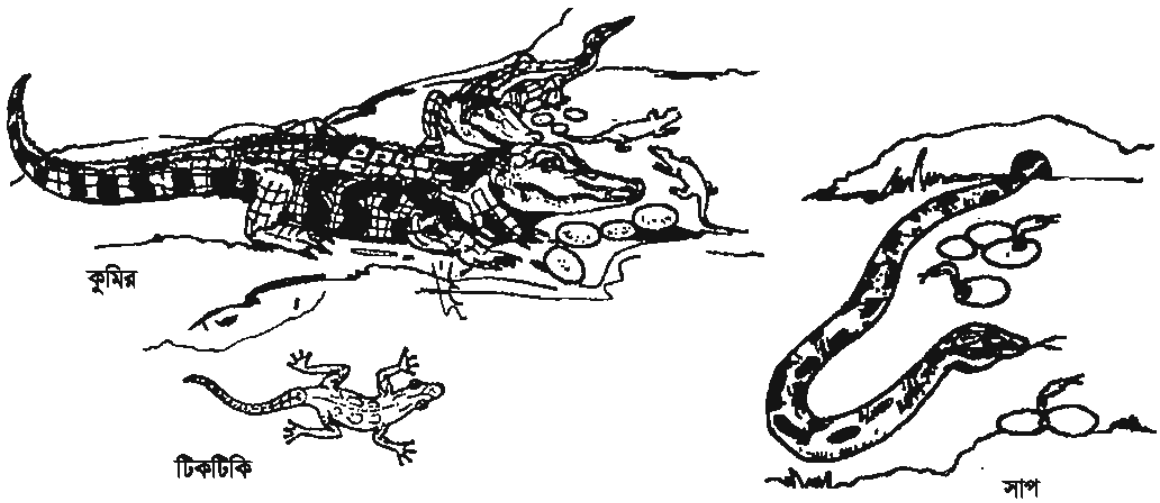

চিত্র ৬.১০ : কয়েকটি সরীসৃপ প্রাণী

বৈশিষ্ট্য

১। ত্বক আঁইশ বা অন্য কোনো শক্ত আবরণে ঢাকা থাকে।

২। বুকে ভর দিয়ে চলে।

৩। আঙুলে নখ থাকে।

৪। ডিম পাড়ে।

৫। ফুসফুস দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালায়।

৬। শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী।

(ঘ) পক্ষীকুল

যাদের পালক আছে তাদেরকে আমরা পাখি বলি। যেমন কাক, কোকিল, দোয়েল, হাঁস, মুরগি, কবুতর, চড়ুই, বাবুই, ময়না, টিয়া, চিল, শকুন, ঈগল, শালিক ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য

১। পাখিদের প্রায় সবাই উড়তে পারে।
২। দেহ পালক দিয়ে ঢাকা।
৩। দুইটি পা ও দুইটি ডানা আছে।
৪। মুখে শক্ত ঠোঁট আছে কিন্তু দাঁত নেই।
৫। দেহের ওজন হালকা করার জন্য বড় বড় হাড়গুলো ফাঁপা।
৬। উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী।
৭। বায়ুথলি আছে।

চিত্র ৬.১১ : পক্ষীকুল

(ঙ) স্তন্যপায়ী

যে সব মেরুদণ্ডী প্রাণী সন্তান প্রসব করে ও সন্তানরা মায়ের দুধ পান করে তাদের স্তন্যপায়ী প্রাণী বলে। যেমন কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল, বানর, মহিষ, গাধা, ঘোড়া, মানুষ ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য

১। দেহে লোম থাকে।
২। বহিঃকর্ণ বিশিষ্ট।
৩। মায়েরা বাচ্চা প্রসব করে এবং স্তনের দুধ পান করায়।
৪। উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী।

অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর পার্থক্য

	অমেরুদণ্ডী প্রাণী		মেরুদণ্ডী প্রাণী
১।	মেরুদণ্ড নেই।	১।	মেরুদণ্ড আছে
২।	সাধারণত লেজ থাকে না।	২।	অধিকাংশ মেরুদণ্ডী প্রাণীর (মানুষ ছাড়া) লেজ আছে।
৩।	হৃৎপিণ্ড উন্নত ধরনের নয়।	৩।	হৃৎপিণ্ড উন্নত ধরনের।
৪।	চোখ সরল প্রকৃতির অথবা পুঞ্জাক্ষী।	৪।	চোখ সরল প্রকৃতির।
৫।	সাধারণত অন্তঃকঙ্কাল থাকে না।	৫।	অন্তঃকঙ্কাল থাকে।

জীব জগতে মানুষের স্থান

প্রাণীর মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। মানুষ একমাত্র প্রাণী যে খাড়া হয়ে চলতে পারে। মানুষের মস্তিষ্ক সব প্রাণীর চেয়ে বড়। তাই মানুষের বুদ্ধি সবচেয়ে বেশি। মানুষ বুদ্ধির বলে পৃথিবীর সর্বত্র রাজত্ব করছে। আজকের দুনিয়ার মানুষ মহাকাশে, চাঁদে, সুউচ্চ পর্বতে, অতল সাগরে বিচরণ করছে। তাই জীব জগতের মধ্যে মানুষের স্থান সকল জীবের উপরে।

এ অধ্যায়ের নতুন শব্দ

প্রোটোপ্লাজম	সরীসৃপ
প্রজনন	স্তন্যপায়ী
ক্লোরোফিল	পুঞ্জাক্ষী

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কোনটি খেচর প্রাণী ?

ক. মহিষ খ. কুমির
গ. দোয়েল ঘ. সোনা ব্যাঙ

২. কোন স্তন্যপায়ী প্রাণী খাড়াভাবে হাঁটতে পারে ?

ক. মানুষ খ. মুরগি
গ. চিতাবাঘ ঘ. গন্ডার

৩. প্রাণীর বৈশিষ্ট্য কোনটি ?

ক. সবুজ ও স্বভোজী খ. নির্দিষ্ট তন্ত্র আছে
গ. কঠিন খাদ্য গ্রহণে অক্ষম ঘ. কোষ প্রাচীর জড় পদার্থ দিয়ে পরিবেষ্টিত।

নিচের চিত্র থেকে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

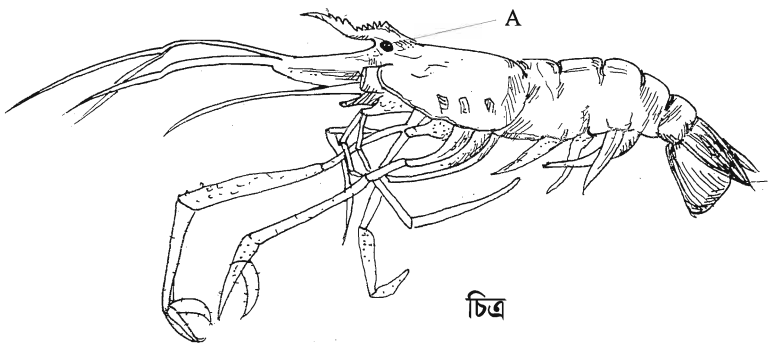

চিত্র

৪. উপরের চিত্রে A চিহ্নিত অংশটি হল

ক. রস্ট্রাম খ. পুঞ্জাক্ষী
গ. টেলসন ঘ. ক্যারাপেস

৫. চিত্রের প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

i. এদের কোনো অন্তঃকঙ্কাল নেই
ii. এদের লেজ খন্ডায়িত থাকে
iii. এদের কোনো পা নেই

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৬. ছোট অবস্থায় ফুলকা থাকে কিন্তু পরিণত অবস্থায় ইহা লুপ্ত হয়ে ফুসফুসে পরিণত হয়

i. বোয়াল
ii. ব্যাঙ
iii. কুমির

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

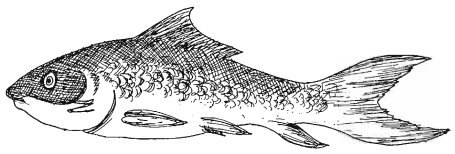

চিত্র – A

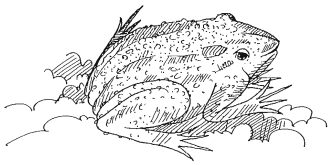

চিত্র – B

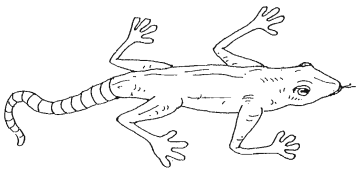

চিত্র – C

ক. চিত্র A ও B এর প্রাণী দুইটি কোন ধরনের ?
খ. এ ধরনের প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর ।
গ. উপরের প্রাণী ৩টির মধ্যে মিল অমিল ব্যাখ্যা কর ।
ঘ. উপরের চিত্র B এর প্রাণিটি আমাদের অর্থনীতি ও পরিবেশে কীভাবে প্রভাব ফেলে আলোচনা কর ।

২.

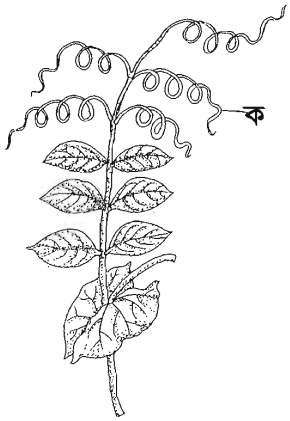

চিত্র A

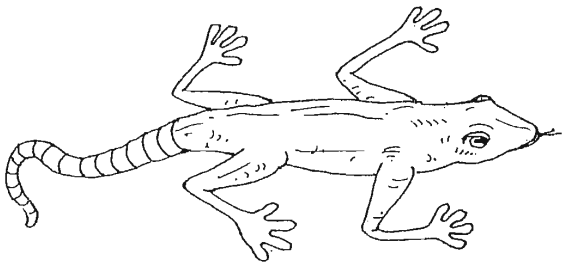

চিত্র B

ক. উদ্ভিদ কাকে বলে ?
খ. ক চিহ্নিত অংশটির কাজ ব্যাখ্যা কর।
গ. কোন কোন বৈশিষ্ট্যর কারণে B চিত্রের প্রাণীটি কুমির হতে আলাদা।
ঘ. A এবং B এর মধ্যে পার্থক্য লিখ।

সপ্তম অধ্যায়

কোষ : জীব দেহের একক

তোমরা অনেকেই দালান তৈরি করতে দেখেছ। এও হয়তো লক্ষ করেছ যে রাজমিস্ত্রি একটির পর একটি ইট গেঁথে দালান তৈরি করে। এই এক একটি ইট হচ্ছে দালানের একক। ইট যেমন দালান গঠনের একক তেমনি জীব দেহ অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহ এক বা একাধিক একক দিয়ে গঠিত। জীব দেহের গঠন ও কাজের এককের নাম হচ্ছে কোষ। এখন হয়তো তোমাদের জানতে ইচ্ছে হচ্ছে কে, কখন এবং কীভাবে এ কোষ আবিষ্কার করেছেন? বলছি শোন।

ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক ১৬৬৫ সালে সর্বপ্রথম কোষ আবিষ্কার করেন। তিনি বোতলের কর্কের পাতলা প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রেখে পর্যবেক্ষণ করেন। এ পর্যবেক্ষণে তিনি প্রাচীরযুক্ত অসংখ্য মৌচাকের মত প্রকোষ্ঠ দেখতে পান। তিনি এগুলোর নাম দেন সেল। যাকে আমরা বাংলায় কোষ বলি। জীব দেহের যাবতীয় কাজের মূল এ কোষ। অধিকাংশ কোষ আয়তনে এত ছোট যে এদের খালি চোখে দেখা যায় না। তাই এদের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয়।

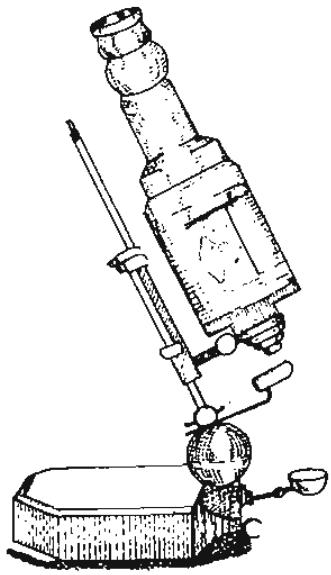

চিত্র ৭.১ : বিজ্ঞানী হুকের অনুবীক্ষণ যন্ত্র

উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষ পরীক্ষণ

চল এবার উদ্ভিদ কোষ (পিঁয়াজের কোষ) এবং প্রাণী কোষ (মানুষের গালের কোষ) অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রেখে পর্যবেক্ষণ করি এবং এদের চিত্র এঁকে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করি।

পিঁয়াজের কোষ পরীক্ষণ

পিঁয়াজের একটি মাংসল শল্ক পত্র ভেঙে নাও। তারপর পিঁয়াজের বহিঃত্বকের আবরণটি আলাদা কর এবং এর কিছু অংশ স্লাইডে রাখ। এবার এক ফোঁটা পানি বা গ্লিসারিন দিয়ে স্লাইডটি কভার স্লিপ দিয়ে ঢেকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রাখ এবং কোষের গঠন লক্ষ কর। তারপর কভার স্লিপ উঠিয়ে নিয়ে এক ফোঁটা আয়োডিন মিশিয়ে আবার অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রেখে লক্ষ কর, হালকা বাদামী রঙের যে গঠন দেখবে তা হল নিউক্লিয়াস। কোষ প্রাচীর কেমন তাও লক্ষ কর। পরীক্ষণে যা লক্ষ করলে এবার তা খাতায় আঁক ও চিহ্নিত কর।

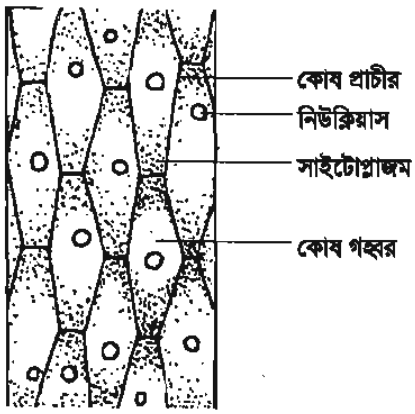

চিত্র ৭.২ : পিঁয়াজের কোষ

মানুষের গালের কোষ

পরিষ্কার পানি দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নাও। তারপর গালের ভেতরের দিকে হাতের আঙুল দিয়ে ঘষ। দেখবে তোমার আঙ্গুলে লেগে গেছে সাদা রঙের কিছু জিনিস। এবার এগুলোকে স্লাইডে ঘষে হালকাভাবে ছড়িয়ে দাও। দেখবে স্লাইডে এগুলো আঠালো প্রলেপের মত হবে। এ প্রলেপের উপর নীল রং দাও। তারপর কভার স্লিপ দিয়ে ঢেকে দাও এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে লক্ষ কর।

স্লাইডে কিছু দানাদার ধূসর বর্ণের কোষ দেখা যাবে। কোষের বেশি ঘন বস্তুটি হচ্ছে নিউক্লিয়াস। এবার কোষের চিত্র আঁক এবং যেসব অংশ সনাক্ত করতে পারলে তা চিত্রে চিহ্নিত কর। উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী কোষের পার্থক্য লক্ষ কর।

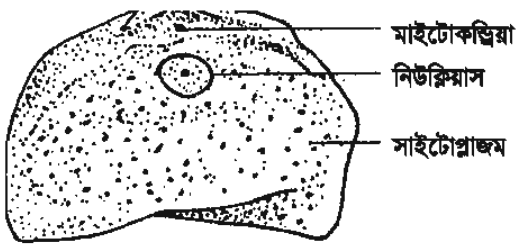

চিত্র ৭.৩ : গালের কোষ

একটি জীব কোষের গঠন

একটি জীব কোষ এতই ছোট যে তা খালি চোখে দেখা যায় না। তাই বলে মানুষ কিন্তু বসে নেই। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এ কোষ বেশ ভালভাবে দেখা যায়। বর্তমানে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কোষের সূক্ষ্ম অংশগুলোও দেখা যায়। এর ফলে কোষে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গাণু আবিষ্কৃত হয়েছে। নিম্নে একটি জীবকোষের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

(ক) কোষ প্রাচীর

শুধু উদ্ভিদ কোষে কোষ প্রাচীর দেখা যায়। প্রাণী কোষে এ রকম কোষ প্রাচীর নেই। এটি জড় পদার্থের তৈরি। কোষ প্রাচীর কোষের আকার প্রদান করে এবং ভিতর ও বাইরের মধ্যে তরল পদার্থের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

চিত্র ৭.৪ : জীব কোষ

(খ) প্রোটোপ্লাজম

কোষ প্রাচীরের অভ্যন্তরে পাতলা পর্দা বেষ্টিত জেলীর ন্যায় থকথকে অর্ধ তরল সজীব বস্তুটিকে প্রোটোপ্লাজম বলে। একে জীবনের ভৌত ভিত্তি বলা হয়। প্রাটোপ্লাজমে পানির পরিমাণ ৭০–৯০ ভাগ। এটি পানিশূন্য অবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে। কোষের তিনটি অংশ, যা কোষ ঝিল্লী, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস।

১। কোষ ঝিল্লী বা প্লাজমা মেমব্রেন

সম্পূর্ণ প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে যে নরম ও পাতলা পর্দা দেখা যায় তাই কোষ ঝিল্লী। এটি একটি দুই স্তর বিশিষ্ট পর্দা। এর কোথাও কোথাও ভাঁজ থাকে। এটি কোষের ভিতর ও বাইরের মধ্যে পানি, খনিজ পদার্থ ও বিভিন্ন বস্তুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

২। সাইটোপ্লাজম

নিউক্লিয়াসের বাইরে অবস্থিত কোষঝিল্লী দিয়ে পরিবেষ্টিত প্রোটোপ্লাজমকেই সাইটোপ্লাজম বলে। এর প্রধান কাজ কোষের অঙ্গাণুগুলো ধারণ করা। কিছু জৈবিক কাজও এখানে সম্পন্ন হয়।

সাইটোপ্লাজমে পাওয়া যায় এমন কয়েকটি অঙ্গাণুর পরিচিতি আলোচনা করা হল :

প্লাস্টিড

এগুলোকে বর্ণাধারও বলে। সাধারণত প্রাণী কোষে এদের পাওয়া যায় না। প্লাস্টিড উদ্ভিদ কোষের বৈশিষ্ট্য। পাতা, ফুল বা ফলের যে বিচিত্র রং আমরা দেখি তা সবই এ প্লাস্টিডের কারণে। কোনো অঙ্গের প্লাস্টিড যখন যে রং অধিক ধারণ করে তখন বাইরে থেকে সে অঙ্গটিকে ঐ রঙের দেখায়। প্লাস্টিড যখন সবুজ রঙের ক্লোরোফিল অধিক পরিমাণে ধারণ করে তখন তাকে ক্লোরোপ্লাস্ট বলে। অন্যান্য রং যেমন লাল, হলুদ বা নীল রং অধিক ধারণ করলে ঐ প্লাস্টিডকে ক্রোমোপ্লাস্ট বলে। এ জন্যই জবা ফুল লাল, করবী হলুদ আর অপরাজিতা নীল হয়। প্লাস্টিড কোনো রং ধারণ না করলে তাকে লিউকোপ্লাস্ট বলা হয়।

প্লাস্টিড লম্বাটে, গোল, চ্যাপ্টা, ফিতার ন্যায়, আংটার ন্যায় ইত্যাদি নানা আকারের হতে পারে। প্রতি কোষে প্লাস্টিডের সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে। প্লাস্টিড দুই স্তর বিশিষ্ট পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। এর ভিতরে বিভিন্ন রং লুকিয়ে থাকে। সবুজ প্লাস্টিড প্রধানত খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে। অন্যান্য রঙের প্লাস্টিড উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গকে রঙিন করে আকর্ষণীয় করে তোলে। বর্ণহীন প্লাস্টিড খাদ্য সঞ্চয় করে।

মাইটোকন্ড্রিয়া

একে কোষের শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র বলা হয়। কারণ এ অঙ্গাণুর অভ্যন্তরে শক্তি উৎপাদনের প্রায় সকল বিক্রিয়া ঘটে থাকে। এরা দন্ডাকার, বৃত্তাকার বা তারকাকার হতে পারে। এরা দুই স্তর বিশিষ্ট ঝিল্লী দিয়ে আবৃত থাকে। বাইরের স্তর মসৃণ কিন্তু ভিতরের স্তরটি ভাঁজযুক্ত।

মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রধান কাজ শ্বসন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে শক্তি উৎপাদন করা। তাই মাইটোকন্ড্রিয়াকে শক্তির আধার বলা হয়।

কোষ গহ্বর

কোষের অভ্যন্তর ভাগে যে ফাঁকা জায়গা দেখা যায় তাকে কোষ গহ্বর বলে। উদ্ভিদ কোষে গহ্বর খুবই বড় থাকে। প্রাণিকোষে কোষ গহ্বর থাকে না। থাকলে এরা খুবই ছোট হয়। গহ্বরের ভেতর যে রস থাকে তাকে কোষ রস বলে। কোষ রস ধারণ করাই গহ্বরের প্রধান কাজ।

রাইবোসোম

এটি অতি ক্ষুদ্র গোলাকার বস্তু। প্রতিটি কোষেই এদের সংখ্যা খুবই বেশি। রাইবোসোমের প্রধান কাজ আমিষ প্রস্তুতিতে সহায়তা করা।

সেন্ট্রোসোম

প্রাণিকোষের নিউক্লিয়াসের উপরে একটি অঙ্গাণু থাকে। একে সেন্ট্রোসোম বলা হয়। এটি উদ্ভিদ কোষে অনুপস্থিত। সেন্ট্রোসোম কোষ বিভাজনে সাহায্য করে।

৩। নিউক্লিয়াস

জীব কোষের প্রোটোপ্লাজমে অপেক্ষাকৃত ঘন ও গোলাকার যে বস্তুটি দেখা যায় তাকে নিউক্লিয়াস বলে। নিউক্লিয়াসই কোষের প্রধান অংশ। এর অনুপস্থিতিতে কোষের কাজ করার ক্ষমতা থাকে না। একটি নিউক্লিয়াস প্রধানত

(ক) নিউক্লিয় ঝিল্লী
(খ) নিউক্লিয়প্লাজম
(গ) ক্রোমোসোম এবং
(ঘ) নিউক্লিয়লাস নিয়ে গঠিত।

নিউক্লিয়াস কোষের সকল প্রকার জৈবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। সেজন্য নিউক্লিয়াসকে কোষের প্রাণ কেন্দ্র বলা হয়।

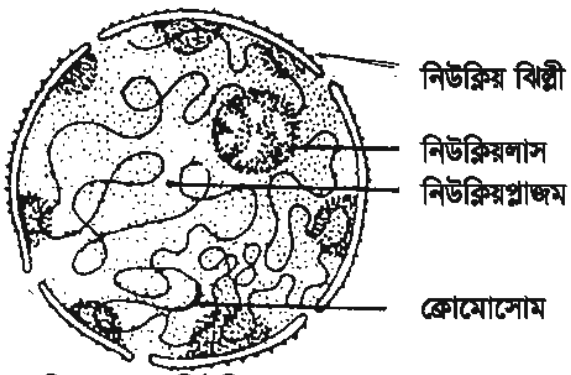

চিত্র ৭.৫ : নিউক্লিয়াস

উদ্ভিদ কোষ ও প্রাণী কোষের পার্থক্য

আলোচ্য বিষয়	উদ্ভিদ কোষ	প্রাণী কোষ
১। কোষ প্রাচীর	উদ্ভিদ কোষে প্লাজমা মেমব্রেনের বাইরে সেলুলোজের তৈরি কোষ প্রাচীর থাকে।	প্রাণী কোষে শুধুমাত্র প্লাজমা মেমব্রেন থাকে, কোষ প্রাচীর থাকে না।
২। গহ্বর	পরিণত উদ্ভিদ কোষে বড় গহ্বর থাকে।	প্রাণী কোষে গহ্বর থাকে না, থাকলেও ছোট।
৩। প্লাস্টিড	উদ্ভিদ কোষে সাধারণত প্লাস্টিড থাকে।	প্রাণী কোষে প্লাস্টিড থাকে না।
৪। সেন্ট্রোসোম	সাধারণত উদ্ভিদ কোষে সেন্ট্রোসোম থাকে না।	প্রাণী কোষে সেন্ট্রোসোম থাকে।
৫। নিউক্লিয়াসের অবস্থান	উদ্ভিদ কোষের কেন্দ্রে বড় কোষ গহ্বর থাকায় নিউক্লিয়াস কোষ প্রাচীরের কাছে অবস্থান করে।	প্রাণী কোষে নিউক্লিয়াস কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে।

এ অধ্যায়ের নতুন শব্দ

প্রস্থচ্ছেদ	সেল	সাইটোপ্লাজম	নিউক্লিয়াস
প্লাস্টিড	শ্বসন	প্রাজমা মেমব্রেন	সেলুলোজ
নিউক্লিয়প্লাজম	গ্লিসারিন	ক্লোরোপ্লাস্ট	সেন্ট্রোসোম
ক্রোমোপ্লাস্ট	লিউকোপ্লাস্ট	স্লাইড	

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কোষ আবিষ্কার করেন কে ?

ক. লিউয়েন হুক — খ. রবার্ট হুক

গ. হ্যাক্সলী — ঘ. মেন্ডেল

২. কোষের অধিক ঘন বস্তুটি হচ্ছে

ক. নিউক্লিয়াস — খ. মাইটোকন্ড্রিয়া

গ. ক্লোরোপ্লাস্ট — ঘ. রাইবোজোম

৩. বর্ণহীন প্লাস্টিডের প্রধান কাজ হচ্ছে

ক. খাদ্য তৈরি করা — খ. খাদ্য সঞ্চয় করা

গ. ফুলের রং তৈরি করা — ঘ. পাতার রং তৈরি করা

৪. প্রাণীকোষে আছে কিন্তু উদ্ভিদকোষে নেই এমন অঙ্গাণু হল

i. প্লাস্টিড

ii. সেন্ট্রোসোম

iii. মাইটোকন্ড্রিয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i — খ. ii

গ. i ও ii — ঘ. ii ও iii

নিচের চিত্রটি থেকে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

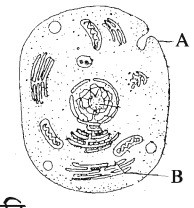

৫. A চিহ্নিত অংশটি

i. কোষের আকার প্রদান করে

ii. দুই স্তর বিশিষ্ট পর্দা দিয়ে তৈরি

iii. কোষের ভিতর থেকে তরল পদার্থ বের হতে বাধা দেয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৬. B চিহ্নিত অংশটি

i. প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয় কোষে থাকে।

ii. কোষ বিভাজনে সহায়তা করে।

iii. প্রোটিন সংশ্লেষণে সহায়তা করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচে জীবকোষের একটি অংশের অসম্পূর্ণ চিত্র দেওয়া হলো

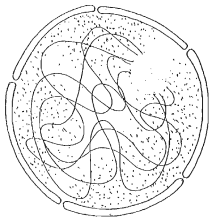

ক. উপরের চিত্রটি কোষের কোন অঙ্গাণু ?

খ. প্রাণিকোষে এবং উদ্ভিদকোষে উপরের অংশটির অবস্থান ব্যাখ্যা কর।

গ. উপরের অসম্পূর্ণ চিত্রটিকে এঁকে সম্পূর্ণ কর এবং বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

ঘ. উপরের অংশটিকে কোষের অত্যাবশ্যকীয় অংশ বলা হয় কেন ব্যাখ্যা কর।

২.

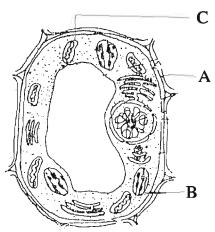

ক. চিত্রটি কিসের ?

খ. A চিহ্নিত অংশটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

গ. C চিহ্নিত অংশটি কোষে না থাকলে কী হত ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রের B চিহ্নিত অংশটি উক্ত কোষের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বহন করে আলোচনা করে?

অষ্টম অধ্যায়

উদ্ভিদ জগৎ

জীব জগৎ প্রাণী ও উদ্ভিদ নিয়ে গঠিত। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে এ পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ উদ্ভিদ আছে। তোমরা নিশ্চয়ই দেখে থাকবে উদ্ভিদের মধ্যে কোনোটির ফুল–ফল হয় আবার কোনোটির ফুল–ফল হয় না। তাছাড়া কোনোটি আকারে খুব বড় এবং কোনোটি এতই ক্ষুদ্র যে খালি চোখে দেখা যায় না। আবার আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদির মূল, কাণ্ড, শাখা–প্রশাখা, পাতা, ফুল, ফল সবই আছে। এছাড়া এমন কতকগুলো উদ্ভিদ আছে যাদের মূল, কাণ্ড, পাতা নেই। ধান, গম, ডাল, বেগুন, কপি আমরা খাই। পাট, তুলা থেকে আঁশ পাই, যা দিয়ে বস্ত্র তৈরি করি। শাল, সেগুন, মেহগনি, কড়ই থেকে কাঠ পাই, যা দিয়ে আমরা বাড়িঘর ও আসবাবপত্র তৈরি করি। অর্জুন, গন্ধতাদুলী, তুলসী, থানকুনি, আকন্দ, শতমূলী, বাসক, কালমেঘ ইত্যাদি উদ্ভিদ দিয়ে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ তৈরি হয়। উদ্ভিদকে মানুষের কল্যাণে লাগাতে হলে উদ্ভিদ সম্পর্কে ভালভাবে জানা একান্ত প্রয়োজন।

বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ সম্পর্কে কম সময়ে সহজ উপায়ে জানার জন্য বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদের আকার, গঠন, জীবনকাল, ফুল–ফল ধারণ ক্ষমতা, কাণ্ডের প্রকৃতি, খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এবং সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। একেই উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ বলে।

উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনীয়তা

উদ্ভিদ জগৎ অত্যন্ত বিশাল ও বৈচিত্র্যময়। এই বিশাল উদ্ভিদ জগতের একটি উদ্ভিদ অন্যটি হতে ভিন্ন। একটি একটি করে উদ্ভিদ সম্পর্কে জানা কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। কোনো উদ্ভিদ জীবন রক্ষাকারী ঔষধ তৈরিতে কাজে লাগে। কোনোটি জমির সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোনো উদ্ভিদ মৎস চাষে বিশেষ উপকারী। কোনো কোনো উদ্ভিদ থেকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নতমানের শস্য, ফলমূল সৃষ্টি করা সহজতর। আবার কোনো কোনো উদ্ভিদ শুষ্ক অঞ্চলে সহজে জন্মে থাকে। কোনোটি লোনা পানিতে ভাল জন্মে। কোনোটি অতি দ্রুত বাড়ে, কোনোটি বন বিভাগের জন্য অধিক সুবিধাজনক। এই সকল বিষয় সম্পর্কে সঠিকভাবে অল্প শ্রমে, স্বল্প সময়ে ও সহজ উপায়ে জানার জন্য উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ করা একান্ত প্রয়োজন।

উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ

বৈজ্ঞানিকগণ এ যাবত জানা সকল উদ্ভিদের একটি করে নাম প্রদান করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছেন। উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার শ্রেণীবিভাগ সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

উদ্ভিদের ফুল ধারণ ক্ষমতাভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

কোনো উদ্ভিদের ফুল ফল হয় এবং কোনো উদ্ভিদের ফুল ফল হয় না। এর উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন (১) অপুষ্পক উদ্ভিদ (২) সপুষ্পক উদ্ভিদ।

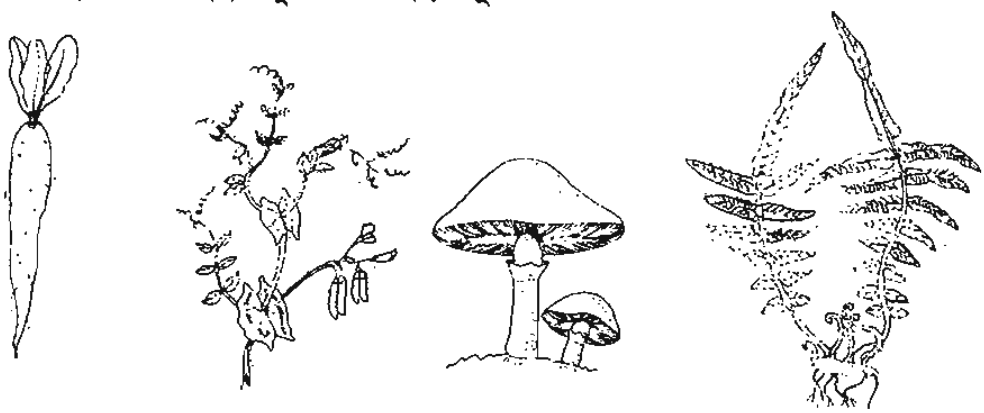

চিত্র ৮.১ : সপুষ্পক ও অপুষ্পক উদ্ভিদ

(১) অপুষ্পক উদ্ভিদ

যে সকল উদ্ভিদে কখনও ফুল হয় না। তাদেরকে অপুষ্পক উদ্ভিদ বলে। রেণু বা স্পোর দিয়ে এদের বংশ বিস্তার হয়। এই অপুষ্পক উদ্ভিদকে আবার চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা

(ক) আদি উদ্ভিদ বর্গ (খ) সমাজ্ঞা বর্গ (গ) মস বর্গ (ঘ) ফার্ন বর্গ।

(ক) আদি উদ্ভিদ বর্গ

এ সকল উদ্ভিদকে খালি চোখে দেখা যায় না। এদের কোনো কোনো সদস্যকে দেখতে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন। এরা সাধারণত অসবুজ এবং পরভোজী। এদের দেহ সরল প্রকৃতির এবং আদি কোষ বিশিষ্ট। ভাইরাস এর দেহে কোনো কোষ নেই। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি এ বিভাগের অন্তর্গত। বিভিন্ন ধরনের রোগের জন্য এরাই প্রধানত দায়ী।

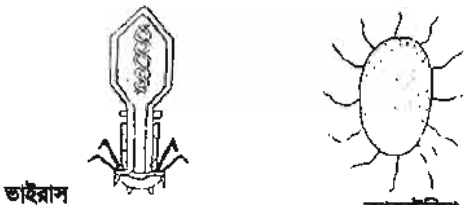

চিত্র ৮.২ : আদি উদ্ভিদ

(খ) সমাজ্ঞা বর্গ

যে সকল উদ্ভিদের দেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না তাদেরকে সমাজ্ঞা বর্গ উদ্ভিদ বলে। সমাজ্ঞা বর্গ উদ্ভিদকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা

(১) শৈবাল : যে সকল সমাজ্ঞা বর্গীয় উদ্ভিদের দেহে ক্লোরোফিল আছে সেগুলোই শৈবাল। এরা এক কোষী বা বহুকোষী হয়ে থাকে। নদীনালা, খালবিল, বদ্ধ পানি, স্যাঁতসেঁতে মাটিতে শৈবাল জন্মে। শৈবালের জন্য সূর্যালোক অপরিহার্য। অন্ধকারে এরা বাঁচতে পারে না। স্পাইরোগাইরা ও ক্লোরেলা এ দুটো সবুজ শৈবাল।

স্পাইরোগাইরা

চিত্র ৮.৩ : শৈবাল

(২) ছত্রাক : যে সকল সমাজ্ঞা বর্গীয় উদ্ভিদের দেহে ক্লোরোফিল নেই তাদেরকে ছত্রাক বলে। ক্লোরোফিল নেই বলে এরা নিজেদের খাদ্য তৈরি করতে পারে না। পচা, স্যাঁতসেঁতে স্থানে ছত্রাক জন্মে থাকে। বাসি রুটির উপর তুলার ন্যায় যে বস্তু জন্মায় তাকে রুটির ছত্রাক বলে। যথা মিউকর। পেনিসিলিয়াম নামক ছত্রাক থেকে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ পেনিসিলিন প্রস্তুত করা হয়।

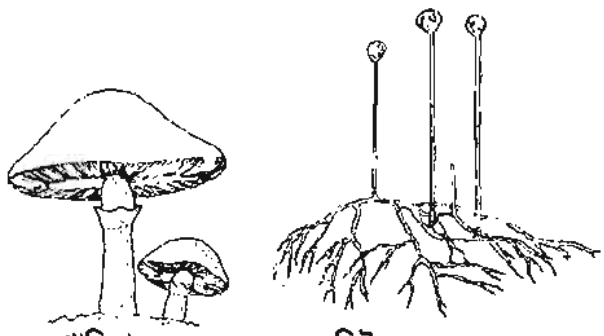

চিত্র ৮.৪ : ছত্রাক

(গ) মস বর্গ

মস বর্গীয় উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতা আছে কিন্তু সাধারণ গাছের মত মূল নেই। এরা নিজেদের খাদ্য তৈরি করতে পারে। মস স্যাঁতসেঁতে মাটি বা পুরাতন ইটের দেওয়ালে জন্মে। যেমন রিকশিয়া, মার্কেনশিয়া ও মস ইত্যাদি।

চিত্র : ৮.৫ মস বর্গ

(ঘ) ফার্ন বর্গ

ফার্ন অপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে উন্নত স্তরের। ফার্নের দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত। ফার্ন পৃথিবীর সব দেশে জন্মে থাকে। বাড়ির পাশে স্যাঁতসেঁতে ছায়াযুক্ত স্থানে এবং পুরাতন দালানের প্রাচীরে প্রচুর পরিমাণে ফার্ন জন্মে থাকে। ফার্নের উৎকৃষ্ট উদাহরণ ঢেঁকি শাক। এরা নিজের খাদ্য তৈরি করতে পারে। শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসেবে অনেকে টবে লাগিয়ে থাকে। সবজি হিসেবে ঢেঁকি শাক খাওয়া যায়।

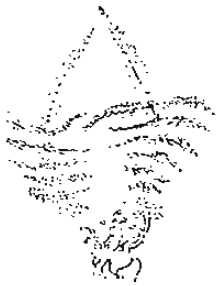

(ঢেঁকি শাক)

চিত্র : ৮.৬ ফার্ন বর্গ (ঢেঁকিশাক)

(২) সপুষ্পক উদ্ভিদ

যে সকল উদ্ভিদের ফুল হয় তাদের সপুষ্পক উদ্ভিদ বলা হয়। সাধারণত বীজ দিয়ে এদের বংশবিস্তার হয়। যেমন আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি। সপুষ্পক উদ্ভিদকে আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন

(ক) নগ্নবীজী উদ্ভিদ ও (খ) আবৃতবীজী উদ্ভিদ;

(ক) নগ্নবীজী উদ্ভিদ

যে সকল উদ্ভিদের পুষ্পে গর্ভাশয় নেই বিধায় ফল হয় না এবং বীজ নগ্ন বা উন্মুক্ত থাকে সেসব উদ্ভিদকে নগ্নবীজী উদ্ভিদ বলে। যেমন পাইনাস, সাইকাস ইত্যাদি।

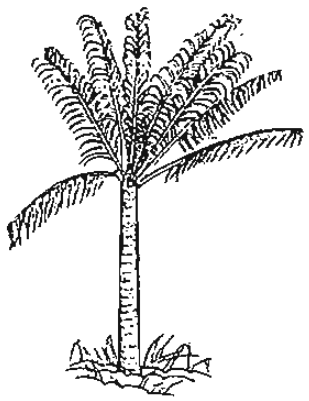

চিত্র : ৮.৭ নগ্নবীজী উদ্ভিদ (সাইকাস)

(খ) আবৃতবীজী উদ্ভিদ

যে সকল সপুষ্পক উদ্ভিদে ফল হয় এবং বীজ ফলের ভেতর আবৃত থাকে সেগুলোকে আবৃতবীজী উদ্ভিদ বলে। যেমন আম, জাম, লিচু, পেয়ারা ইত্যাদি। আবৃতবীজী উদ্ভিদকে আবার বীজের বীজপত্রের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন (১) একবীজপত্রী উদ্ভিদ এবং (২) দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ

(১) একবীজপত্রী উদ্ভিদ

যে সব উদ্ভিদের বীজে মাত্র একটি বীজপত্র থাকে তাদের একবীজপত্রী উদ্ভিদ বলে। যেমন ধান, আঁখ, গম, ভুট্টা, নারিকেল ইত্যাদি। একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড নলের

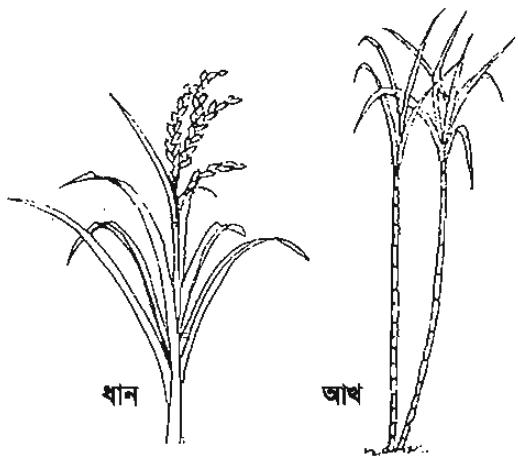

চিত্র : ৮.৮ একবীজীপাত্রী উদ্ভিদ

মত ও ফাঁপা, শিরাবিন্যাস সমান্তরাল ও গর্ভমুণ্ড পালকের ন্যায়। একবীজপত্রী উদ্ভিদ থেকে খাদ্য, চিনি, সুগন্ধ ও অ্যান্টিসেপটিক ওষুধ তৈরি করা হয়।

(২) দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ

যে সকল উদ্ভিদের বীজে দুইটি বীজপত্র থাকে তাদের দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ বলা হয়। যেমন সরিষা, মটর, ছোলা, তিল, চিনাবাদাম, পাট, তেঁতুল, আম, জাম ইত্যাদি। ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, মুলা, শালগম ইত্যাদি উৎকৃষ্ট সবজি। ডাল জাতীয় শস্য এর অন্তর্ভুক্ত।

চিত্র : ৮.৯ দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ

উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাসের ছক

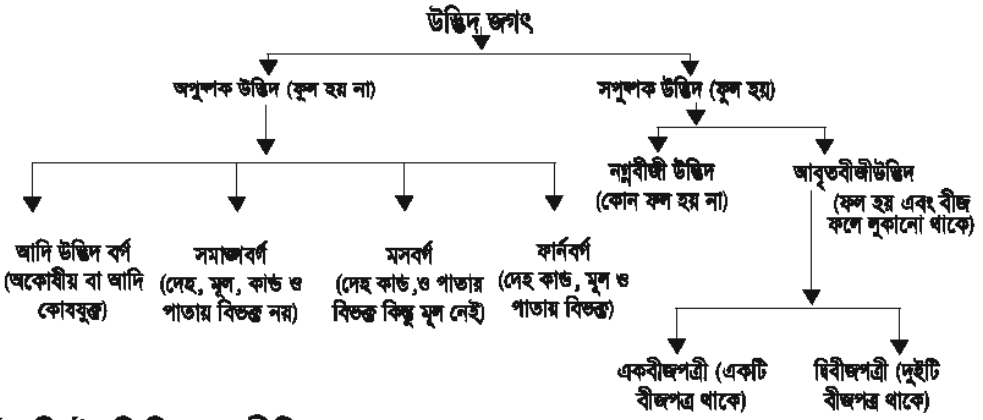

কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

আম, কাঁঠাল ইত্যাদি গাছের শাখা কেমন শক্ত তাই না? কারণ এদের কাণ্ড ও শাখার মধ্যে কাঠ রয়েছে। কিন্তু লাউ বা পুঁই এর ডগা কি শক্ত? নয় কেন? কারণ এর মধ্যে কোনো কাষ্ঠল অংশ নেই। আম, কাঁঠাল গাছের গুড়ি কেমন মোটা হয়ে মাটি থেকে উপরে উঠে যায় এবং শাখা প্রশাখা বহন করে। একে প্রধান কাণ্ড বলে। কিন্তু গোলাপ, রজ্জান, লেবু, ইত্যাদি গাছে কি এরূপ প্রধান কাণ্ড দেখা যায়?

বিজ্ঞানীগণ কাণ্ডের এ সকল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উদ্ভিদ জগতকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা (১) বীরুৎ, (Herbs) (২) গুল্ম (Shrubs) এবং (৩) বৃক্ষ (Trees)

১। **বীরুৎ :** যে সকল উদ্ভিদ আকারে ছোট এবং নরম কাণ্ডযুক্ত তারাই বীরুৎ। যেমন ছোলা, সরিষা, মূলা ইত্যাদি।

২। **গুল্ম :** এরা মধ্যম আকারের উদ্ভিদ। এদের শাখা প্রশাখা প্রধান কাণ্ডের মাটির কাছাকাছি স্থান থেকে শুরু হয়। এজন্য প্রধান কাণ্ডটিকে আলাদা ভাবে শনাক্ত করা যায় না। কাণ্ড সব সময় কাঠযুক্ত হয় তাই এরা শক্ত। গোলাপ, রজ্জান, লেবু ইত্যাদি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ।

৩। **বৃক্ষ :** এ ধরনের উদ্ভিদ মধ্যম থেকে বৃহৎ আকারের হয়ে থাকে। এদের প্রধান কাণ্ডটি খুবই স্পষ্ট এবং কখনো মোটা হয়। প্রকাণ্ড মোটা প্রধান কাণ্ডটিকে গাছের গুড়ি বলে। বৃক্ষের সুস্পষ্ট প্রধান কাণ্ডের শীর্ষে শাখা প্রশাখা দেখা যায়। যেমন আম, কাঁঠাল, সেগুন, মেহগনি ইত্যাদি।

তোমাদের পরিবেশ থেকে চেনা কিছু উদ্ভিদের নাম তোমার নোট বইতে লিখে নাও। এবার এদের কাণ্ড পরীক্ষা করে দেখ তো বৃক্ষ, গুল্ম ও বীরুৎ এই তিন ভাগে এদের আলাদা করতে পার কি না।

চিত্র : ৮.১০ একটি বীরুৎ

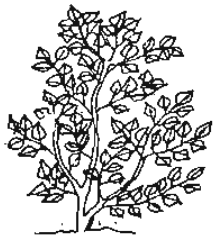

চিত্র : ৮.১১ একটি গুল্ম

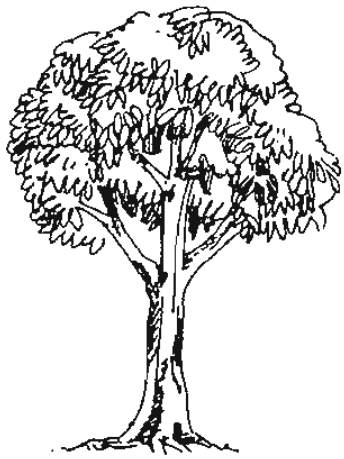

চিত্র : ৮.১২ একটি বৃক্ষ

উদ্ভিদের জীবনকাল ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

তোমরা দেখে থাকবে কোনো কোনো উদ্ভিদ খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে বীজ ধারণ করে এবং অল্প দিনের মধ্যেই মরে যায়। আবার কোনো কোনো উদ্ভিদ অনেক বৎসর ধরে বেঁচে থাকে। বিজ্ঞানীগণ জীবনকালের ওপর ভিত্তি করে উদ্ভিদকে (১) একবর্ষজীবী (Annual) (২) দ্বিবর্ষজীবী (Biennial) (৩) বহুবর্ষজীবী (Perinnial) হিসেবে ভাগ করেছেন।

(১) **একবর্ষজীবী উদ্ভিদ :** যে সকল উদ্ভিদ এক ঋতু বা এক বৎসর বেঁচে থাকে তাদের একবর্ষজীবী উদ্ভিদ বলে। যেমন ছোলা, মটর সরিষা ইত্যাদি।

(২) **দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ :** এ সকল উদ্ভিদ দুই বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। শীত প্রধান দেশে মূলা, ফুলকপি ইত্যাদি দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ।

(৩) **বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ :** এসব উদ্ভিদ দুই এর অধিক বছর বেঁচে থাকে। যেমন আদা, হলুদ, দুর্বাঘাস ইত্যাদি। এদের ভূনিম্নস্থ কাণ্ড থেকে প্রতি বছর বায়বীয় কাণ্ড বের হয়। আবার গুল্ম ও বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ সব সময়ই বহুবর্ষজীবী।

উদ্ভিদের পুষ্টিভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ

আমরা জেনেছি যে, উদ্ভিদ সাধারণত স্বভোজী। স্বভোজী অর্থ নিজের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেই তৈরি করতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু উদ্ভিদ আছে যারা খাদ্যের জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল। এরা পরভোজী উদ্ভিদ। দেহের পুষ্টিসাধনের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা (১) স্বভোজী ও (২) পরভোজী।

(১) স্বভোজী উদ্ভিদ : সাধারণত এ উদ্ভিদগুলো সবুজ হয়। কারণ এদের কোষে সবুজ কণিকা বা ক্লোরোফিল থাকে। উদ্ভিদ মাটি থেকে যে পানি এবং বাতাস থেকে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে আলোর উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সাহায্যে এগুলো থেকে স্বভোজী উদ্ভিদ শর্করা বা চিনি জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। এর কিছু তারা নিজের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। বাকী খাদ্য প্রাণী ও অন্যান্য পরভোজী উদ্ভিদের কাজে লাগে।

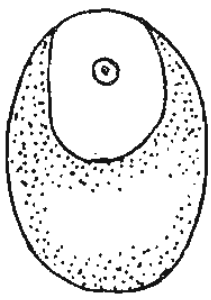

চিত্র : ৮.১৩ স্বভোজী এককোষী শৈবাল

(২) পরভোজী উদ্ভিদ : অসবুজ উদ্ভিদ নিজের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। তাই সে খাদ্যের জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল। এ সকল উদ্ভিদকে পরভোজী উদ্ভিদ বলে। এরা দুই ধরনের। যথা (ক) পরজীবী এবং (খ) মৃতজীবী।

(ক) পরজীবী উদ্ভিদ : এরা অসবুজ তাই খাদ্য তৈরি করতে পারে না। এসব উদ্ভিদ জীবিত উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহের ওপরে বা ভিতরে বাস করে। এরা আশ্রয় প্রদানকারী জীব দেহ থেকে নানা প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে। এদের দেহে খাদ্য দ্রব্য শোষণের জন্য কোনো কোনো সময় চোষক মূল থাকে, যেমন স্বর্ণলতা। কখনও বা এরা ঐসব আশ্রয় প্রদানকারী জীবের দেহে 'রোগ' সৃষ্টি করে থাকে। পাটের কাল পট্টি রোগ, আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ ও ধানের পাতা পোড়া রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী ছত্রাক পরজীবী উদ্ভিদ।

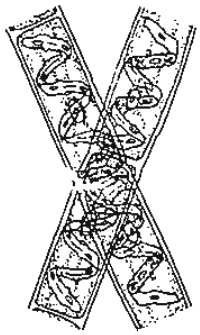

চিত্র: ৮.১৪ স্বতেজী বহুকেষী শৈবাল

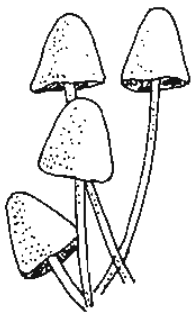

চিত্র: ৮.১৫ পরভোজী ছত্রাক

(খ) মৃতজীবী উদ্ভিদ : কোনো কোনো উদ্ভিদ আছে যেগুলো মৃত জীবদেহ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে। এরা মৃতজীবী উদ্ভিদ। পচা বা বাসি রুটির গায়ে সাদা গুঁড়ো গুঁড়ো ছাতা দেখেছ কখনও? এরা পরে কালো হয়ে যায়। এরা এক ধরনের ছত্রাক। মিউকর এরকম একটি ছত্রাক উদ্ভিদ।

মৃতজীবী উদ্ভিদ জীবজন্তুর মৃতদেহ পচিয়ে মাটিতে জৈব উপাদান হিসেবে মিশিয়ে আমাদের অনেক উপকার করে।

কয়েকটি মৃতজীবী উদ্ভিদ :

আমাদের কাছাকাছি বহু মৃতজীবী উদ্ভিদ রয়েছে। এগুলোকে প্রায়ই আমরা উদ্ভিদ বলে মনে করি না। ইস্ট, ব্যাঙের ছাতা, পেনিসিলিয়াম ইত্যাদি এ ধরনের উদ্ভিদ।

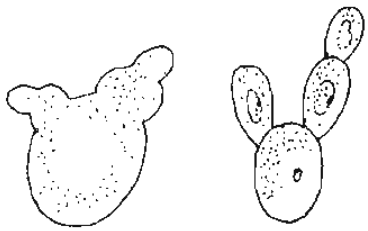

চিত্র: ৮.১৬ ইস্ট উদ্ভিদ

১। ইস্ট (Yeast)

পাউরুটি তৈরিতে ইস্ট ব্যবহার করা হয় এ খবর তোমরা অনেকে শুনে থাকবে। ইস্ট একটি ছত্রাক জাতীয় মৃতজীবী উদ্ভিদ। এরা প্রশ্বাসের সঙ্গে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করে দেয় তা পাউরুটিকে ফুলতে সাহায্যে করে। এরা চিনি থেকে মদ তৈরি করতে পারে। এদের দেহে প্রচুর ভিটামিন 'বি' থাকে তাই খাদ্য হিসেবে এদের খুব কদর। রুটি শিল্প, মদ প্রস্তুত ও ঔষধ শিল্পে এদের ব্যবহার করা হয়।

ইস্ট এককোষী উদ্ভিদ। কখনও এদের কোষগুলো লম্বালম্বি সজ্জিত হয়ে ফিতার ন্যায় হতে পারে। প্রতিটি ইস্ট কোষ থেকে কুঁড়ি সৃষ্টি হয় এবং কুঁড়িগুলো আলাদা হয়ে নতুন ইস্ট উদ্ভিদ গঠন করে। সরাসরি কোষ বিভাজনের মাধ্যমে এরা বংশ বিস্তার করতে পারে।

২। ব্যাঙের ছাতা

'ব্যাঙের ছাতা' একটি কথার কথা। ব্যাঙ কোনো ছাতা ব্যবহার করে না। 'ব্যাঙের ছাতা' বললে তোমরা সাদা নরম কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাতার ন্যায় বস্তুর কথা মনে করতে পার তাই না? বর্ষাকালে বাগানে পচা পাতার মধ্যে অথবা খড়ের গাদায় এদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। এদের ইংরেজিতে 'মাশরুম' বলে। আজকাল এর চাষ হয়। অনেকে শখ করে 'মাশরুম' খেয়ে থাকেন। তোমরা কিন্তু ঝোপঝাড় থেকে 'মাশরুম' তুলে খাবে না। কিছু কিছু 'মাশরুম' খুবই বিষাক্ত। এরা এক ধরনের ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ।

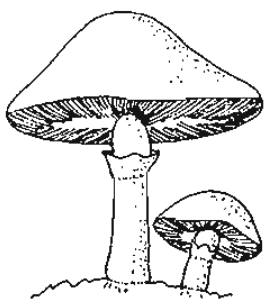

চিত্র: ৮.১৭ ব্যাঙের ছাতা

ছাতার ন্যায় মাংসল যে অংশ আমরা খালি চোখে দেখি এটি ওর 'ফ্রুটবডি'। এর মধ্যে গুঁড়ো গুঁড়ো অণুবীজ বা স্পোর থাকে। এদের দেহ সাদা সুতার মত। এদের আলাদাভাবে

দেখতে অণুবীক্ষন যন্ত্র লাগে। এই সুতার ন্যায় অংশ মাটির তলায় থাকে। কিন্তু 'ফ্রুটবডি' মাটির উপরেই সৃষ্টি হয়। আমরা তাই ছাতার ন্যায় 'ফ্রুটবডি'কেই শুধু দেখতে পাই।

৩। পেনিসিলিয়াম (Penicillium)

'পেনিসিলিন' ওষুধ তোমরা অনেকেই খেয়েছ। সর্দি কাশি বা গলা ব্যথা হলে অনেকে পেনিসিলিন লজেন্স বা ট্যাবলেট খায়। এটি সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত 'অ্যান্টি–বায়োটিক' ওষুধ। আলেকজান্ডার ফ্লেমিং 'পেনিসিলিয়াম' নামক ছত্রাক থেকে এ ওষুধ আবিষ্কার করেন। এর সাহায্যে নীল পনির তৈরি হয়।

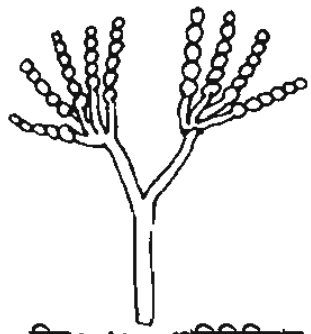

চিত্র ৮.১৮ : পেনিসিলিয়াম

পেনসিলিয়াম একটি মৃতজীবী ছত্রাক। এদের অণুবীজ সব সময় বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। এদের মাটিতেও পাওয়া যায়। লেবু জাতীয় ফল, সবজি ও খাবারের ওপরে এদের জন্মাতে দেখা যায়। এক খণ্ড লেবু কেটে অন্ধকারে কয়েকদিন রেখে দিলে সবুজ বা নীল দাগ দেখা যাবে। এরা পেনিসিলিয়াম উদ্ভিদ। নানাভাবে মানুষের উপকার করলেও এরা মানুষের দেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

অর্থকরী উদ্ভিদের রোগ

পরজীবী উদ্ভিদ রোগ সৃষ্টি করে এ কথা আমরা জেনেছি। এবার এ ধরনের কয়েকটি রোগ সম্পর্কে জানব।

(ক) পাটের কাল পট্টি রোগ :

এ রোগ হলে পাট গাছের গোড়ায় অর্থাৎ মাটির সামান্য উপরে কান্ডের গায়ে কাল দাগ পড়ে। ধীরে ধীরে এ দাগ বৃদ্ধি পেয়ে কান্ডটিকে ঘিরে ফেলে। হাত লাগালে কাল দাগ পড়ে। এ রোগের শেষ পর্যায়ে গাছটি ভেঙে পড়ে।

এক ধরনের পরজীবী ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। এ ছত্রাকের অণুবীজগুলো অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে গাঢ় বাদামী দেখায়। দেখতে উপবৃত্তাকার ও দুটো কোষযুক্ত মনে হয়। এ রোগ হলে খেতে উপযুক্ত ছত্রাকবারক বা 'ফানজিসাইড' ছিটাতে হয়। ছত্রাকবারক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যা ছত্রাক ধ্বংস করে। তবে রোগ যাতে না হয় তার জন্য 'রোগমুক্ত' বীজ ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া আক্রান্ত আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে এ রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

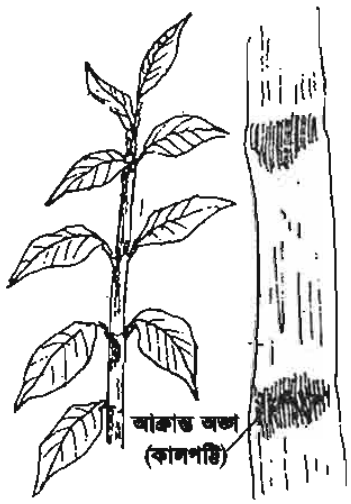

চিত্র : ৮.১৯ পাটের কালপট্রি রোগ

(খ) ধানের পাতা পোড়া রোগ : ধান খেতে হাঁটতে হাঁটতে হয়তো লক্ষ করে থাকবে যে পাতার গায়ে ছোট ছোট বাদামী বা হলুদ দাগ হয়ে আছে। দাগগুলোর মাঝখানটা চওড়া এবং দু মাথা সরু। পরে ধীরে ধীরে দাগের মাঝখানটা সাদাটে হয়ে যায়। ধানের শীষের গোড়া আক্রান্ত হলে তা ভেঙে পড়ে। এ রোগ এক ধরনের পরজীবী ছত্রাক এর আক্রমণে হয়ে থাকে। 'বোর্দো মিকচার' ছিটিয়ে রোগ দমন করা যায়।

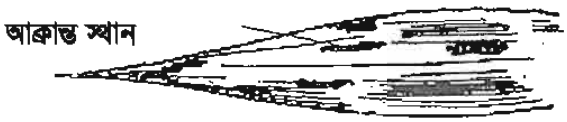

চিত্র ৮.২০ : ধানের পাতাপোড়া রোগ

এছাড়া আগাছা দমন ও আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে এ রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

(গ) আখের লাল পচা রোগ : আখ খাওয়ার সময় অনেকে লক্ষ করে থাকবে যে আখের ভেতর লম্বালম্বি লাল একটি

দাগ। ছত্রাকের আক্রমণে এ ধরনের দাগ হতে পারে। কান্ড ও পাতায় এ রোগের আক্রমণ হয়। আক্রান্ত কান্ডটিকে লম্বাভাবে চিরে ফেললে মাঝ বরাবর লম্বা লাল রঙের দাগ দেখা যায়। কান্ডে গিঁটের কাছে কুঁচকানো ভাব হয়। পাতার কিনারা ও আগা শুকিয়ে যায়।

এক ধরনের পরজীবী ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। এ ছত্রাকের অণুবীজগুলো বাঁকা ও স্বচ্ছ। তোমরা জান আখ গাছের ডগা কেটে মাটিতে পুঁতলেই গাছ হয়। এই ডগা রোপণের আগেই 'ছত্রাকবারকে' চুবিয়ে নিলে এ রোগের আক্রমণ কম হয়। এছাড়া আগের বছরের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে ও রোগ প্রতিরোধে সক্ষম জাতের উদ্ভিদ বাছাই করে লাগালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

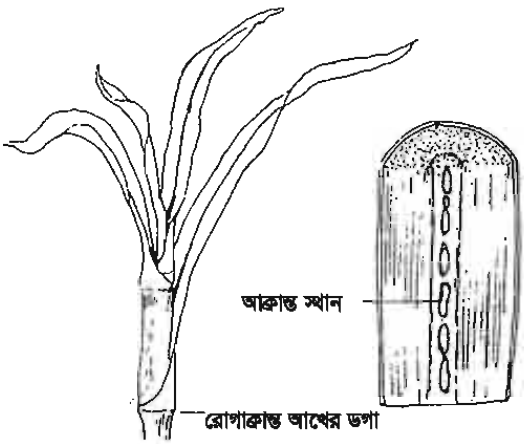

চিত্র ৮.২১: আখের লাল পচা রোগ

(ঘ) আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ : এটি আলুর খুব মারাত্মক রোগ। এর কারণে আয়ারল্যান্ডে একবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। এ রোগে আক্রান্ত গাছের পাতা ও কান্ডে বাদামী বা লালচে কাল দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে গাছের সকল পাতা ও শাখা প্রশাখা আক্রান্ত হয়। এ সময়ে গাছ ঢলে পড়ে। তীব্র আক্রমণের সময় সমগ্র খেত থেকে একটি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত গাছের আলুর গায়ে বাদামী দাগ পড়ে। এক ধরনের পরজীবী ছত্রাক এ রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। উপযুক্ত 'ছত্রাকবারক' ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যায়। সুস্থ বীজের ব্যবহার ও আগে ফলন হয় এমন জাতের চাষ করে এ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

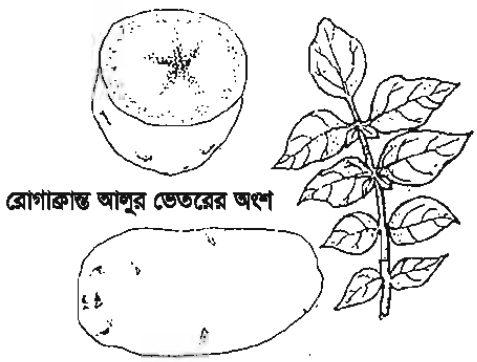

চিত্র ৮.২২: আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ

এ অধ্যায়ের নতুন শব্দসমূহ

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, ছত্রাক, নগ্নবীজী, আবৃতবীজী, একবীজপত্রী, দ্বিবীজপত্রী, স্বভোজী, পরভোজী, সমাঙ্গাবর্গ, মসবর্গ, ফার্নবর্গ, বীরুৎ, গুল্ম, বৃক্ষ, পেনিসিলিন, ক্লোরোফিল।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. অপুষ্পক উদ্ভিদ কয়টি ভাগে বিভক্ত ?
ক. ২টি খ. ৪টি
গ. ৩টি ঘ. ৫টি

২. মসবর্গ উদ্ভিদে নিচের কোনটি নেই ?
ক. কান্ড খ. মুল
গ. পাতা ঘ. শিরা

৩. বহু বর্ষজীবী উদ্ভিদ হল
ক. আদা খ. গাজর
গ. মটর ঘ. সরিষা

৪. মৃতজীবী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

i. পেনিসিলিয়াম
ii. পাটের কাল পট্টি রোগ
iii. নীল পনির

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. উপরের কোনটি নয়

নিচের চিত্র থেকে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

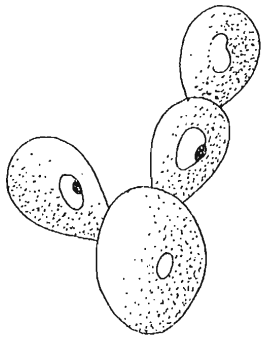

চিত্র

৫. চিত্রের উদ্ভিদটি কোন ধরনের ?

i. মৃতজীবী
ii. পরভোজী
iii. স্বভোজী

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৬. চিত্রের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

i. এদের দেহে ভিটামিন বি আছে
ii. এর সাহায্যে নীল পনির তৈরি হয়
iii. রুটি শিল্পে ব্যবহৃত হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

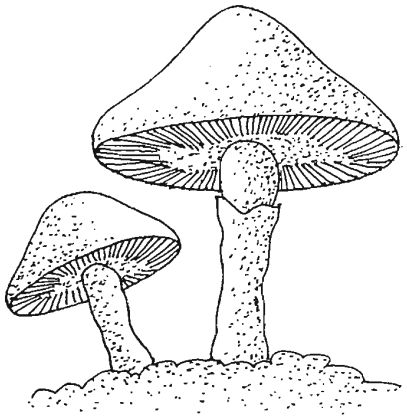

চিত্র : ১

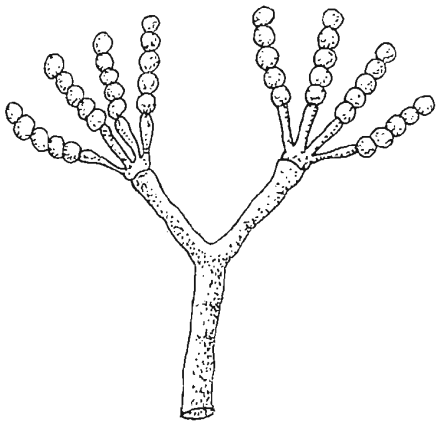

চিত্র : ২

ক. চিত্রের উদ্ভিদ দুইটি কী ধরনের ?
খ. এই ধরনের উদ্ভিদের প্রধান ২টি বৈশিষ্ট্য লিখ।
গ. ১নং চিত্রের উদ্ভিদের চাষের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ২নং চিত্রের উদ্ভিদ 'যেমন উপকারি তেমন অপকারিও যুক্তি দাও ?

২.

চিত্র ১

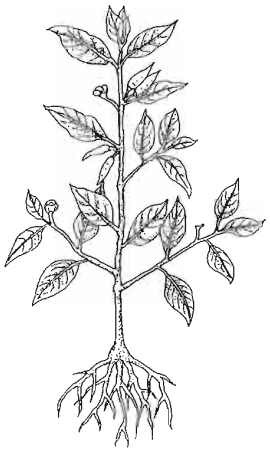

চিত্র ২

ক. ১নং চিত্রের উদ্ভিদটি কোন বর্গের ?
খ. এদের কান্ড নরম কেন ?
গ. উপরের কোন উদ্ভিদটিকে দ্বিবীজপত্রী, একবর্ষজীবী ও বীরৎ উদ্ভিদ বলা হয় ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উপরের উদ্ভিদ দুইটির বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা কর।

নবম অধ্যায়

উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান

একটি সপুষ্পক উদ্ভিদ

আমাদের চারপাশের পরিবেশে অগণিত উদ্ভিদ আমরা দেখতে পাই। এসব উদ্ভিদের আকার ও গঠনে যথেষ্ট বৈচিত্র লক্ষ করা যায়। যেমন কোনো কোনো উদ্ভিদের দেহে মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল কিছুই নেই এদেরকে আমরা অপুষ্পক উদ্ভিদ বলে থাকি। যেমন ব্যাঙের ছাতা, শেওলা, মস, ফার্ন ইত্যাদি। আবার কিছু উদ্ভিদের দেহে মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল, বীজ হয় এদেরকে সপুষ্পক উদ্ভিদ বলে থাকি। যেমন ধান, গম, আম, জাম, সরিষা ইত্যাদি। ইতঃপূর্বে আমরা অপুষ্পক ও সপুষ্পক উদ্ভিদ সম্বন্ধে জেনেছি। কিন্তু আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদ কী তা এখন আমরা জানব।

একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ

একটি আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদকে মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল প্রভৃতি অংশে বিভক্ত করা চলে। একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের প্রতিনিধিস্বরূপ এখানে মরিচ গাছের বিভিন্ন অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল। একটি মরিচ গাছ প্রধান দুইটি অংশে বিভক্ত থাকে, যথা মূল অংশ এবং বিটপ অংশ।

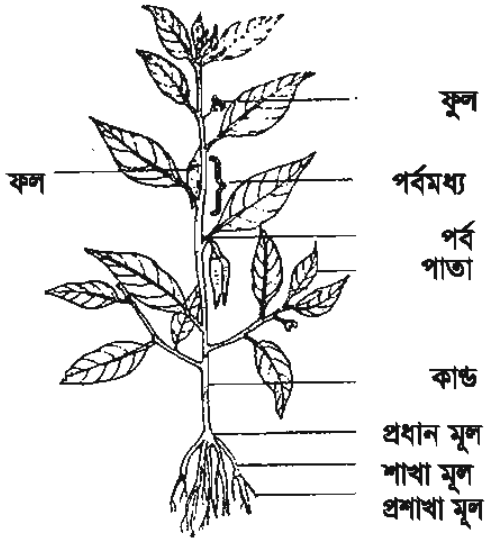

চিত্র ৯.১ : একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ (মরিচ গাছ)

মূল

মরিচ গাছের মাটির নিচের অংশকেই মূল বলে। এর মধ্যে যে অংশটি মোটা এবং সরাসরি কাণ্ডের সঙ্গে লাগানো থাকে তাকে প্রধান মূল বলে। প্রধান মূল থেকে শাখা মূল এবং শাখামূল থেকে প্রশাখা মূল উৎপন্ন হয়। মূলের আগায় টুপির মত আবরণকে মূলত্র বলে।

বিটপ

উদ্ভিদের যে অংশ মাটির উপরে থাকে তাকে বিটপ বলে। বিটপে কাণ্ড, শাখা প্রশাখা, পাতা, ফুল, ফল ও বীজ থাকে। মরিচ গাছের পাতার কক্ষে একটি করে ফুল ফোটে। ফুলে বৃতি, দল, পুংকেশর ও গর্ভকেশর থাকে।

মূল

উদ্ভিদের যে অংশ পর্ব, পর্বমধ্য ও অগ্রমুকুলবিহীন তাকেই মূল বলে। সাধারণত ভ্রূণমূল হতে মূল উৎপন্ন হয়। মূল পাতা, ফুল, ফল ধারণ করে না। সাধারণত মূল নিম্নগামী। তবে উদ্ভিদের মাটির নিচের অংশই মূল হতে হবে এমনটি নয়। বটের ঝুরি ও রাস্নার মূল মাটির উপর থাকে। আবার আদা, হলুদ, পিঁয়াজ প্রভৃতি পরিবর্তিত কাণ্ড মাটির নিচে বাড়তে থাকে। ভ্রূণমূল বেড়ে যে মূল গঠন করে তাকে প্রধানমূল বলে। প্রধানমূল থেকে শাখা মূল এবং শাখামূল থেকে প্রশাখামূল উৎপন্ন হয়।

মূলকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায়। মূলের অগ্রভাগে টুপির মত একটি আবরণ থাকে তাকে মূলটুপি বা মূলত্র বলে। মূলত্র মূলের নরম ডগাকে শক্ত মাটির আঘাত থেকে রক্ষা করে। এর পেছনের মসৃণ অংশকে বর্ধিষ্ণু এলাকা বলে। এ স্থানে মূলের বৃদ্ধি ঘটে। এ এলাকার পেছনে সূক্ষ্ম লোমশ এলাকাকে মূলরোম এলাকা বলে। এ এলাকার উপরে মূলের স্থায়ী এলাকা অবস্থিত। স্থায়ী এলাকা থেকে মূলের শাখা প্রশাখা সৃষ্টি হয়।

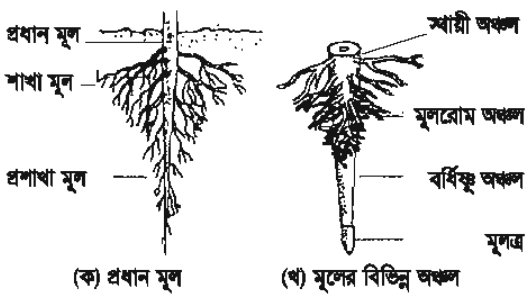

চিত্র : ৯.২ মূলের বিভিন্ন অংশ

মূলের শ্রেণীবিভাগ

আমাদের চারপাশে নানা ধরনের গাছ রয়েছে। এসব গাছের এক একটি মূল এক এক রকম। সে কারণে মূলের উৎপত্তি ও অবস্থান অনুসারে একে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন (১) স্থানিক মূল (২) অস্থানিক মূল।

১। স্থানিক মূল : যে মূল বীজের ভ্রূণমূল থেকে উৎপন্ন হয়ে সরাসরি মাটির ভেতরে প্রবেশ করে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে তাকে স্থানিক মূল বা সাধারণ মূল কিংবা প্রধানমূল বলে। যেমন পালং, পুঁই, ছোলা, মটর, আম, নিম প্রভৃতি। দ্বিবীজপত্রী গাছের মূল হল প্রধানমূল বা স্থানিক মূল।

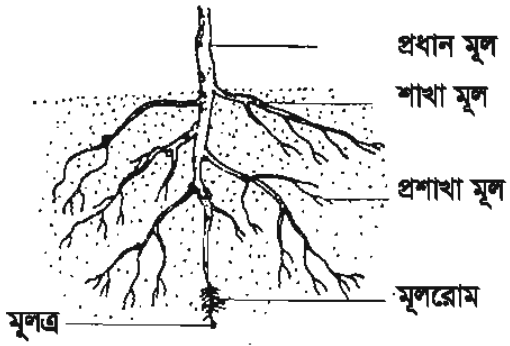

চিত্র ৯.৩: স্থানিক মূল

২। অস্থানিক মূল : যে মূল ভ্রূণমূল থেকে উৎপন্ন না হয়ে কাণ্ড, পাতা বা অন্য কোন অংশ থেকে উৎপন্ন হয় তাকে অস্থানিকমূল বলে। এ অস্থানিক মূলকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন (ক) গুচ্ছ মূল (খ) অগুচ্ছ মূল।

(ক) গুচ্ছ মূল : কোনো কোনো উদ্ভিদের কাণ্ডের গোড়ায় প্রধান মূলের পরিবর্তে একগোছা সরু সরু মূল উৎপন্ন হয় তাকে গুচ্ছ মূল বলে। যেমন ধান গাছের মূল। গুচ্ছ মূল একবীজপত্রী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য।

(খ) অগুচ্ছ মূল : পরস্পর বিচ্ছিন্ন অস্থানিক মূলকে অগুচ্ছ মূল বলে। যেমন কেয়া গাছের ঠেস মূল এবং পাথরকুচি পাতার মূল।

চিত্র ৯.৪: গুচ্ছমূল – (ধান গাছ)

চিত্র ৯.৫: অগুচ্ছমূল – (কেয়া গাছ)

বিভিন্ন ধরনের মূলতন্ত্র

উদ্ভিদের প্রধানমূল ও তার শাখা প্রশাখা মূলকে একত্রে মূলতন্ত্র বলে। মূলতন্ত্র সাধারণত দুই প্রকার। যেমন (১) স্থানিক মূলতন্ত্র এবং (২) অস্থানিক মূলতন্ত্র বা গুচ্ছ মূলতন্ত্র।

(১) স্থানিক মূলতন্ত্র বা প্রধান মূলতন্ত্র

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রধান মূল এবং এর শাখা প্রশাখা নিয়ে যে মূলতন্ত্র গঠিত হয় তাকে স্থানিক মূলতন্ত্র বলে। যেমন আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতিতে এই মূলতন্ত্র দেখা যায়।

(২) অস্থানিক মূলতন্ত্র বা গুচ্ছ মূলতন্ত্র

একবীজপত্রী উদ্ভিদের গুচ্ছ মূল নিয়ে গঠিত মূলতন্ত্রকে অস্থানিক মূলতন্ত্র বলে। যেমন ধান, গম, আখ প্রভৃতিতে গুচ্ছ মূলতন্ত্র দেখা যায়।

রূপান্তরিত মূল

বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য কখনও কখনও মূলের সাধারণ অবস্থার নানারকম পরিবর্তন হয় তাকে রূপান্তরিত

মূল বলে। স্থানিক ও অস্থানিক উভয় প্রকার মূলের নানারকম রূপান্তর ঘটে থাকে। এরূপ রূপান্তরের মাধ্যমে গাছ খাদ্য সঞ্চয়, যান্ত্রিক কাজ ও শ্বসন সম্পন্ন করে থাকে। এবার খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য প্রধান মূলের রূপান্তর সম্পর্কে আলোচনা করব।

মূলা, গাজর ও শালগম আমরা সবাই দেখেছি এবং খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকি। এগুলো মূল না কাণ্ড? একটু হিসেব মিলিয়ে নাও। এদের গায়ে কি কোনো 'গিট' বা সন্ধি আছে? পাতা আছে? মুকুল আছে? না নেই। উপরের দিকে যে পাতা দেখা যায় তা মূল অংশের উপরে অবস্থিত ক্ষুদ্র কাণ্ডের গা থেকে বের হয়েছে। মূলে গিট, পাতা ও মুকুল থাকে না। কিন্তু কেমন মোটা মাংসল ও রসালো তাই না? হ্যাঁ, কারণ এরা উদ্ভিদের ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে। প্রধান মূলটি খাদ্য সঞ্চয় করে মোটা হয় তাই এদের চেনা যায় না।

আকৃতিগত দিক থেকে রূপান্তরিত প্রধান মূল চার প্রকার। যথা ১। মূলাকৃতি ২। গাজরাকৃতি ৩। শালগমাকৃতি এবং ৪। কন্দাকৃতি মূল।

(১) **মূলাকৃতি মূল :** খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে প্রধান মূলের মাঝের অংশ মোটা এবং উপরের ও নিচের অংশ ক্রমশ চিকন হয়ে যদি মূলার আকার ধারণ করে তখন তাকে মূলাকৃতি মূল বলে। যেমন মূলা।

(২) **গাজরাকৃতি মূল :** কোনো প্রধান মূলের উপরের অংশ মোটা এবং নিচের অংশ ক্রমশ চিকন হয়ে যদি গাজরের আকার ধারণ করে তখন তাকে গাজরাকৃতি মূল বলে। যেমন গাজর।

(৩) **শালগমাকৃতি মূল :** খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে যদি কোনো কোনো প্রধান মূলের উপরের অংশ মোটা ও গোলাকার হয় এবং নিচের অংশ হঠাৎ করে চিকন হয়ে যায় তখন তাকে শালগমাকৃতি মূল বলে। যেমন শালগম ও বিট।

(৪) **কন্দাকৃতি মূল :** কোনো কোনো প্রধান মূল খাদ্য সঞ্চয় করে যদি মোটা হয় কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট আকার ধারণ না করে তখন তাকে কন্দাকৃতি মূল বলে। যেমন সন্ধ্যামালতি।

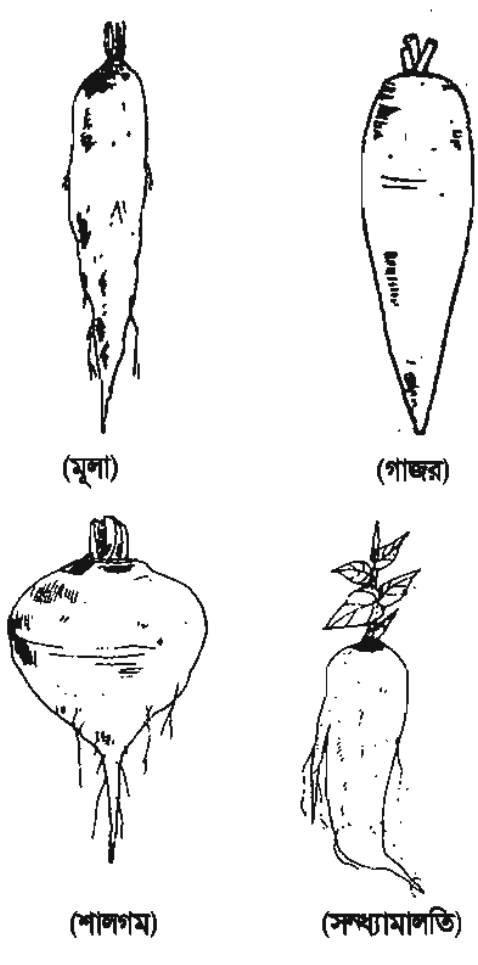

চিত্র ৯.৬: রূপান্তরিত প্রধান মূল

মূলের কাজ

একটি উদ্ভিদের মূল প্রধানত দুই ধরনের কাজ করে থাকে। যেমন

(ক) স্বাভাবিক কাজ

১। উদ্ভিদকে মাটি সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখা।
২। মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করা।
৩। শোষণকৃত পানি ও খনিজ লবণ কাণ্ডে পৌঁছে দেয়া।

(খ) বিশেষ কাজ

১। কাণ্ড ও শাখা–প্রশাখার ভার বহন করা। যেমন বটের স্তম্ভমূল।
২। গাছকে সোজাভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা। যেমন কেয়া গাছের ঠেসমূল।
৩। লতানো গাছকে আরোহণে সহায়তা করা। যেমন পানের আরোহীমূল।
৪। গাছের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা। যেমন মূলা ও গাজরের মূল।
৫। গাছকে ভাসতে সাহায্য করা। যেমন কেশর দামের ভাসমান মূল।
৬। বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করা। যেমন কাকরল ও পটলের জনন মূল।
৭। শ্বাস কার্যে সাহায্য করা। যেমন সুন্দরী গাছের শ্বাস মূল।

কাণ্ড

উদ্ভিদের যে অংশে শাখা, প্রশাখা, পাতা, মুকুল, ফুল, ফল ধারণ করে তাকে কাণ্ড বলে। উদ্ভিদের কাণ্ড, সাধারণত মাটির উপরে অবস্থান করে কিন্তু এমন কতকগুলো উদ্ভিদ আছে যাদের কাণ্ড মাটির নিচে থাকে। যেমন আদা, রসুন, ইত্যাদি।

কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ

আশপাশ থেকে যে কোনো একটি গাছের চারা নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখবে এতে পর্ব, পর্বমধ্য ও মুকুল রয়েছে।

(১) **পর্ব :** কাণ্ডের যে অংশ থেকে পাতা বের হয়, তাকে পর্ব বলে। একটি পরিণত কাণ্ডে পর্বগুলো প্রায় সমান দূরত্বে থাকে। এই পর্ব থেকে মুকুল, পাতা, ফুল ও ফল বের হয়।

(২) **পর্বমধ্য :** দুটি পর্বের মধ্যবর্তী অংশকে পর্বমধ্য বলে। পর্বমধ্য কাণ্ডকে খাড়া রাখে ও লম্বা হতে সহায়তা করে।

(৩) **মুকুল :** পাতার কক্ষ থেকে কুঁড়ি বা মুকুল বের হয়। কাণ্ড ও শাখা প্রশাখায় মুকুল থাকে। স্থান অনুসারে মুকুল দুই প্রকার। যেমন কাণ্ডের অগ্রভাগে অগ্রমুকুল ও পত্রকক্ষে কক্ষমুকুল থাকে।

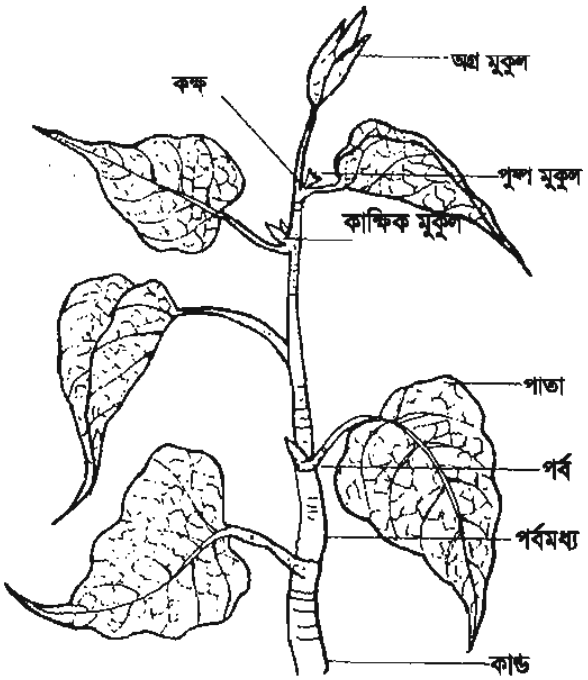

চিত্র ৯.৭: কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ

কাণ্ডের গঠন

আমাদের চারপাশের উদ্ভিদে নানা রকমের কাণ্ড দেখা যায়। কোনোটির কাণ্ড শক্ত ও মোটা, কোনোটির কাণ্ড নরম ও দুর্বল। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচুর কাণ্ড শক্ত ও মোটা। কিন্তু লাউ, কুমড়া, শশা, পুঁই, ঝিঙ্গা, তরমুজ প্রভৃতি গাছের কাণ্ড খুবই নরম। এছাড়া মাঝে মাঝে চতুষ্কোণ, ত্রিকোণ, চ্যাপ্টা এবং মসৃণ ও গোলাকার কাণ্ডের গাছ দেখা যায়। যেমন তুলসী, লাউ, শশা গাছের কাণ্ড চতুষ্কোণ, হোগলা, তাদালী গাছের কাণ্ড ত্রিকোণ, ফণিমনসা, শ্যামার কাণ্ড চেপ্টা, ইউক্যালিপটাসের কাণ্ড মসৃণ ও গোলাকার।

গঠন প্রকৃতি অনুসারে কাণ্ডকে প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা (১) সবল কাণ্ড এবং (২) দুর্বল কাণ্ড।

(১) **সবল কাণ্ড :** এই জাতীয় কাণ্ড বিশিষ্ট গাছকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন

- (ক) **অশাখ :** যে সকল গাছের কাণ্ডের শীর্ষে পাতার মুকুট থাকে কিন্তু শাখা–প্রশাখা থাকে না তাকে অশাখ কাণ্ড বলে। যেমন নারিকেল, তাল, সুপারি প্রভৃতি গাছ।
- (খ) **তৃণ কাণ্ড :** বাঁশ, আখ জাতীয় ফাঁপা বা নিরেট কঠিন কাণ্ডকে তৃণ কাণ্ড বলে।
- (গ) **মঠ আকৃতি :** যখন কোনো কাণ্ড বিশিষ্ট গাছ নিচে থেকে উপরের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে মঠের আকার ধারণ করে তখন তাকে মঠ আকৃতি কাণ্ড বলে। মেযন ঝাউ, দেবদারু গাছ ইত্যাদি।
- (ঘ) **গম্বুজ আকৃতি :** যে সকল কাণ্ড সরল, খাট কিন্তু শাখা প্রশাখা প্রসারিত হয়ে গম্বুজের আকার ধারণ করে তাকে গম্বুজ আকৃতি কাণ্ড বলে। যেমন আম, কাঁঠাল, বট, ইত্যাদি গাছ।

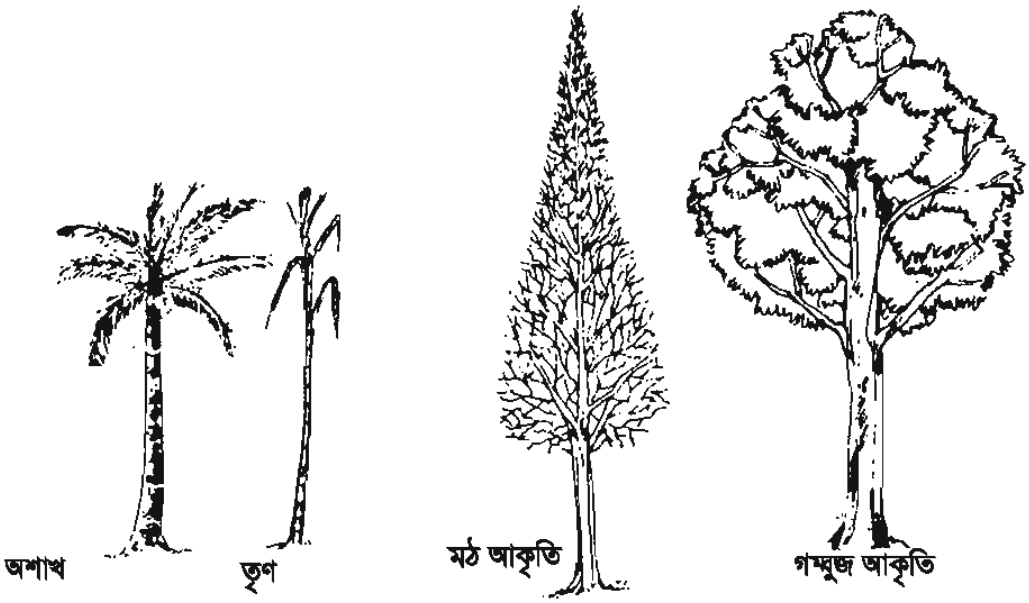

চিত্র ৯.৮ : সবল কাণ্ড

২। দুর্বল কাণ্ড : যে সকল গাছের কাণ্ড নরম এবং মাটিতে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না তাকে দুর্বল কাণ্ড বলে। দুর্বল কাণ্ড প্রধানত তিন প্রকার। যথা

(ক) লতান কাণ্ড : যে সকল দুর্বল কাণ্ড মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং পর্ব থেকে শিকড় ছাড়ে তাদেরকে লতান কাণ্ড বলে। যেমন দুর্বাঘাস।

(খ) শয়ান কাণ্ড : যে সকল দুর্বল কাণ্ড মাটির উপর ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু পর্ব থেকে শিকড় বের হয় না তাকে শয়ান কাণ্ড বলে। যেমন পুঁই শাক, ভুঁই আকড়া, মটরশুটি।

(গ) আরোহিনী কাণ্ড : যে সকল কাণ্ড কোনো অবলম্বনকে ঘিরে উপরের দিকে উঠতে থাকে তাকে আরোহিনী কাণ্ড বলে। যেমন শিম, পান, কুমড়া, বেত প্রভৃতি গাছ।

কাণ্ডের কাজ

১। কাণ্ড পাতা, ফুল ও ফল এবং শাখা–প্রশাখার ভার বহন করে।

২। কাণ্ড শাখা–প্রশাখা ও পাতাকে আলোর দিকে তুলে ধরে যাতে সূর্যের আলো পায় এবং চারদিকে প্রসারিত হয়।

৩। কাণ্ডের মধ্য দিয়ে মূল দ্বারা শোষিত পানি, খনিজ লবণ ইত্যাদি শাখা–প্রশাখায়, পাতায়, ফুলে এবং ফলে বাহিত হয়।

চিত্র ৯.৯ : দুর্বল কাণ্ড

৪। পাতায় তৈরি খাদ্য কাণ্ডের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

৫। কচি সবুজ কাণ্ড সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে কিছু খাদ্য তৈরি করে।

৬। কোনো কোনো গাছের কাণ্ড খাদ্য সঞ্চয় করে থাকে।

৭। কাণ্ড উদ্ভিদকে যান্ত্রিক শক্তি প্রদান করে।

৮। কাণ্ড খাদ্য সঞ্চয়, আত্মরক্ষা, আরোহণ, প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা এবং অঙ্গজ প্রজননে সহায়তা করে থাকে।

পাতা

কাণ্ড বা তার শাখা–প্রশাখার পর্ব থেকে পাশের দিকে পাতা বের হয়। পাতা সাধারণত চ্যাপ্টা ও সবুজ বর্ণের হয়। নিচের দিকের পাতা বড় এবং উপরের দিকের পাতা ছোট হয়। অর্থাৎ পাতা হল কাণ্ড বা তার শাখা–প্রশাখার পর্ব হতে উৎপন্ন চ্যাপ্টা ও প্রসারিত সবুজ অঙ্গ। শৈবাল, ছত্রাক প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতা নেই। মস জাতীয় কোনো কোনো উদ্ভিদে পাতার মত অঙ্গ দেখা গেলেও সেগুলো প্রকৃতপক্ষে পাতা নয়। সপুষ্পক উদ্ভিদের পাতা প্রকৃত পাতা।

একটি পাতার বিভিন্ন অংশ

যে পাতায় পত্রমূল, বৃন্ত ও ফলক এ তিনটি অংশ বর্তমান থাকে তাকে আদর্শ পাতা বলে। যেমন জবা পাতা, আম পাতা, জাম পাতা ইত্যাদি আদর্শ পাতা।

এবার আমরা একটি আম অথবা জবা পাতা নিয়ে পরীক্ষা করলেই এর তিনটি অংশ দেখতে পাব, যেমন (১) পত্রমূল (২) বোঁটা ও (৩) পত্রফলক।

(১) পত্রমূল : পাতার যে অংশ কাণ্ডের বা শাখা–প্রশাখার গায়ে সংযুক্ত থাকে তাকে পত্রমূল বলে। আম, জাম, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি গাছের পত্রমূল স্ফীত হয়। এরূপ পত্রমূলকে পালভিনাস পত্রমূল বলে। সুপারি, নারিকেল, খেজুর প্রভৃতি গাছের পত্রমূল কাণ্ডকে আংশিকভাবে বেষ্টন করে রাখে। এরূপ পত্রমূলকে কাণ্ডবেষ্টক পত্রমূল বলে। কোনো কোনো উদ্ভিদের পত্রমূলের পাশ থেকে পাতায় ন্যায় অংশ বের হয় তাকে উপপত্র বলে। যেমন মটর গাছে পত্রমূলের দুই পাশে এরূপ উপপত্র দেখা যায়।

(২) বোঁটা বা বৃন্ত : পত্রমূল ও পত্রফলকের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী অংশটিকে বোঁটা বা বৃন্ত বলে। যে পাতায় পত্রবৃন্ত থাকে তাকে সবৃন্তক পাতা বলে। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু পাতা ইত্যাদি। যে পাতায় বৃন্ত থাকে না তাকে অবৃন্তক পাতা বলে। যেমন রঙ্গন, শিয়ালকাঁটা, উলটচন্ডাল ইত্যাদির পাতা।

(৩) পত্রফলক : পাতার পাতলা, চ্যাপ্টা প্রসারিত অংশকে পত্রফলক বলে। পত্রফলকের গোড়ার দিকটি প্রসারিত এবং আগার দিক ক্রমশ সরু। ফলকের সরু অগ্রভাগকে পত্রাগ্র বলে। ফলকের দুই কিনারা বা প্রান্তকে পত্রপ্রান্ত বলে। ফলকের মাঝ বরাবর পাতার আগা পর্যন্ত বিস্তৃত বৃন্তের প্রসারিত অংশকে মধ্যশিরা বা প্রধান শিরা বলে। অশ্বত্থ গাছের মধ্যশিরা বলিষ্ঠ হয়। মধ্যশিরা বা প্রধান শিরার দুই পাশ থেকে উৎপন্ন শিরাকে শাখাশিরা এবং শাখাশিরা থেকে উৎপন্ন শিরাকে উপশিরা বলে। পাতার ফলকের আকৃতি নানারকম হয়ে থাকে। পত্রফলকের আকার অনুসারে পাতাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এখানে প্রধান কয়েকটি শ্রেণীর বর্ণনা দেওয়া হল। যেমন ঝাউয়ের পাতা সূচাকার। ধান, গম প্রভৃতির পাতা লম্বা অর্থাৎ রেখাকৃতি।

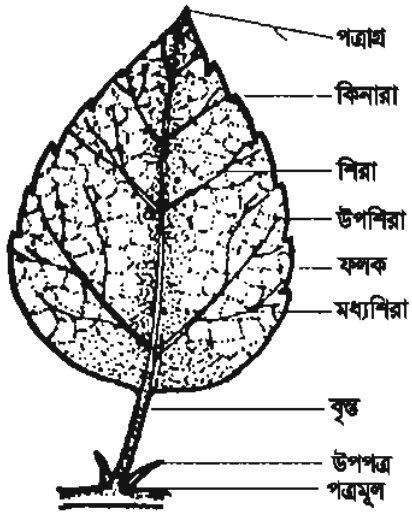

(জবা পাতা) চিত্র: ৯.১০ পাতার বিভিন্ন অংশ

বাঁশ, আম, দেবদারু প্রভৃতির পাতা বল্লমের ন্যায় তাই এসব পাতাকে বল্লমাকৃতি বলা হয়। অশ্বত্থ, পান পাতা হৃৎপিন্ডাকৃতির। পানিকচু, মানকচুর পাতা দেখতে তীরের ফলার মত। পদ্ম পাতা বৃত্তাকার অর্থাৎ বৃত্তের মত গোল। কুমড়া, লাউ প্রভৃতি গাছের পাতা হাঁসের পায়ের ন্যায় অর্থাৎ হংস পদাকৃতি।

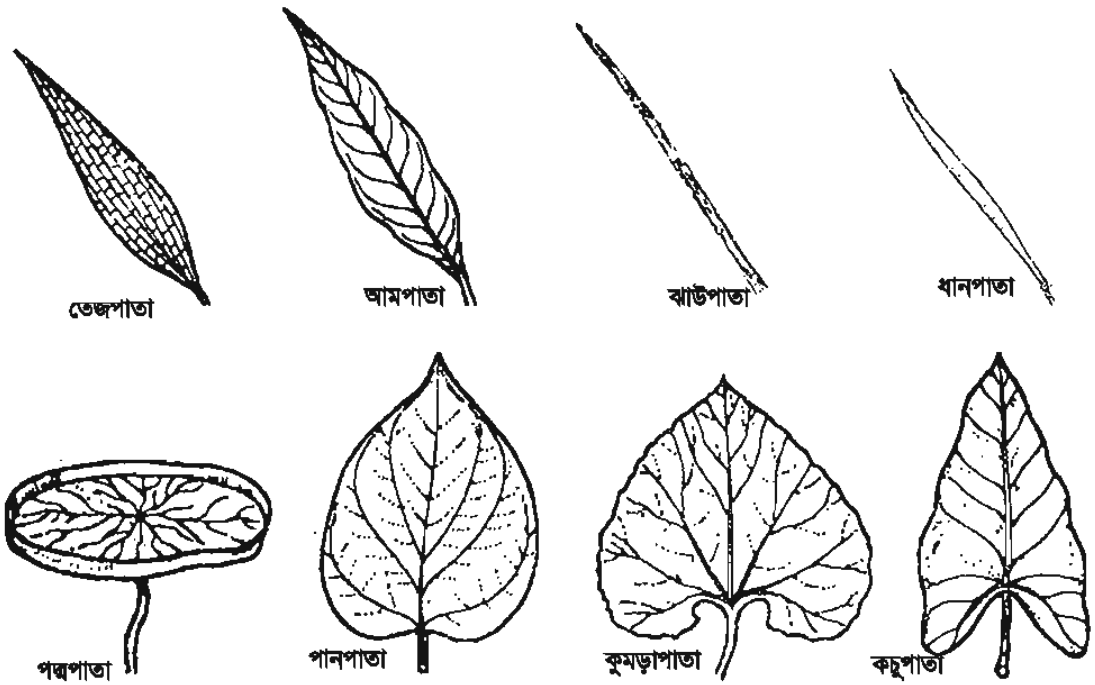

চিত্র : ৯.১১ পত্রফলকের আকৃতি

পাতার প্রকারভেদ

আমাদের আশেপাশের গাছপালায় নানা রঙের এবং নানা রকমের পাতা দেখা যায়। এসব পাতার কোনোটির কেবল একটি পত্রফলক থাকে, আবার কোনোটির পত্রফলক সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হয়ে দুই বা ততোধিক পত্রকে পরিণত হয়। পত্রফলক এবং পত্রকের উপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে পাতাকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন· (১) সরল পত্র এবং (২) যৌগিক পত্র।

(১) সরল পত্র : যে পাতায় বৃন্তের উপরে একটিমাত্র পত্র ফলক থাকে তাকে সরলপত্র বলে। যেমন· আম, জাম, কাঁঠাল, বট, করবী প্রভৃতি গাছের পাতা। সরল পত্রের কিনারা অখণ্ডিত বা আংশিকভাবে খণ্ডিত থাকতে পারে। পত্রের কিনারার এ খণ্ডনের গভীরতার ওপর ভিত্তি করে সরল পত্রকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা (ক) অখণ্ডিত সরল পত্র এবং (খ) খণ্ডিত সরল পত্র।

(ক) অখণ্ডিত সরল পত্র : যে সরল পাতার ফলকের কিনারা খণ্ডিত নয় তাকে অখণ্ডিত সরল পত্র বলে। যেমন· আম, কাঁঠাল, কদম, বট, জাম পাতা।

(খ) খণ্ডিত সরল পত্র : যে সরল পাতার ফলক আংশিক খণ্ডিত তবে খন্ডায়ন কখনও মধ্যশিরা পর্যন্ত পৌঁছায় না তাকে খণ্ডিত সরল পত্র বলে। যেমন· ঢেঁড়স, সরিষা, কচুপাতা প্রভৃতি।

(২) যৌগিক পত্র : একাধিক পত্রক দিয়ে গঠিত পাতাকে যৌগিক পত্র বলে। যেমন· গোলাপ, শুষনিশাক, বেল, শিমুল, ছাতিম প্রভৃতি গাছের পাতা। যৌগিক পত্রের প্রত্যেক পত্রককে অণুফলকও বলে। পত্রকগুলো যে দণ্ডের পাশে বা আগায় সজ্জিত থাকে তাকে র‍্যাকিস বা অক্ষ বলে।

পত্রকের বিন্যাস অনুযায়ী যৌগিক পত্রকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন (ক) পক্ষল যৌগিক পত্র এবং (খ) করতলাকার যৌগিক পত্র।

(ক) পক্ষল যৌগিক পত্র : যে যৌগিক পত্রের পত্রকগুলো র‍্যাকিস বা অক্ষের দুই পাশে সজ্জিত থাকে তাকে পক্ষল যৌগিক পত্র বলে। এরা আবার চার প্রকার। যেমন·

(১) এক পক্ষল যৌগিক পত্র : এদের র‍্যাকিস অশাখ হয় এবং পত্রকগুলো সরাসরি র‍্যাকিসের সাথে যুক্ত থাকে। এরা আবার দুধরনের হতে পারে। যথা· (অ) অচূড় পক্ষল ও (আ) সচূড় পক্ষল।

(অ) অচূড় পক্ষল যৌগিক পত্র : অচূড় পক্ষলে পত্রকগুলো জোড়া সংখ্যায় থাকে এবং চূড়ায় কোন পত্রফলক থাকে না। যেমন বাঁদরলাঠি।

(আ) সচূড় পক্ষল যৌগিক পত্র : সচূড় পক্ষলে পত্রকগুলো বেজোড় সংখ্যায় থাকে এবং র‍্যাকিসের চূড়ায় একটি পত্রক থাকে। যেমন গোলাপ, কামিনী প্রভৃতি।

(২) দ্বিপক্ষল যৌগিক পত্র : এখানে র‍্যাকিসের পাশ থেকে শাখা বের হয় এবং পত্রকগুলো শাখার দুপাশে সজ্জিত থাকে। যেমন লজ্জাবতী, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতা।

(৩) ত্রিপক্ষল যৌগিক পত্র : এখানে র‍্যাকিসের শাখা থেকে প্রশাখা বের হয় এবং প্রশাখার দুপাশে পত্রকগুলো সজ্জিত থাকে। যেমন নিম, সজিনা প্রভৃতি গাছের পাতা।

(৪) অতিপক্ষল যৌগিক পত্র : এখানে র‍্যাকিসটি তিনের বেশি বার শাখান্বিত হয় এবং সর্বশেষ প্রশাখায় পত্রকগুলো সজ্জিত থাকে। যেমন ধনে, মৌরি, গাজর প্রভৃতি গাছের পাতা।

(খ) করতলাকার যৌগিক পত্র : যে যৌগিক পত্রের পত্রকগুলো র‍্যাকিসের আগায় এমনভাবে সজ্জিত থাকে যাকে আঙুলসহ হাতের তালুর মত দেখায় তাকে করতলাকার যৌগিক পত্র বলে। যেমন

(১) দ্বি ফলক বা পত্রক সংখ্যা দুই। যেমন হিঞ্চাল, বাবলা পাতা।

(২) ত্রি ফলক বা পত্রক সংখ্যা তিন। যেমন আমরুল, বেল, সজিনা পাতা।

(৩) চতুর্ফলক বা পত্রক সংখ্যা চার। যেমন শুষনিপাতা।

(৪) বহু ফলক বা পত্রক সংখ্যা চারের বেশি। যেমন শিমুল, ছাতিম পাতা।

চিত্র ৯.১২ : সরল পত্র

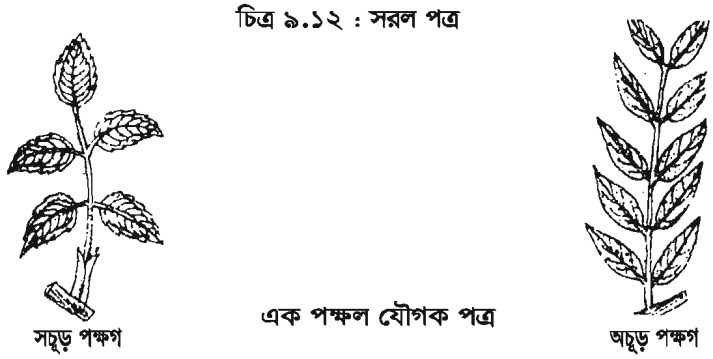

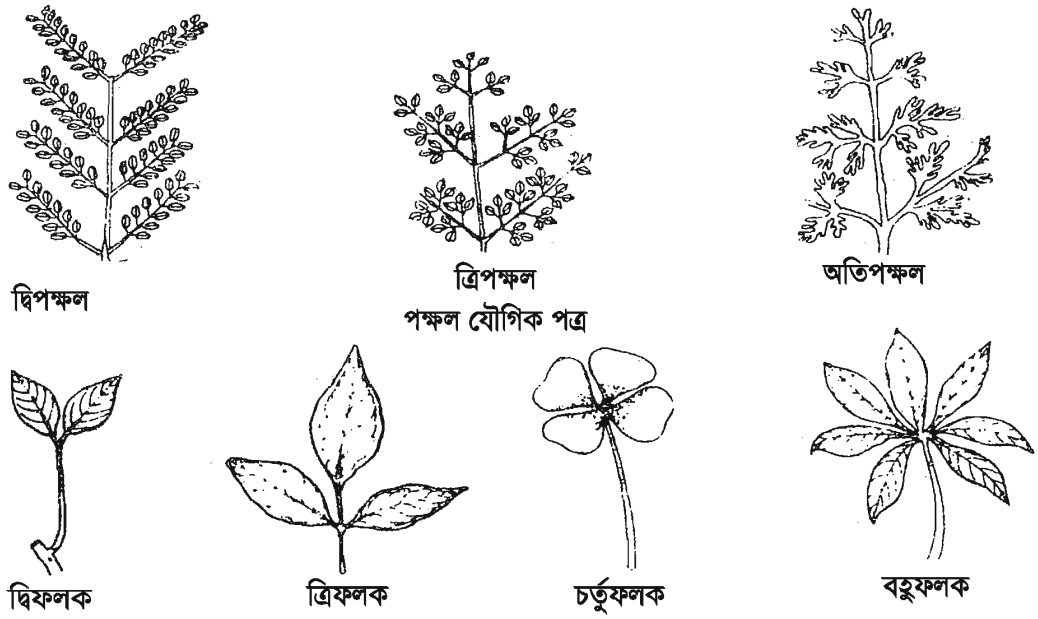

চিত্র ৯.১৩ : বিভিন্ন প্রকার যৌগিক পত্র

সরল ও যৌগিক পত্রের পার্থক্য

	সরলপত্র		যৌগিক পত্র
১।	সরলপত্র একটি মাত্র ফলক দিয়ে গঠিত।	১।	যৌগিক পত্র একাধিক পত্রক দিয়ে গঠিত।
২।	সরলপত্রের পত্রফলক খন্ডিত থাকলেও খন্ডগুলো সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা থাকে না।	২।	যৌগিক পত্রের পত্রকগুলো সম্পূর্ণভাবে পৃথক থাকে।
৩।	সরলপত্রে মধ্য শিরা থাকে।	৩।	যৌগিক পত্রে মধ্য শিরার পরিবর্তে অক্ষ থাকে।
৪।	সরল পত্রের পত্রমূলে উপপত্র থাকতে পারে।	৪।	যৌগিক পত্রের পত্রমূলে উপপত্র থাকতে পারে কিন্তু পত্রকের মূলে কোনো উপপত্র থাকে না।
৫।	সরল পত্রের কক্ষে মুকুল থাকে।	৫।	যৌগিক পত্রের কক্ষে মুকুল থাকে না।

পাতার কাজ

১। গাছের সবুজ পাতা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে গাছের জন্য শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে থাকে।
২। পাতার রন্ধ্র দিয়ে শ্বসনের সময় অক্সিজেন গ্যাস প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বের হয়। আবার সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ভেতরে প্রবেশ করে এবং অক্সিজেন বের হয়। অর্থাৎ পাতা গ্যাস আদান প্রদান করে থাকে।
৩। প্রস্বেদন পদ্ধতিতে পাতা বৃক্ষের অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের করে দিয়ে থাকে।
৪। পাতা পানি সঞ্চয় করে থাকে। যেমন পুঁই, নুনিয়া প্রভৃতি।
৫। রূপান্তরিত পাতা (আকর্ষী) গাছকে আরোহণে সাহায্য করে।
৬। পাতা গাছের বংশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যেমন পাথরকুচি পাতা।

মানব জীবনে উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতার প্রয়োজনীয়তা

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতার প্রয়োজন বহুবিধ। মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি সব কিছুই আমরা উদ্ভিদ থেকে পেয়ে থাকি। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের মধ্যে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ইত্যাদিও কিন্তু আমরা উদ্ভিদ থেকে পাই। কারণ গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, মাছ প্রভৃতি প্রাণী উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে। অর্থাৎ প্রাণী জগৎ সম্পূর্ণভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া মানব জীবনে উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতা

ইত্যাদির কতকগুলো সুনির্দিষ্ট কাজ রয়েছে সেগুলোকে পৃথক পৃথক ভাবে নিচে বর্ণনা করা হল :

(ক) উদ্ভিদের মূলের প্রয়োজনীয়তা

মানুষ প্রতিদিন নানা কাজে উদ্ভিদের মূল ব্যবহার করছে। মানুষ মিষ্টি আলু, মূলা, গাজর, শালগম, বিট, কাসাভা ইত্যাদির মূল খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করছে। শিমূল, থানকুনি, শতমূলী, সর্পগন্ধা ইত্যাদির মূল ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করছে। বাঁশ, বট, শিমূল, তেঁতুল, আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদির মূল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

(খ) কাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা

উদ্ভিদ ও গাছের কাণ্ড থেকে আমরা খাদ্য, কাঠ, ওষুধ, আঁশ, মশলা ইত্যাদি নিত্য দরকারি দ্রব্যাদি পেয়ে থাকি। আঁখ থেকে গুড়, চিনি ও জ্বালানি পাই। অর্জুন, সিনকোনা, কর্পুর ইত্যাদি গাছের কাণ্ড থেকে ওষুধ পাই। সেগুন, শাল, মেহগনি, আম, জাম, কাঁঠাল, শিমুল ইত্যাদি গাছ থেকে মূল্যবান কাঠ পেয়ে থাকি। বাঁশ, পাট, গেওয়া, গড়ান ইত্যাদি গাছের কাণ্ড দিয়ে কাগজ, পারটেক্স, দিয়াশলাই তৈরি করা হয়। তাছাড়া আঁশ, জ্বালানি, আঠা ইত্যাদি গাছের কাণ্ড থেকে পাওয়া যায়।

(গ) পাতার প্রয়োজনীয়তা

আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমরা উদ্ভিদের পাতা থেকে পেয়ে থাকি। ডাটা শাক, ঢেঁকি শাক, লাল শাক, পালং শাক, পুঁই শাক, বাঁধাকপি, লেটুস, ধনে পাতা, পুদিনা পাতা, কচু পাতা ইত্যাদি আমরা শাক হিসেবে ব্যবহার করি। বাসক, তুলসী, থানকুনি, গন্ধভাদুলি, বেলাডোনা ইত্যাদি পাতা থেকে ওষুধ পেয়ে থাকি। চা পাতা পানীয় হিসেবে ব্যবহার করি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. অবৃন্তক পাতা কোনটি ?

ক. শিয়াল কাঁটা খ. আম
গ. পদ্ম ঘ. কুমড়া

২. ঝাউগাছের কাণ্ডের আকৃতি হল ?

ক. অশাখ খ. তৃণকাণ্ড
গ মঠাকৃতি ঘ. গম্বুজ আকৃতি

৩. ভ্রূণমূল থেকে যে মূল উৎপন্ন হয় তাকে কী বলে ?

ক. অস্থানিক মূল খ. প্রধান মূল
গ. গুচ্ছমূল ঘ. সন্ধ্যামালতি

৪. কন্দাকৃতির মূল কোনটি ?

ক. মূলা খ. শালগম
গ. সন্ধ্যামালতি ঘ. বীট

৫. কাণ্ডের ক্ষেত্রে

i. সিনকোনা, অর্জুন থেকে ওষুধ পাওয়া যায়।
ii. গেওয়া, গড়ান থেকে মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়।
iii. জাম, কাঁঠাল থেকে পারটেক্স, দিয়াশলাই তৈরি করা যায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. i ও ii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্র থেকে ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

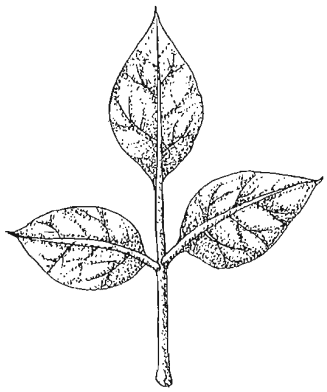

৬. চিত্রের পত্রটি হচ্ছে

ক. খণ্ডিত সরল পত্র　　খ. অখণ্ডিত সরল পত্র

গ. করতলাকার সরল পত্র　　ঘ. পক্ষল যৌগিক পত্র

৭. চিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

i. র‍্যাকিসের আগায় পত্রকগুলো সজ্জিত থাকে

ii. র‍্যাকিসের চূড়ায় একটি পত্র থাকে

iii. র‍্যাকিসের শাখায় দুইপাশে পত্রক সজ্জিত থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

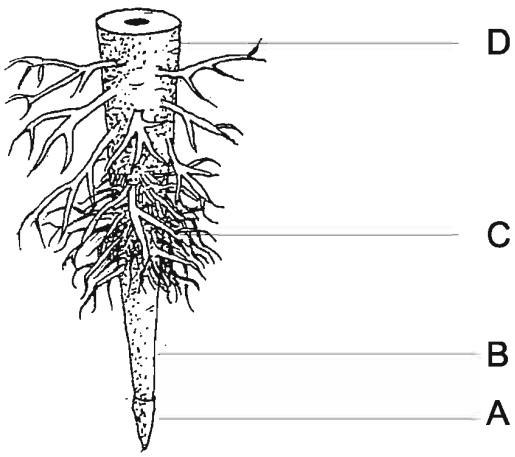

চিত্র :

ক. চিত্রের B অংশটির নাম কী ?
খ. C ও D অংশের মধ্যে ২টি পার্থক্য লিখ।
গ. B অংশটি ক্ষতিগ্রস্থ হলে উদ্ভিদে কী ঘটবে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. একটি চারাগাছের বৃদ্ধির জন্য A অংশের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

২।

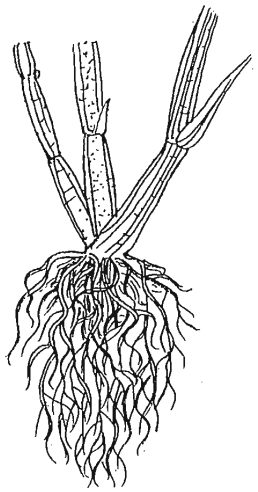

চিত্র : A

চিত্র :B

ক. মূল কাকে বলে?
খ. চিত্র 'A' এর মূলের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।
গ. চিত্র 'B' এর 'C' চিহ্নিত অংশ কেটে ফেললে কী ঘটবে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. চিত্র 'A' এবং চিত্র 'B' উদ্ভিদ দুইটির মধ্যে কোনটি মাটি থেকে বেশি পানি শোষণ করতে পারে? আলোচনা কর।

দশম অধ্যায়

বল, চাপ ও গতি

বল কী?

তোমার ঘরের দরজা খুলতে হলে তুমি কী কর? ধাক্কা অথবা টান দাও। একজন ঠেলাগাড়ি চালক গাড়ি চালাতে, হয় পেছন থেকে ধাক্কা দেয় অথবা সামনে থেকে টানে। আবার গাড়ি থামাতে হলে পেছন থেকে টানে অথবা সামনে থেকে পেছন দিকে ধাক্কা দেয়। এই ধাক্কা বা টানকে বল বলে।

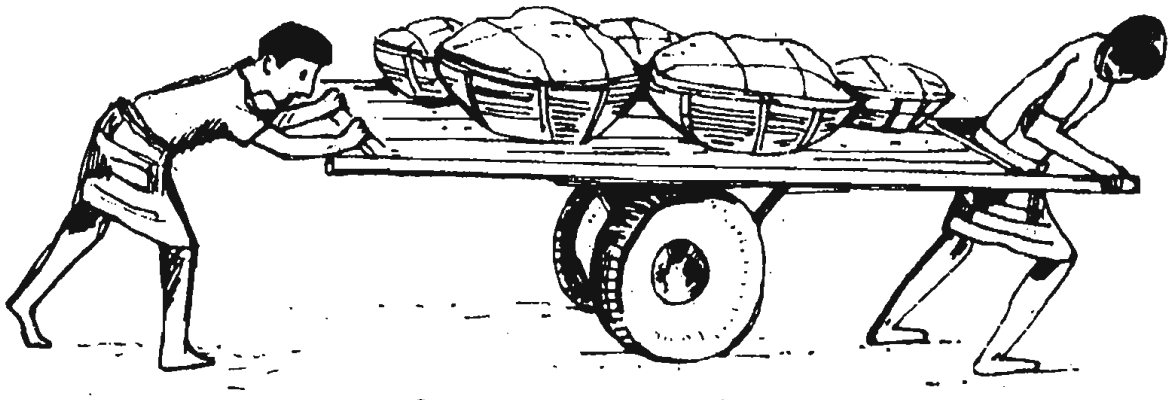

চিত্র ১০.১ বল হচ্ছে ধাক্কা বা টান

তোমার পেন্সিলের দাগ তোলার রাবারটি তুমি বাঁকাতে, মোচড়াতে অথবা টেনে লম্বা করতে পার। এতে রাবারটির আকারের পরিবর্তন হবে। আবার একটু জোরে চেপে ধরলে সেটার আয়তনও ছোট হয়ে যাবে। এই বাঁকানো, মোচড়ানো, চাপা বা ঠাসাও এক রকম ধাক্কা বা টান, অর্থাৎ বল।

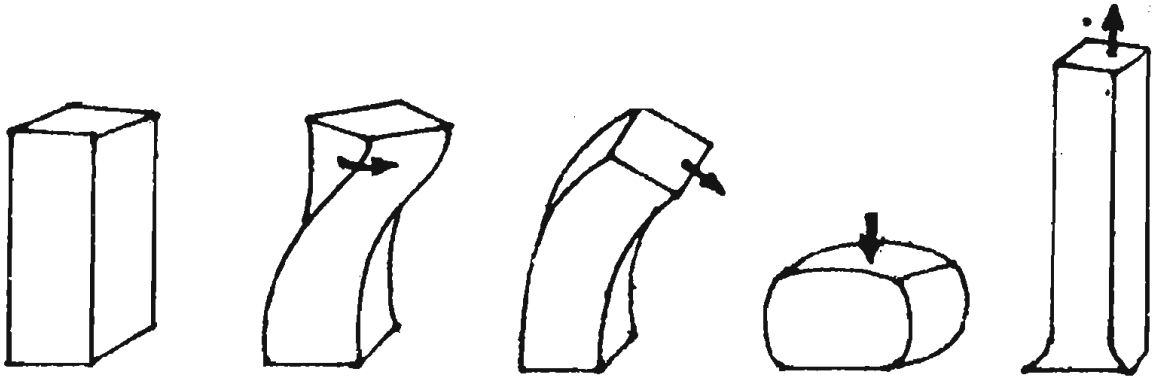

চিত্র ১০.২ : বল প্রয়োগে রাবারের আকার ও আয়তন পরিবর্তন

ফুটবল খেলার শুরুতে ফুটবলটি মাঠের মাঝখানে রাখা হয়। ফুটবলটি সেখানেই স্থির থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো খেলোয়াড় এটা সরিয়ে না দেয়। আবার ধর, মাথার উপর দিয়ে আসা একটি ফুটবলকে কোনো খেলোয়াড় হেড করে গোলের দিকে ঘুরিয়ে দিল। ফুটবলের গতি এবং দিক উভয়ই পরিবর্তন হল। গোল কীপার ফুটবলটি ধরে ফেলল। ফুটবলটি থেমে গেল। ফুটবলটিকে আঘাত করতে, হেড করতে বা ধরে ফেলতে (থামাতে) বল প্রয়োগ করতে হয়েছে।

বল চোখে দেখা যায় না, স্পর্শ বা অনুভবও করা যায় না। কিন্তু কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে বস্তুটির কী পরিবর্তন হয় তা দেখা যায়। তাই বল কী তা বুঝতে হলে কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে কী ঘটে তা দেখে বুঝতে হয়। তোমরা দেখলে যে, বল প্রয়োগ করে কোনো স্থির ফুটবলকে গতিশীল করা যায়, সেই গতির দিক পরিবর্তন করা যায়, গতি বাড়ানো অথবা কমানো যায় এবং ফুটবলটিকে থামানো যায়। আবার ধর, তুমি ইট বোঝাই একটি

ঠেলাগাড়িকে ধাক্কা দিলে। কিন্তু ঠেলাগাড়িটি সরলো না। এখানে বল প্রয়োগ করে তুমি ঠেলাগাড়িটি সরাতে চেষ্টা করলে কিন্তু সরাতে পারলে না। সুতরাং বল প্রয়োগ করলেই যে কোনো স্থির বস্তু গতিশীল হয় তা নয়, তবে গতিশীল হতে চায়। তোমার সাথে তোমার একজন বন্ধু এসে যোগ দিয়ে দুজন মিলে ধাক্কা দিলে ঠেলাগাড়িটা হয়ত চলতে শুরু করবে। সুতরাং এক কথায় বলা যায়, কোনো বস্তুর উপর যা প্রয়োগ করলে বস্তুটির স্থির অবস্থানের বা গতির পরিবর্তন ঘটে বা ঘটতে চায় তাকে বল বলে। বল অনেক রকম হতে পারে। যেমন ঘর্ষণজনিত বল, অভিকর্ষ বল, চৌম্বক বল, স্থির বৈদ্যুতিক বল ইত্যাদি।

ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া, মসলা পেষা, বোঝা তোলা, ঢিল মারা, গুলি ছোড়া, নৌকা বাওয়া, চলাফেরা করা, এসবই দৈনন্দিন জীবনে বলের ব্যবহার বা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত। মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে ঠেলাগাড়ি, রিক্সা, সাইকেল, সবই চলাচল করে বলের এই ক্ষমতার জোরে।

এ পর্যন্ত আমরা যা জেনেছি তা থেকে বোঝা যায় যে, বল

(ক) কোনো স্থির বস্তুকে গতিশীল এবং গতিশীল বস্তুকে স্থির করতে চায় বা পারে;

(খ) চলমান বস্তুর গতি বাড়াতে অথবা কমাতে পারে;

(গ) চলমান বস্তুর গতির দিক পরিবর্তন করতে পারে;

(ঘ) কোনো বস্তুর আকার বা আয়তন পরিবর্তন করতে পারে।

বলের পরিমাপ : বলের একক

তোমরা জান যে বল দেখা যায় না তবে বলের প্রভাব দেখা যায়। বল তাই সরাসরি পরিমাপ করা যায় না, বল মাপতে হয় বলের প্রভাবে যা ঘটে তা মেপে। একটি রবারের ফিতা বা একটি স্প্রিংকে টান দিলে কী হয়? তা লম্বা হয়ে যায়। যত জোরে টান দেওয়া যায়, তত বেশি লম্বা হয়। অর্থাৎ টান বা বল যত বেশি হয়, রবারের ফিতা বা স্প্রিং এর দৈর্ঘ্য তত বাড়ে। দৈর্ঘ্য কতটুকু বাড়ে তা দেখা যায়, মাপা যায়। সুতরাং বলের প্রভাবে একটি স্প্রিং এর দৈর্ঘ্য কতটুকু বেড়েছে তা জেনে বল পরিমাপ করা যায়।

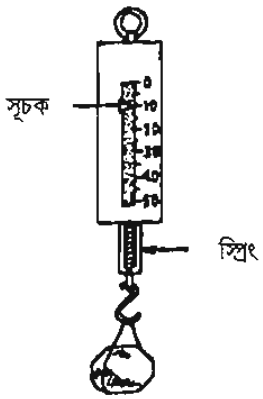

চিত্র ১০.৩ স্প্রিং নিক্তি

কোনো কিছুর পরিমাপের জন্য তার একক জানা প্রয়োজন। বল পরিমাপের জন্যও তাই একটি সাপেক্ষ বল বা বলের একক জানা প্রয়োজন, যার সাথে তুলনা করে অন্যান্য বল পরিমাপ করা যায়। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে বলের একক নিউটন। এক নিউটন বল কতটুকু সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে যদি মনে রাখা যায় যে ১ কিলোগ্রাম ভরের কোনো বস্তুর ওজন প্রায় ১০ নিউটন। অর্থাৎ ১ নিউটন ১০০ গ্রাম ভরের কোনো বস্তুর ওজনের প্রায় সমান। ওজন এবং বলের একক একই। কারণ কোনো বস্তুর ওজন হচ্ছে তার উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল বা টান। অর্থাৎ ওজন হচ্ছে বল।

স্প্রিং নিক্তির সাহায্যে বল মাপা যায়। এই যন্ত্রে একটি স্প্রিং এর সাথে একটি দাগকাটা স্কেল যুক্ত রয়েছে। এই স্কেলের দাগগুলো এমনভাবে কাটা থাকে যাতে এক ঘরের পরিবর্তন এক নিউটন বলের সমান হয়। স্প্রিং এর সাথে একটি কাঁটা বা সূচক লাগান আছে। বল প্রয়োগে স্প্রিং এর দৈর্ঘ্য বাড়ালে সূচকটি নিচে নেমে আসে। সূচকের পাঠ থেকে সরাসরি নিউটনে বলের পরিমাপ পাওয়া যায়।

চাপ কী?

চাপ শব্দটি আমরা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে থাকি। যেমন পড়াশুনার চাপ, মানসিক চাপ, সামাজিক চাপ, রাজনৈতিক চাপ ইত্যাদি। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় চাপ শব্দটির বিশেষ অর্থ আছে যা সাধারণ অর্থ থেকে ভিন্ন। কোনো বস্তুর উপর যখন বল প্রয়োগ করা হয় তখন সেই বস্তুর কতটুকু জায়গার উপর তা প্রয়োগ করা হয় তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। একই বল অল্প একটু জায়গার উপরে আর বেশি জায়গার উপরে প্রয়োগ করার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

তুমি একটি বোর্ডপিন বা মাথামোটা পেরেক নাও। পিনের চোখা দিকটা তোমার খাতার উপর খাড়াভাবে রেখে বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দাও। দেখবে তা খাতার কাগজের মধ্যে গেঁথে গেছে। পেরেক বা পিনটি উল্টিয়ে মোটা দিকটা খাতার উপর রাখ। এবার আঙুল দিয়ে চাপ দিতে যাওতো! তুমি বেশি জোরে চাপই দিতে পারবে না, তোমার আঙুলে পিনটি ঢুকে যাবে। এর কারণ কী? এর কারণ হচ্ছে পিন এর চোখা দিকের মাথার ক্ষেত্রফল খুবই সামান্য, প্রায় একটি বিন্দুর মত। অপর দিকটি মোটা, যার ক্ষেত্রফল চোখা দিকের ক্ষেত্রফলের তুলনায় অনেকগুণ বেশি। পিনের উপর বল প্রয়োগ করলে মাথার সামান্য বিন্দু পরিমাণ ক্ষেত্রফলের উপর তা জমা হয়। ফলে তার প্রভাব বাড়ে। উল্টো দিকে অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষেত্রফলের উপর তা ছড়িয়ে যায়। ফলে তার প্রভাব কমে। অর্থাৎ চাপ কমে।

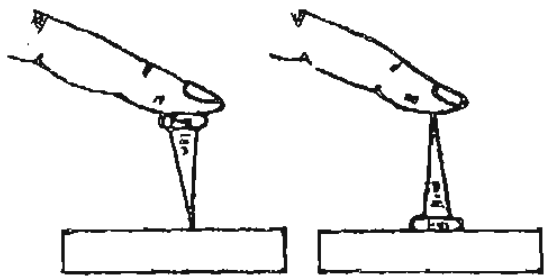

চিত্র ১০.৪: বল জড়ো হয় পিনের মাথায়, ফলে চাপ বাড়ে

সুতরাং বলের প্রভাব কতটুকু ক্ষেত্রফলের স্থানের উপর তা প্রয়োগ করা হয় তার উপর নির্ভর করে। বলকে ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করে চাপ পাওয়া যায়।

অর্থাৎ চাপ = $\frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$

অন্য কথায়, একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রযুক্ত বলকে চাপ বলে। একই বল বেশি চাপ দিতে পারে আবার কম চাপও দিতে পারে। বলকে খুব কম জায়গায় জড়ো করলে চাপ বাড়ে। অনেকখানি জায়গায় ছড়িয়ে দিলে চাপ কমে। যেমন ১০ নিউটন বল ১০ বর্গ সে.মি. ক্ষেত্রের উপর প্রয়োগ করলে যে চাপ হবে, ১ বর্গ সে. মি. ক্ষেত্রের উপর প্রয়োগ করলে চাপ হবে তার দশগুণ।

বলের একক নিউটন, ক্ষেত্রফলের একক বর্গ মিটার। সুতরাং চাপের একক হচ্ছে নিউটন/বর্গ মিটার। এই এককের নাম দেয়া হয়েছে প্যাসকেল। অর্থাৎ

১ প্যাসকেল = ১ নিউটন প্রতি বর্গ মিটার

তোমরা এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ পিন বা পেরেকের মাথা কেন সরু করা হয়। ছুরি, কাঁচি, কুড়াল, বটি সবই যত ধারালো হবে ততই কাজ করা সহজ। অর্থাৎ কম বল প্রয়োগ করে বেশি কাজ করা যাবে। এখানে ক্ষেত্রফল কমিয়ে চাপ বাড়ান হয়েছে। আবার দালান তৈরির সময় নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যে, সবচাইতে নিচের দেওয়াল চওড়া করা হয়। এখানে ক্ষেত্রফল বাড়িয়ে চাপের পরিমাণ কমানো হয়েছে। একই কারণে একটি ট্রাকের চাকা একটি রিক্সার চাইতে অনেক বেশি চওড়া। ট্রাকে বা বাসের পেছনে আবার দুইটি করে চাকাও লাগান হয়। তোমরা কেউ কেউ হয়ত দেখে থাকবে কোনো লোক এক সারি পেরেকের উপর খালি গায়ে শুয়ে কসরত দেখাচ্ছে। অনেকগুলো পেরেকের উপর লোকটির ওজন বা বল ছড়িয়ে যায় বলে চাপ অনেক কম হয়। সে কারণেই এটা সম্ভব। একটি পেরেকের উপর শোয়া সম্ভব হত না।

স্থিতি ও গতি

আমাদের চারপাশে কিছু কিছু বস্তু রয়েছে যারা স্থির। যেমন ঘরবাড়ি, গাছপালা, পাহাড়–পর্বত। আবার কিছু কিছু জিনিস রয়েছে যারা গতিশীল। যেমন চলমান রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, রিক্সা ইত্যাদি। বস্তুর অবস্থান অনুযায়ী তাই সকল বস্তুকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা (ক) স্থির বস্তু (খ) গতিশীল বস্তু।

স্থিতি

তোমার স্কুল ঘরটি গতকাল যেখানে ছিল, আজও সেখানেই রয়েছে এবং যত দিন না কোনো কারণে সেটা ভাঙা বা

সরানো হয় তত দিন একই স্থানে থাকবে। একই রকম অন্যান্য ঘরবাড়ি বা গাছপালা এখন যেখানে আছে, এক ঘণ্টা, এক দিন বা এক মাস পরেও দেখা যাবে একই জায়গায় আছে। এইগুলোকে বলা হয় স্থির বস্তু এবং এদের ঐ অবস্থাকে বলে স্থিতি। অর্থাৎ সময় পরিবর্তনের সাথে কোনো বস্তু তার আশেপাশের অন্যান্য বস্তুর অবস্থানের তুলনায় স্থান পরিবর্তন না করলে বস্তুটিকে স্থির বস্তু বলে এবং বস্তুটির ঐ অবস্থাকে স্থিতি বলে।

গতি

একটি বাস বা রেলগাড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে তখন তারা স্থির। কিন্তু চলতে শুরু করার সাথে সাথেই স্থান পরিবর্তন হতে থাকে। দশ মিনিটর পর দেখা যাবে তারা এক জায়গায়, এক ঘণ্টা পর আবার অন্য জায়গায়। অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে এদের অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে। এদের বলা হয় গতিশীল বা সচল বস্তু। আর বস্তুর এই সচল অবস্থাকে গতি বলে। অর্থাৎ সময় পরিবর্তনের সাথে কোনো বস্তু তার আশেপাশের অন্যান্য বস্তুর অবস্থানের তুলনায় স্থান পরিবর্তন করলে বস্তুটিকে গতিশীল বস্তু বলা হয় এবং বস্তুটির ঐ অবস্থাকে বলা হয় গতি। তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে খেয়াল করেছ যে কোনো বস্তু স্থির অথবা গতিশীল তা বোঝা যায় আশেপাশের বস্তুর সাথে তুলনা করে। ধর, তুমি রেলগাড়িতে চড়ে এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছ। ট্রেন চলতে শুরু করেছে। ট্রেনের দরজা, জানালা বা অন্যান্য যাত্রীদের তুলনায় তোমার অবস্থানের কি কোনো পরিবর্তন হবে? হবে না এবং ট্রেনের কামরার মধ্যে সকল কিছু তোমার কাছে স্থির মনে হবে। যদিও ট্রেনটি গতিশীল। পৃথিবীর তুলনায় আশপাশের ঘরবাড়ি গাছপালার তুলনায় এর উপরস্থ বাড়িঘর, গাছপালা স্থির। কিন্তু তুমি জান পৃথিবী নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘণ্টায় গড়ে প্রায় ১২০০ কিলোমিটার বেগে ঘুরছে যার জন্য হচ্ছে দিনরাত্রি। পৃথিবী আবার সূর্যকে কেন্দ্র করেও ঘুরছে। সুতরাং পৃথিবীর উপরের সকল বস্তুই পৃথিবীর বহিস্থ সব কিছুর তুলনায় গতিশীল। প্রকৃতপক্ষে এই মহাবিশ্বে কোনো কিছুই স্থির নয়। পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য, তারা সবকিছুই ঘুরছে। তাই পরম গতি বা পরম স্থিতি বলে কিছু নেই। অন্য বস্তুর সাথে তুলনা করেই কোনো বস্তু স্থির বা গতিশীল তা বোঝা যায়। অর্থাৎ সমস্ত গতি এবং স্থিতি আপেক্ষিক মাত্র।

কোনো চলমান বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করলে তার গতির পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ গতি বাড়ে বা কমে। যদি বল প্রয়োগ না করা হয় তাহলে কী হয়? গতি বাড়েও না, কমেও না, অর্থাৎ বস্তুটি একই গতিতে চলতে থাকে। এইভাবে কতক্ষণ চলবে? যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো বল প্রয়োগ করা হয়। যদি কোনো দিন বল প্রয়োগ করা না হয়, তবে চিরদিনই বস্তুটি চলতে থাকবে।

সুতরাং কোনো স্থির বস্তুর উপর কোনো বল প্রয়োগ না করলে বস্তুটি চিরদিন স্থিরই থাকবে। একইভাবে কোনো চলমান বস্তুর উপর কোনো বল প্রয়োগ করা না হলে বস্তুটি একই গতিতে চিরকাল চলতে থাকবে। অবাক লাগছে? এ রকম অবাক হবার মত অনেক কিছুই তুমি বিজ্ঞানের ক্লাসে শিখবে।

অনেক রকম গতি

ট্রেন চলছে, সাইকেলের চাকা ঘুরছে, ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে, দোলনা দুলছে এসবই বিভিন্ন রকমের গতি। এক এক ধরনের গতির নাম এক এক রকম।

রৈখিক গতি

তুমি কোনো বস্তু উপরে তুলে ছেড়ে দাও। বস্তুটি সোজা নিচে পড়বে। এই রকম কোনো বস্তু যদি সরলরেখা বরাবর

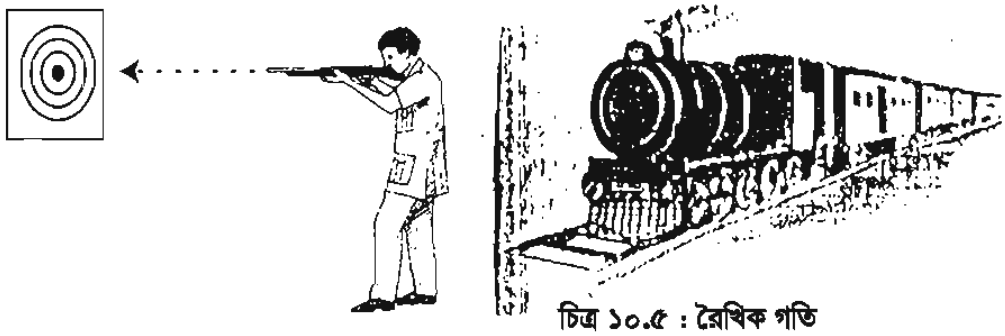

চিত্র ১০.৫ : রৈখিক গতি

চলে তবে ঐ বস্তুটির গতিকে রৈখিক গতি বলে। বন্দুকের গুলির গতি রৈখিক গতি।

বক্র গতি

তুমি বাড়ি থেকে স্কুলে আসার সময় সোজা পথে না এসে যদি আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে আস তবে তোমার গতি হবে বক্র গতি। অর্থাৎ কোনো গতিশীল বস্তুর গতির পথ যদি বাঁকা হয় তবে বস্তুটির গতিকে বক্র গতি বলে। রাস্তায় চলমান রিক্সা, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রাক ইত্যাদির গতি বক্র গতি। কেননা একেবারে সোজা রাস্তা খুব কমই দেখা যায়।

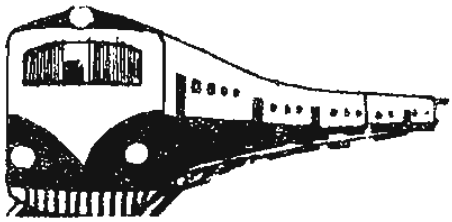

চিত্র ১০.৬ : বক্র গতি

ঘূর্ণন গতি

এক মিটার দৈর্ঘ্যের একটি দড়ি নাও। এক দিকে একটি ইটের টুকরা বা পাথর বাঁধ। দড়ির অপর দিক তোমার আঙুলে জড়িয়ে পাথরটিকে ঘোরাও। পাথরটির যে গতি হবে তাকে ঘূর্ণন গতি বলে। অর্থাৎ কোনো বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে কোনো বস্তু যখন ঘুরতে থাকে তখন বস্তুটির গতিকে ঘূর্ণন গতি বলে। চলন্ত সাইকেলের চাকার গতি, বৈদ্যুতিক পাখার গতি, পৃথিবীর নিজ কক্ষে আবর্তনের গতি ইত্যাদি ঘূর্ণন গতি।

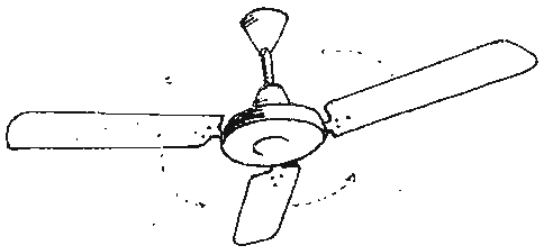

চিত্র ১০.৭ : ঘূর্ণন গতি

পর্যায় গতি

দড়ি দিয়ে পাথর ঘোরাবার সময় তুমি যদি এমনভাবে ঘোরাও যে পাথরটির একটি ঘূর্ণনের সময় প্রতিবারই সমান হয় তবে সেই গতিকে পর্যায় গতি বলে। সাইকেল কখনো জোরে কখনো আস্তে চলে তাই তার চাকা একবার ঘুরতে কখনো কম কখনো বেশি সময় লাগে। সুতরাং সাইকেলের চাকার গতি পর্যায় গতি নয়। পৃথিবীর একবার নিজ অক্ষে আবর্তনে সব সময়ই ২৪ ঘন্টা সময় লাগে। সুতরাং পৃথিবীর আবর্তন পর্যায় গতি। অর্থাৎ কোনো বস্তু যদি একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর তার গতিপথের একই বিন্দু দিয়ে একই দিকে যায় তবে বস্তুটির গতিকে পর্যায় গতি বলে। ঘড়ির কাঁটার গতি, বৈদ্যুতিক পাখার গতি, গ্রামোফোন রেকর্ডের গতি ইত্যাদি পর্যায় গতি।

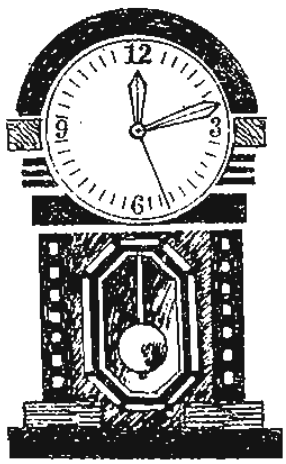

চিত্র ১০.৮ : পর্যায় গতি (ঘড়ি)

দোলন গতি

দড়িতে বাঁধা একটি পাথর তুমি এবার এমনভাবে ধর যেন তা নিচে ঝুলে থাকে। ডান হাতে দড়িটা ধরে বাঁ হাত দিয়ে

পাথরটিকে সামান্য টেনে ধরে ছেড়ে দাও। দেখবে পাথরটি বাঁ দিক থেকে ডান দিকে কিছু দূর যেয়ে থামবে, আবার উল্টোদিকে ঘুরে বাঁ দিকে আসবে। এইভাবে পাথরটি দুলতে থাকবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় পর পর পাথরটি গতি উল্টে যাবে। পাথরটির এই গতিকে দোলন গতি বলে। ঘড়ির দোলকের গতি, দোলনার গতিও দোলন গতি। দোলন গতি এক রকম পর্যায় গতি। তফাৎ এই যে, দোলন গতিসম্পন্ন বস্তুর গতি নির্দিষ্ট সময় পরপর বিপরীতমুখী হয়। সব দোলন গতিই পর্যায় গতি কিন্তু সব পর্যায় গতি দোলন গতি নয়। ঘড়ির দোলকের গতি দোলন গতি এবং পর্যায় গতি। ঘড়ির কাঁটার গতি দোলন গতি নয়, শুধু পর্যায় গতি।

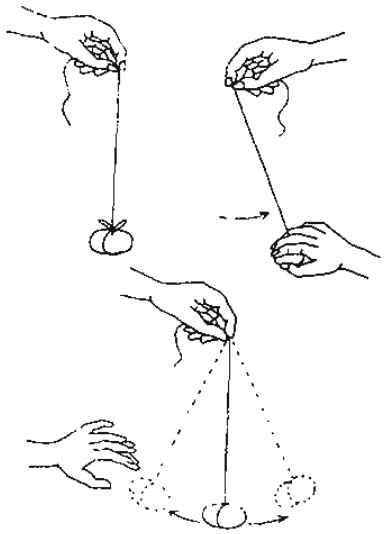

চিত্র ১০.৯: বিভিন্ন গতির চিত্র

জটিল গতি

সাইকেল যখন চলছে তখন তার চাকার ঘূর্ণনের সাথে সাথে সাইকেলটিও সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এইরকম কোনো বস্তুর যখন একই সাথে চলন ও ঘূর্ণন গতি থাকে তখন বস্তুটির গতিকে জটিল গতি বলে। চলন্ত মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি বা রিক্সার চাকার গতি হল জটিল গতি।

চিত্র ১০.১০: জটিল গতি (সাইকেল)

সরণ, দ্রুতি ও বেগ

সরণ

তোমার বইটি তুমি কিছু দূরে টেবিলের উপরেই সরিয়ে রাখ। বইটির স্থান পরিবর্তন হল। কোনো বস্তুর এই অবস্থানের পরিবর্তনকে সরণ বলে। তবে অবস্থানের পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট দিকে হতে হবে। বস্তুর প্রথম অবস্থান এবং দ্বিতীয় অবস্থানের মধ্যকার সরলরৈখিক দূরত্ব সরণের পরিমাপ।

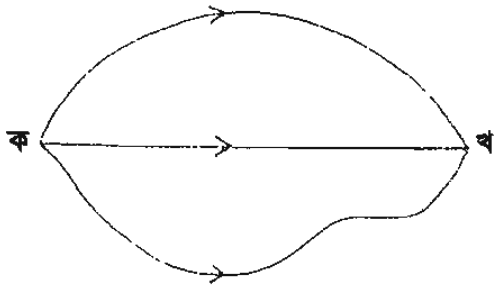

চিত্র ১০.১১: সরণ

মনে কর কোনো বস্তু 'ক' অবস্থান থেকে 'খ' অবস্থান গেল। বস্তুটি সরাসরি সরলরেখায় যেতে পারে আবার এঁকে বেঁকে উপরের বা নিচের পথে যেতে পারে। কিন্তু যে পথেই যাক না কেন তার সরণ হবে প্রথম অবস্থান 'ক' এবং শেষ অবস্থান 'খ' এর মধ্যকার সরলরৈখিক বা ন্যূনতম দূরত্ব 'কখ' । বস্তুটি এক স্থান থেকে আরেক স্থানে কোন পথে গেল তার উপর সরণ নির্ভর করে না। সরণের দিক হবে 'ক' থেকে 'খ' এর দিক।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, কোনো গতিশীল বস্তুর একটি নির্দিষ্ট দিকে অবস্থানের পরিবর্তনকে সরণ বলে এবং বস্তুটির প্রথম এবং শেষ অবস্থানের মধ্যকার সরল রৈখিক দূরত্ব সরণের পরিমাপ। সরণ একটি দূরত্ব, সুতরাং সরণের একক আর দৈর্ঘ্যের একক এক। অর্থাৎ সরণের একক মিটার।

দ্রুতি

ধর, তোমার বাড়ি থেকে তোমার স্কুলের দূরত্ব ১০০০ মিটার। হেঁটে যেতে সময় লাগে ২০ মিনিট। অর্থাৎ এক মিনিটে তুমি ৫০ মিটার পথ হাঁটতে পার। তোমার দ্রুতি হচ্ছে ৫০ মিটার প্রতি মিনিটে। দ্রুতি সোজা বা বাঁকা পথে চলার উপর নির্ভর করে না। মোট কত দূরত্ব মোট কত সময়ে অতিক্রম করেছে তার উপর নির্ভর করে। এক কথায়, কোনো বস্তু একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে দ্রুতি বলে। দ্রুতির একক মিটার প্রতি সেকেন্ড।

$$\text{অর্থাৎ দ্রুতি} = \frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}}$$

বেগ

দ্রুতির যদি কোনো নির্দিষ্ট দিক থাকে তবে তাকে বেগ বলে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিকে কোন বস্তু একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বেগ বলে।

$$\text{অর্থাৎ বেগ} = \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}}$$

ধর, তুমি স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার দৌড়ে অংশ নিলে। ১০০ মিটার দৌড়াতে সময় লাগল ২০ সেকেন্ড। তুমি এদিক ওদিক না যেয়ে সোজা নাক বরাবর দৌড়িয়েছ। অর্থাৎ তোমার দিক নির্দিষ্ট। তোমার গতি ৫ মিটার প্রতি সেকেন্ড। বেগের একক ও দ্রুতির একক মিটার প্রতি সেকেন্ড। দ্রুতি ও বেগের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, দ্রুতির কোনো নির্দিষ্ট দিক নেই, বেগের নির্দিষ্ট দিক আছে।

এ অধ্যায়ের নতুন শব্দ

বল	স্থিতি	নিউটন, মিটার
সরণ, বেগ	দোলনগতি	চাপ
গতি	প্যাসকেল	দ্রুতি
পর্যায়গতি	জটিলগতি।	

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. বলের একক কী ?

ক. মিটার খ. কিলোমিটার
গ. নিউটন ঘ. প্যাসকেল।

২. প্যাসকেল কিসের একক ?

ক. বলের খ. চাপের
গ. সরণের ঘ. বেগের।

৩. নিচের কোনটি বল ?

ক. শক্তি খ. ভর
গ. ওজন ঘ. দ্রুতি

৪. দুই কিলোগ্রাম ভরের কোনো বস্তার ওজন প্রায় ?

ক. ১ নিউটন খ. ২ নিউটন
গ. ১০ নিউটন ঘ. ২০ নিউটন

৫. ঠেলাগাড়ির চাকার গতি কী ধরনের গতি ?

ক. জটিল খ. রৈখিক
গ. ঘূর্ণন ঘ. পর্যায়

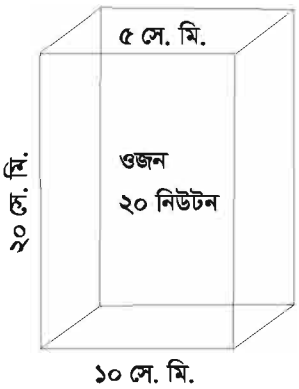

চিত্র ক

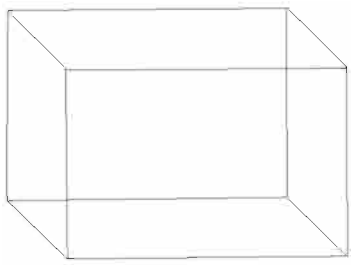

চিত্র খ

চিত্রে একই ইটের দুইটি ভিন্ন অবস্থান দেখানো হল

১. খ অবস্থানে ইটটির ওজন ?

ক. ১০ নিউটন খ. ২০ নিউটন
গ. ৪০ নিউটন ঘ. ৩০ নিউটন

২. খ চিত্রে ইটের চাপ প্রতিবর্গ মিটারে

ক. ১০০০ নিউটন খ. ২০০০ নিউটন
গ. ৩০০০ নিউটন ঘ. ৪০০০ নিউটন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

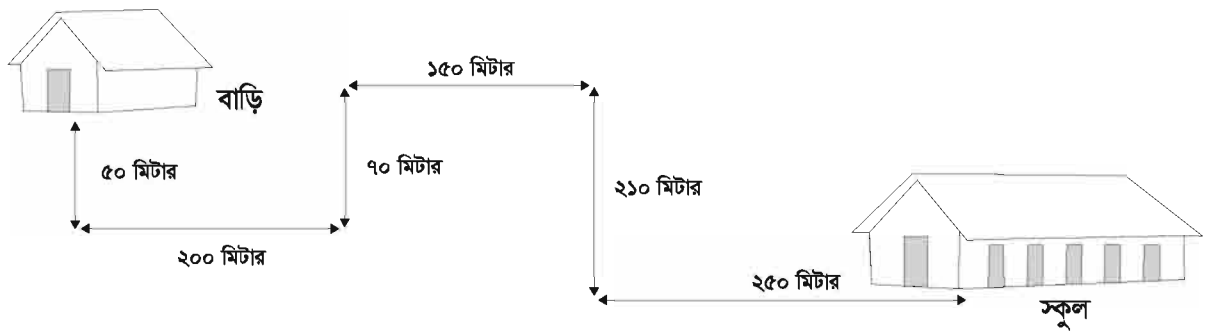

চিত্র

রহিম প্রতিদিন পায়ে হেঁটে উপরের পথ অতিক্রম করে স্কুলে যায়। স্কুলে পৌঁছাতে রহিমের ৩০ মিনিট সময় লাগে।

ক. দূরত্ব কাকে বলে ?

খ. রহিমের গতি পর্যায় গতি হতে কীভাবে আলাদা ব্যাখ্যা কর।

গ. রহিমের গড় দ্রুতি নির্ণয় কর।

ঘ. বাড়ি হতে স্কুলের দূরত্বের দৈর্ঘ্য সরণে পরিমাপ করলে রহিমের দ্রুতি ও বেগের মধ্যে কী পরিবর্তন হবে। গাণিতিক যুক্তি দাও।

২. ২ বর্গ মিলিমিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি পেরেকের মাথায় একটি হাতুড়ির সাহায্যে ১০ নিউটন বল প্রয়োগ করা হয়। এতে পেরেকটি কাঠের ভেতর ২ সেন্টিমিটার দূরত্বে প্রবেশ করে।

ক. ১০ নিউটন বল বলতে কী বুঝায় ?

খ. পেরেকটি কাঠের মধ্যে ঢুকে যাবার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. পেরেক কী পরিমাণ চাপ অনুভব করবে নির্ণয় কর।

ঘ. পেরেকের মাথার ক্ষেত্রফলের হ্রাসবৃদ্ধিতে অনুভূত চাপের কীরূপ পরিবর্তন হবে লিখ।

একাদশ অধ্যায়

কাজ, ক্ষমতা, শক্তি

কাজ, ক্ষমতা, শক্তি এই শব্দগুলো আমরা দৈনন্দিন জীবনে সব সময় ব্যবহার করে থাকি। যেমন, ছেলেটি খুব কাজের, লোকটির ক্ষমতা অনেক বা সিংহ শক্তিশালী প্রাণী ইত্যাদি। কিন্তু শব্দগুলোর সাধারণ অর্থ এবং বৈজ্ঞানিক অর্থ সব সময় এক নয়। বিজ্ঞানের ভাষায় কাজ, ক্ষমতা ও শক্তির বিশেষ অর্থ রয়েছে।

কাজ কী? কাজের একক কী?

তোমার বইটা তুমি টেবিল থেকে নিয়ে মাথার উপরে তোল। এর জন্য তোমাকে কী কাজ করতে হয়েছে? বইটির ওজনের বিপরীত তোমার বল প্রয়োগ করতে হয়েছে। এর রকম বল প্রয়োগ করে কোনো বস্তুকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরানোকে বিজ্ঞানের ভাষায় কাজ বলে। এখানে লক্ষ করার দুটি বিষয় রয়েছে। এক, বল এবং দুই বস্তুটির গতি বা সরণ। বল প্রয়োগে যখন বস্তুটি গতিশীল হয়ে স্থান পরিবর্তন করবে শুধুমাত্র তখনই কাজ হবে। তুমি একটি দেয়ালে তোমার গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে ধাক্কা দিলে। দেয়ালটি এক তিলও সরলো না। তুমি কি কোনো কাজ করলে? না, কারণ যদিও বল প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু সরণ হয় নাই। একজন ঠেলাগাড়ি চালক ঠেলা গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে কাজ করছে। কারণ, বল প্রয়োগের ফলে গাড়িটি এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাচ্ছে। অর্থাৎ গাড়িটির সরণ হচ্ছে। একজন কুলি মাটি থেকে বোঝা তার মাথায় তুললো। সে কাজ করলো। বোঝা মাথায় সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে কোনো কাজ করছে না।

সুতরাং, কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে বস্তুটিকে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে সরানোকে কাজ করা বলে। কাজের পরিমাপ করা হয় বল ও সরণের গুণফল দিয়ে, অর্থাৎ কাজ = বল × সরণ। কাজের এককের নাম জুল। তোমরা জান বলের একক নিউটন এবং সরণের একক মিটার। সুতরাং

১ জুল = ১ নিউটন × ১ মিটার

অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর ১ নিউটন বল প্রয়োগ করলে যদি তার সরণ ১ মি. হয়, তবে কাজ করার পরিমাণ হবে ১ জুল। ধর, তোমার বইটি উপরে তুলতে ১০ নিউটন বল প্রয়োগ করতে হয়। বইটি ১ মিটার উপরে তুললে তুমি কাজ করলে, ১০ × ১= ১০ জুল পরিমাণ।

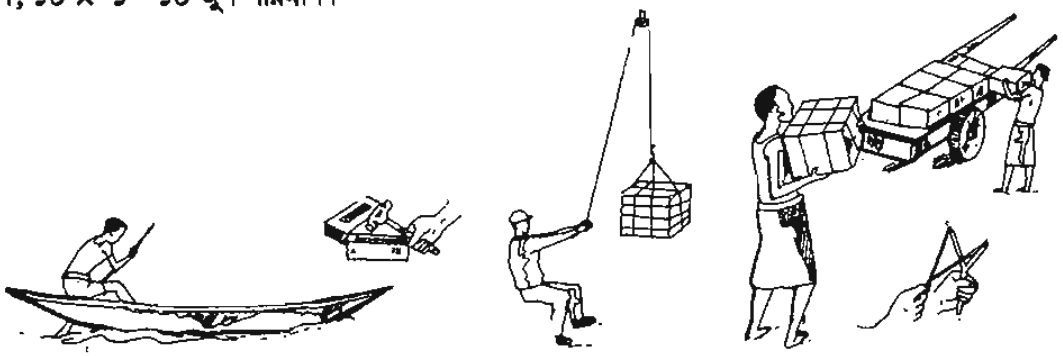

চিত্র ১১.১ : নানা রকম কাজ

ক্ষমতা কী? ক্ষমতার একক কী?

দুইজন লোক একই স্থান থেকে ট্রাকে ইট তুলছে। এক মিনিট সময়ে একজন ৬টি ইট তুলছে, অপরজন ১২টি ইট। কার ক্ষমতা বেশি? দ্বিতীয় লোকটির, কারণ একই সময়ে সে অপর লোকটির দ্বিগুণ বেশি কাজ করছে। অন্যভাবে বলা যায়, যে তাড়াতাড়ি কাজ করে, তার ক্ষমতা বেশি। ক্ষমতা দিয়ে একটি কাজ কত তাড়াতাড়ি করা যাবে তা বোঝা যায়। এক কথায়, একক সময়ে যে পরিমাণ কাজ করা হয় তাকে ক্ষমতা বলে। অর্থাৎ

$$\text{ক্ষমতা} = \frac{\text{কাজের পরিমাণ}}{\text{সময়}}$$

কাজের একক জুল, সময়ের একক সেকেন্ড। সুতরাং ক্ষমতার একক জুল প্রতি সেকেন্ড। ক্ষমতার এই এককের নাম ওয়াট। অর্থাৎ

$$১ \text{ ওয়াট} = \frac{১ \text{ জুল}}{১ \text{ সেকেন্ড}}$$

ক্ষমতার এই একক কিছু ছোট বলে অনেক সময় কিলোওয়াটকে ব্যবহারিক একক হিসেবে ধরা হয়। ১ কিলোওয়াট = ১০০০ ওয়াট।

উপরের উদাহরণে (চিত্র নং ১১.১) প্রথম লোকটি এক মিনিট অর্থাৎ ৬০ সেকেন্ডে যদি ৬০০ জুল কাজ করে তবে

$$\text{তার ক্ষমতা} = \frac{\text{কাজের পরিমাণ}}{\text{সময়}} = \frac{৬০০}{৬০} = ১০ \text{ ওয়াট}$$

দ্বিতীয় লোকটি একই সময়ে কাজ করছে ১২০০ জুল। সুতরাং

$$\text{তার ক্ষমতা} = \frac{\text{কাজের পরিমাণ}}{\text{সময়}} = \frac{১২০০}{৬০} = ২০ \text{ ওয়াট}$$

সুতরাং দ্বিতীয় ব্যক্তিটির ক্ষমতা প্রথম ব্যক্তির ক্ষমতার তুলনায় দ্বিগুণ। ক্ষমতা কাজের মোট পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, কতক্ষণে কাজটি করা হল তার উপর নির্ভর করে।

শক্তি কী? শক্তির একক কী?

তুমি আর তোমার এক বন্ধু এক সাথে দৌড়াতে শুরু করলে। এক কিলোমিটার যাওয়ার পর তোমার বন্ধু বসে পড়লো। সে আর দৌড়াতে পারছে না। আরো এক কিলোমিটার যাওয়ার পর তুমিও বসে পড়লে। কে বেশি শক্তিশালী? তুমি নিশ্চয়ই বলবে 'আমি'। তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু কীভাবে? দৌড়ানোর সময় তোমরা দুজনই কাজ করছো। এক কিলোমিটার যাওয়ার পর তোমার বন্ধু আর দৌড়াতে পারলো না। তার মানে সে কাজ করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তোমার সামর্থ্য তখনও রয়েছে। তাই তুমি আরো এক কিলোমিটার দৌড়াতে পেরেছ। তারপর কিন্তু তোমার সামর্থ্যও শেষ হয়েছে।

কাজ করার এই সামর্থ্যকেই শক্তি বলে। অর্থাৎ কাজ করার জন্য প্রয়োজন হয় শক্তির। যার শক্তি যত বেশি সে তত বেশি কাজ করতে পারে। শক্তি না থাকলে কেউ কোনো কাজ করতে পারে না। কোনো মানুষ বা যন্ত্র ততটুকুই কাজ করতে পারে তার শক্তি যতটুকু। তাই কাজ দিয়েই শক্তি পরিমাপ করা হয়। সুতরাং কাজের এককই শক্তির একক। অর্থাৎ শক্তির এককও জুল।

শক্তি ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও বাঁচতে পারি না। আসলে এই বিশ্বজগতই শক্তি ছাড়া টিকতে পারবে না। বিশ্বজগতে কিছুই স্থির নয়। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে চাঁদ। সব সময়ই কিছু না কিছু ঘটছে অর্থাৎ কাজ হচ্ছে। তুমি চিন্তা করতে পার এমন যে কোনো কাজের জন্য প্রয়োজন শক্তির। খাদ্য উৎপাদন করা, রান্নাবান্না করা, গাড়িঘোড়া চলা, কলকারখানা চালু রাখা, খেলাধুলা করা, এমনকি তুমি যে এই বইটি পড়ছো, তার জন্যও প্রয়োজন শক্তির।

শক্তির অনেকরূপ

আমরা আমাদের শক্তি পাই খাবার থেকে। এটা এক ধরনের শক্তি। মোটরগাড়ি বা রেলগাড়ি চলে আরেক ধরনের শক্তি দিয়ে। আবার আরেক ধরনের শক্তি দিয়ে বাতি জ্বলে, পাখা ঘোরে বা কলকারখানা চলে। এই রকম শক্তির রয়েছে অনেক রূপ, এক এক রূপের এক এক নাম।

যান্ত্রিক শক্তি

চলা মানেই কাজ, অর্থাৎ যে কোনো চলন্ত বস্তুর কাজ করার সামর্থ্য রয়েছে। সুতরাং তার শক্তি রয়েছে। তুমি হাঁটছো, গাড়ি চলছে, তোমার বা গাড়ির এক ধরনের শক্তি রয়েছে। এই শক্তিকে বলে গতি শক্তি। কারণ, গতির জন্য কাজ করার সামর্থ্য জন্মেছে। অর্থাৎ গতিশীল বস্তু তার গতির জন্য কাজ করার যে সামর্থ্য লাভ করে তাকে গতিশক্তি বলে।

তুমি একটি ইট মাটি থেকে উপরে তুললে। তুমি কিছু কাজ করলে। উপরে ধরে রাখা অবস্থায় ইটটির কী কোনো শক্তি আছে? আছে, কারণ ইটটিকে যদি তুমি এখন ছেড়ে দাও তবে সেটা আপনা আপনি মাটিতে পড়বে অর্থাৎ কাজ করবে। শক্তি না থাকলে এই কাজ করবে কীভাবে? সুতরাং তুমি যখন ইটটিকে উপরে ধরে রেখেছ, তখন যদিও তার কোনো গতি নেই, কিন্তু এক ধরনের শক্তি রয়েছে। এই শক্তিকে বলে স্থিতিশক্তি। অর্থাৎ কোনো বস্তুর বিশেষ অবস্থানের জন্য তার যে কাজ করার সামর্থ্য জন্মায় তাকে স্থিতিশক্তি বলে।

তুমি নিশ্চয়ই গুলতি দিয়ে আম বা পেয়ারা পেড়েছ, অথবা পাখি শিকার করেছ? গুলিসহ গুলতির রবার যখন তুমি টেনে লম্বা কর, তখন তার মধ্যে জমা হয় স্থিতিশক্তি। তুমি ছেড়ে দিলেই গুলিটি প্রবল বেগে ছুটে বেরিয়ে যায়। তখন তার মধ্যে থাকে গতিশক্তি। এই গতিশক্তি এবং স্থিতিশক্তিকে একত্রে যান্ত্রিক শক্তি বলে।

রাসায়নিক শক্তি

খাদ্যে বা জ্বালানিতে যে শক্তি জমা থাকে তাকে রাসায়নিক শক্তি বলে। খাদ্য থেকে তাই আমরা শক্তি পাই। পেট্রোল, গ্যাস, কাঠ, কয়লা সবকিছুরই রয়েছে রাসায়নিক শক্তি। তোমরা যে টর্চ বাতি বা রেডিওতে ব্যাটারি ব্যবহার কর তার মধ্যেও রয়েছে রাসায়নিক শক্তি।

তাপ শক্তি

রান্না করতে, মোটর গাড়ি বা রেলগাড়ির ইঞ্জিন চালাতে যে শক্তি ব্যবহার করা হয় তাকে বলে তাপ শক্তি। কয়লা, গ্যাস, কাঠ, পেট্রোল বা ডিজেল পুড়িয়ে এই শক্তি পাওয়া যায়। আবার সূর্য থেকেও সরাসরি তাপ আসে। এই তাপ শক্তি পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে। তাপ শক্তি ছাড়া কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ বেঁচে থাকতে পারতো না।

চুম্বক শক্তি

শক্তির আরেক রূপ হচ্ছে চুম্বক শক্তি। এই শক্তি দিয়েই কোনো চুম্বক দূর থেকে একটি লোহার বস্তুকে আকর্ষণ করে। চুম্বক শক্তি নিয়ে আমরা এর পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব।

আলোকশক্তি

তাপ শক্তির সাথে সূর্য থেকে সরাসরি আর যে শক্তিটি আসে তা হচ্ছে আলোক শক্তি। আলোক শক্তি ছাড়া আমরা কিছুই দেখতে পারতাম না।

শব্দ শক্তি

তুমি যখন কথা বল, গান গাও বা বাঁশি বাজাও তখন এক ধরনের শক্তি উৎপন্ন করছো। যার নাম শব্দ শক্তি। শব্দের সাহায্যেই আমরা একে অপরের কথা শুনতে পাই। টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশনে শব্দ শক্তি ব্যবহার করা হয়। পদার্থের কম্পন থেকে শব্দের উৎপত্তি হয়।

বিদ্যুৎ শক্তি

শক্তির একটি অতি পরিচিত এবং প্রয়োজনীয় রূপ হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তি। বিদ্যুৎ শক্তি দিয়ে আমরা বাতি জ্বালাই, পাখা চালাই, কল-কারখানা বিদ্যুৎ শক্তি দিয়ে চলে। অনেক দেশে রেলগাড়িও বিদ্যুৎ দিয়ে চালান হয়। বিদ্যুৎ শক্তি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তারের সাহায্যে নিয়ে যাওয়া যায়।

সৌর শক্তি

সূর্য থেকে তাপ বা আলোক রূপে যে শক্তি পাওয়া যায় তাকেই সৌর শক্তি বলে। প্রকৃতপক্ষে, সূর্য আমাদের শক্তির একটি প্রধান উৎস। কাপড় শুকানো, ধানপাট শুকানোর কাজে আমরা প্রতিদিনই সৌর শক্তি ব্যবহার করছি।

বায়ু শক্তি

বায়ু প্রবাহের ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাকে বায়ু শক্তি বলে। পালতোলা নৌকা বায়ু শক্তি দিয়ে চলে। বায়ু শক্তি ব্যবহার করে বায়ুকল বানানো যায় যা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়, গম ও ভুট্টা পেষা যায়। এই শক্তি খুব একটা ব্যবহৃত হয় না। এই কারণে যে অন্যভাবে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন এবং ব্যবহার অনেক সহজ এবং সস্তা।

পারমাণবিক শক্তি

তোমরা জান পদার্থ পরমাণু দিয়ে গঠিত। এই পরমাণুর অভ্যন্তর অত্যন্ত শক্তিশালী বল দিয়ে একত্রে বাঁধা রয়েছে। এই বাঁধন যদি কোনোভাবে ভাঙা যায় তবে পাওয়া যায় অত্যন্ত শক্তিশালী শক্তি, যার নাম পারমাণবিক শক্তি। এই শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে আমাদের কাজে লাগানো যায়। আবার পারমাণবিক বোমা তৈরি করে পৃথিবী ধ্বংসের কাজেও ব্যবহার করা যায়।

শক্তির রূপান্তর

কোনো শক্তি ব্যবহার করে যখন কোনো কাজ করা হয় তখন সেই শক্তির কী হয়? সেই শক্তি কি শেষ হয়ে যায়? না, শক্তির ক্ষয় বা শেষ নেই। তা একরূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরিত হয় মাত্র। তুমি দুই হাতের তালু একত্র করে কয়েকবার জোরে জোরে ঘষো। দেখবে তোমার হাত গরম হয়ে গেছে। ঘষার সময় শব্দও শুনতে পাবে। হাত ঘষাটা এক রকম কাজ করা, এর জন্য তোমার পেশি শক্তি বা যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার করতে হয়েছে। এই শক্তি তুমি পেয়েছ তোমার খাদ্যের রাসায়নিক শক্তি থেকে। সুতরাং এখানে রাসায়নিক শক্তি প্রথমে রূপান্তরিত হয়েছে যান্ত্রিক শক্তিতে, তারপর যান্ত্রিক শক্তি রূপান্তরিত হয়েছে তাপ শক্তি ও শব্দ শক্তিতে। এই রকম এক শক্তি থেকে আরেক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। কয়লা বা তেল পোড়ালে তার রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই তাপ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় রেলগাড়ি বা মোটরগাড়ি চলার সময়। তাপ শক্তি থেকে আবার উৎপাদন করা যায় বিদ্যুৎ শক্তি। বৈদ্যুতিক বাতি যখন জ্বালাই তখন বিদ্যুৎ আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। রেডিও স্টেশনে যখন কোনো শিল্পী গান করেন তখন শব্দ শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তোমার রেডিওতে তুমি যখন সেই গান শুনছো তখন আবার সেই বৈদ্যুতিক শক্তি শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

শক্তির নিত্যতা

শক্তি এক রূপ থেকে আরেক রূপে রূপান্তরের সময় কি কিছু শক্তি খরচ হয়ে যায়? না, বিস্ময়কর মনে হলেও শক্তির কোনো ক্ষয় বা বিনাশ নেই। শক্তির রূপান্তরের পূর্বে বা পরে মোট শক্তির পরিমাণ সমানই থাকে, এক রূপে অথবা অন্য রূপে। প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে এই বিশ্বজগতে মোট শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট। এর চাইতে বেশি শক্তি সৃষ্টিও করা যায় না। যে শক্তি রয়েছে তা বিনাশও করা যায় না। শুধুমাত্র একরূপ থেকে অন্য এক বা একাধিক রূপে রূপান্তর করা যায়। একেই বলে শক্তির নিত্যতা।

সংক্ষেপে শক্তির নিত্যতা সূত্র আমরা এভাবে বলতে পারি বিশ্বজগতে শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। শক্তি সৃষ্টি বা বিনাশ করা যায় না, কেবলমাত্র একরূপ থেকে অন্য এক বা একাধিক রূপে রূপান্তর করা যায়।

শক্তির উৎস

শক্তি পাই কোথা থেকে?

এই যে অতি প্রয়োজনীয় শক্তি, এই শক্তি, আমরা কোথা থেকে পাই? তুমি বা যে কোনো মানুষ তার শক্তি পায় খাদ্য থেকে। আর কলকারখানা বা গাড়ির শক্তি আসে জ্বালানি থেকে। তাহলে খাদ্য বা জ্বালানি আসে কোথা থেকে?

পৃথিবীর অধিকাংশ শক্তির উৎস হচ্ছে সূর্য। আলো এবং তাপ আকারে সূর্য থেকে শক্তি আসে। এই সূর্যের আলো খাদ্য উৎপাদনে কাজে লাগে। উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহের বৃদ্ধি ঘটে এই খাদ্যের সাহায্যে। আর কয়লা, তেল, গ্যাস বা পেট্রোল তৈরি হয়েছে লক্ষ লক্ষ বৎসর আগের গাছপালা এবং প্রাণীর অবশিষ্টাংশ থেকে। গাছপালা বা জীবজন্তু মারা যাবার পর লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকার পর কয়লা, গ্যাস বা তেলে পরিণত হয়। আবার এই কয়লা, তেল বা গ্যাস পুড়িয়েই উৎপাদন করা হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্যুৎ শক্তি।

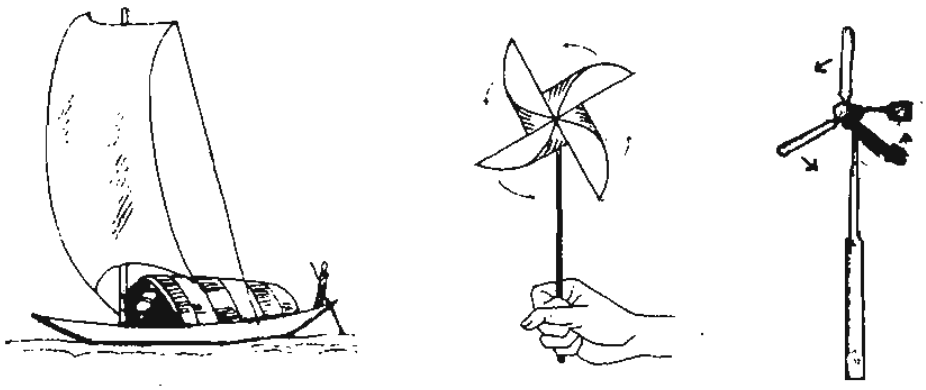

চিত্র ১১.২: বায়ু থেকে শক্তি– নৌকা চলা, উইন্ডমিল

বায়ু থেকেও শক্তি পাওয়া যায়। বায়ুর যে কত শক্তি তা বোঝা যায় ঘূর্ণিঝড়ের সময়। গাছপালা, বাড়িঘর সব উপড়িয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে বায়ুর শক্তি। ঝড়ের সময় বায়ুর শক্তি অবশ্য ধ্বংসই করে। তা কোনো কাজে লাগে না। কিন্তু অন্য সময়ে বায়ুর শক্তিকে ব্যবহার করা যায়। নৌকা যখন পাল তুলে যায় তখন বায়ুর শক্তি দিয়েই চলে। বায়ু দিয়ে পাখা ঘোরান যায় তা দিয়ে আবার ঘোরান যায় ধান বা গম ভাঙানো চাকতি। প্রায় দুই বা তিনশ বৎসর আগে ইউরোপের অনেক দেশে বায়ু চালিত এক ধরনের কল ছিল যা দিয়ে তারা গম পিষত। এই কল বা মিলের নাম উইন্ডমিল (ইংরেজি Wind শব্দের অর্থ বাতাস)। উইন্ড মিল দিয়ে বিদ্যুৎও উৎপন্ন করা যায়। কয়লা বা তেল পুড়িয়ে আরো সহজে এবং সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায় বলে উইন্ডমিল এখন আর তেমন ব্যবহার করা যায় না।

পানি, শক্তির আর একটি প্রধান উৎস। পানির স্রোত কাজে লাগিয়েও পাখা বা চাকা ঘোরান যায়। নদীতে বাঁধ দিয়ে পানির উচ্চতা অনেক উঁচুতে তোলা যায়। তারপর বাঁধ কিছুটা খুলে দিলে প্রবল বেগে পানি নিচে পড়তে থাকে। এর থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। এইভাবে উৎপন্ন বিদ্যুৎকে বলে পানি বিদ্যুৎ। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাইয়ে পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে।

নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য শক্তি

তোমরা জানলে যে কয়লা, তেল, গ্যাস, সূর্য, পানি বা বাতাস থেকে আমরা শক্তি পাই। যে পরিমাণ কয়লা, তেল, বা গ্যাস পুড়িয়ে শক্তি উৎপন্ন করা হয়, সে পরিমাণ খরচ হয়ে যাচ্ছে। তা আর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। পৃথিবীতে এগুলোর পরিমাণ অফুরন্ত নয়। ব্যবহার করতে করতে একদিন হয়ত শেষ হয়ে যাবে। কয়লা, তেল বা গ্যাসকে বলা হয় অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎস। অপরপক্ষে সূর্য রশ্মি, বায়ু বা পানির শেষ নেই। বারবার তা ব্যবহার করা যায়। এসবকে বলা হয় নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস। সমুদ্রস্রোত এবং জোয়ার ভাটাকে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

সংক্ষেপে আমরা যা জানলাম :

- শক্তির প্রধান উৎস হল সূর্য।
- শক্তির অন্যান্য উৎস হল কয়লা, গ্যাস, তেল বা পেট্রোল, পানি এবং বায়ু।
- সূর্য, পানি এবং বায়ু নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস।
- কয়লা, গ্যাস ও তেল অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎস।

বিশ্বে এখন পর্যন্ত অনবায়নযোগ্য উৎস থেকেই অধিকাংশ শক্তি উৎপন্ন করা হচ্ছে। কারণ এটাই সহজ এবং কম খরচে করা যায়। শক্তির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। তাই কয়লা, তেল ও গ্যাস দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। বিজ্ঞানীরা সেইজন্য কম খরচে এবং সহজে কী করে নবায়নযোগ্য উৎস, বিশেষ করে সূর্য রশ্মি থেকে ব্যবহার উপযোগী শক্তি উৎপাদন করা যায় তার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতের শক্তি হয়ত নবায়নযোগ্য উৎস থেকেই পাওয়া যাবে। কিন্তু কত দিনে তা

সম্ভব হবে তা কেউ বলতে পারে না। তাই শক্তির যাতে অপচয় না হয় সে দিকে সবার দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আমাদের দেশে কয়লা বা তেল নেই বললেই চলে। আছে কিছু গ্যাস। এই গ্যাস তোমাদের অনেকের বাসাতেই রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। গ্যাসের চুলা বিনা কারণে জ্বালিয়ে রেখে যাতে গ্যাসের অপচয় না হয় সেদিকে তোমরা অবশ্যই দৃষ্টি রাখবে। বিনা প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে বা পাখা চালিয়ে রাখবে না।

এ অধ্যায়ের নতুন শব্দ

কাজ	জুল	নবায়নযোগ্য শক্তি
শক্তি	ওয়াট	অনবায়নযোগ্য শক্তি
ক্ষমতা	শক্তির নিত্যতা	

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. শক্তির এককের নাম কী ?

ক. নিউটন খ. জুল
গ. ওয়াট ঘ. মিটার।

২. কোনটি নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস ?

ক. কয়লা খ. গ্যাস
গ. তেল ঘ. সূর্য।

৩. তোমার এবং তোমার এক বন্ধুর ওজন প্রায় সমান। ১০০ মিটার দৌঁড়াতে তোমার সময় লেগেছে ২০ সেকেন্ড। তোমার বন্ধুর লেগেছে ২৫ সেকেন্ড। কোনটি ঠিক ?

ক. তোমার বল বেশি খ. তোমার ক্ষমতা বেশি
গ. তোমার শক্তি বেশি ঘ. তোমার কাজ করার পরিমাণ বেশি

৪. এক ব্যক্তি ১০ সেকেন্ডে ২৫ জুল কাজ করতে পারে। ব্যক্তিটির ক্ষমতা কত ওয়াট ?

ক. ২.৫ খ. $\frac{২}{৫}$
গ. ২৫০ ঘ. ৫০

৫. কোন শক্তি রূপান্তরের ফলে তবলা বাজিয়ে শব্দ শক্তি পাওয়া যায় ?

ক. তাপ খ. রাসায়নিক
গ. বৈদ্যুতিক ঘ. যান্ত্রিক

৬. মাটি থেকে ১০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত একটি আম মাটিতে পতিত হল। ৫ মিটার উচ্চতায় পড়ন্ত আমটির ক্ষেত্রে

i. গতি শক্তি স্থিতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে
ii. স্থিতি শক্তি গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে
iii. শক্তির কোন রূপান্তর ঘটবে না।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৭. ৬নং প্রশ্নের বিবৃতি থেকে আমটি মাটিতে পতিত হলে আমটির

ক. স্থিতি ও গতিশক্তি থাকবে না
খ. স্থিতি শক্তি থাকবে
গ. গতি শক্তি থাকবে
ঘ. যান্ত্রিক শক্তি থাকবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

নির্মাণ শ্রমিক রহিম ভূমি হতে ১৫ মিটার উপরে একসাথে ২০টি ইট ২ মিনিটে ওঠাতে পারে। কিন্তু বারেকের একই উচ্চতায় ২০টি ইট ওঠাতে ৩ মিনিট সময় লাগে। প্রতিটি ইটের ওজন ১ নিউটন।

ক. মিটার কিসের একক?
খ. উপরের ঘটনায় কীভাবে কাজ হচ্ছে ব্যাখ্যা কর।
গ. বারেকের কাজের হিসাব কর।
ঘ. রহিম ও বারেকের মধ্যে কার ক্ষমতা বেশি বলে তুমি মনে কর। গাণিতিক যুক্তি দাও।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিদ্যুৎ শক্তি

বিদ্যুৎ আমাদের সকলের কাছেই পরিচিত। দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যুতের প্রয়োগ দেখা যায়। বিদ্যুতের সাহায্যে বাড়িঘর, অফিস আদালত, দোকানপাটে আলো জ্বলে, পাখা ঘোরে। কলকারখানা বিদ্যুৎ দিয়ে চলে। আমরা যে রেডিওতে গান শুনি, টেলিভিশনে ছবি দেখি, টেলিফোনে দূরের কারো সাথে কথা বলি তা সম্ভব হয়েছে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলেই। অনেক দেশে যাতায়াতের জন্য ট্রাম ও ট্রেন বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। এসবই বিভিন্ন ধরনের কাজ। অর্থাৎ বিদ্যুতের কাজ করার সামর্থ রয়েছে। সুতরাং বিদ্যুৎ এক প্রকার শক্তি।

বিদ্যুৎ আবিস্কারের কাহিনী

সে প্রায় ২৬০০ বছর আগেকার কথা। গ্রিস দেশের মিলেটাস নামক স্থানে থেলিজ নামে একজন জ্ঞানী লোক বাস করতেন। তিনি প্রথম লক্ষ করেন যে অ্যাম্বর নামক পাইন গাছের শক্ত হলদেটে আঠাকে পশম দিয়ে ঘষলে তা কাগজের ছোট টুকরা বা কাঠের গুঁড়া জাতীয় হালকা বস্তুকে আকর্ষণ করে। তিনি একটি মজার খেলা হিসেবে বন্ধু বান্ধবদের আনন্দ দানের জন্য এটি দেখাতেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে তিনি আসলে বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেছেন, যা পরবর্তীকালে বিশ্বে এক বিপ্লব সৃষ্টি করবে। এরপরও প্রায় ২২০০ বৎসর অতিবাহিত হয়। কেউ বিষয়টি নিয়ে তেমন কোনো চিন্তাভাবনা করেছেন বলে জানা যায় না। প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে উইলিয়াম গিলবার্ট নামে একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন যে শুধু অ্যাম্বর নয় আরো অনেক পদার্থ রয়েছে যাদের ঘষলে তারা কাগজের ছোট টুকরার মত হালকা বস্তুকে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে এক অদৃশ্য শক্তি উৎপন্ন হয়। গ্রিক ভাষায় অ্যাম্বর এর প্রতিশব্দ ইলেকট্রন (Electron)। তার থেকে গিলবার্টই প্রথম পদার্থের এই ধর্মের নাম দেন ইলেকট্রিসিটি (Electricity) যার বাংলা প্রতিশব্দ 'বিদ্যুৎ'। গিলবার্টের এই আবিষ্কারের পর থেকেই বিদ্যুৎ নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা শুরু করেন।

স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় ঘর্ষণে

পরীক্ষা : একটি প্লাস্টিক অথবা রাবারের চিরুনি নাও। তোমার চুল যদি শুকনা থাকে তবে চিরুনিটি দিয়ে কয়েকবার জোরে জোরে চুল আঁচড়াও। চিরুনিটি এখন খুব ছোট ছোট কাগজের টুকরার কাছে ধরলে দেখা যাবে সেটা কাগজের টুকরাকে আকর্ষণ করছে। তোমার চুল শুকনা না থাকলে একটি উলের কাপড় দিয়ে চিরুনিটা ঘষেও এই পরীক্ষা করা যায়।

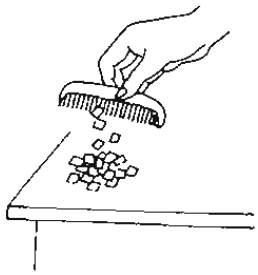

চিত্র ১২.১: ঘর্ষণে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়

একটি কাচের দন্ড বা বোতলকে সিল্কের কাপড় দিয়ে ঘষলে অথবা একটি গালার দন্ডকে পশম দিয়ে ঘষলেও দেখা যায় তারা এ রকম ছোট ছোট কাগজের টুকরা, কর্কের (শোলার) টুকরা, পাখির পালক, মুড়ি ইত্যাদি হালকা বস্তুকে আকর্ষণ করে। এর থেকে বোঝা যায় যে, কতকগুলো বিশেষ বস্তুকে অন্য কতকগুলো বিশেষ বস্তু দিয়ে ঘর্ষণ করলে তাদের মধ্যে আকর্ষণ করার শক্তি উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানীরা এই অদৃশ্য শক্তির নাম দিয়েছেন বিদ্যুৎ শক্তি। এই বিদ্যুৎ যেখানে উৎপন্ন হয় সাধারণত সেখানেই স্থির থাকে বলে একে স্থির বিদ্যুৎ বলে। আবার ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন হয় বলে এই বিদ্যুৎকে ঘর্ষণ বিদ্যুৎও বলে।

সুতরাং স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় বিশেষ ধরনের কয়েকটি পদার্থকে পরস্পরের সঙ্গে ঘর্ষণ করলে। কাচ, রাবার, প্লাস্টিক, গাটাপার্চা, গালা, এবোনাইট ইত্যাদি পদার্থকে পশম, সিল্ক ইত্যাদি দিয়ে ঘর্ষণ করে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। স্থির বিদ্যুতের আকর্ষণ ক্ষমতা দেখার জন্য কর্ক বা শোলার ছোট টুকরা, শুকনো চুল, কাগজের টুকরা, মুড়ি বা খই জাতীয় হালকা জিনিস নেওয়া যায়।

চার্জ কী : ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জ

পরীক্ষা : একটা কাচের দন্ডকে সিল্কের কাপড় দিয়ে ঘষে একটি সিল্কের সুতা দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো (চিত্র ১২.২)।

আরেকটি কাচ দণ্ডকে একইভাবে সিল্কের কাপড় দিয়ে ঘষা হল। এই দণ্ডটিকে এবার প্রথম দণ্ডের যে প্রান্ত সিল্ক দিয়ে ঘষা হয়েছিল সেই প্রান্তের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। দেখা যাবে, ঝোলানো দণ্ডটির সেই প্রান্ত দূরে সরে গেছে। অর্থাৎ দণ্ড দুটি একে অপরকে বিকর্ষণ করে। এবার একটি শক্ত রাবারের দণ্ডকে পশমী কাপড় দিয়ে ঘষে ঝোলানো কাচ দণ্ডের একই প্রান্তের কাছে আনা হল। দেখা যাবে তাদের মধ্যে আকর্ষণ হচ্ছে। এরপর আরেকটি রাবারের দণ্ডকে পশম দিয়ে ঘষে সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। প্রথম রাবারের দণ্ডটি দ্বিতীয় ঝুলন্ত দণ্ডটির কাছে আনা হল। দেখা যাবে তাদের মধ্যে বিকর্ষণ হচ্ছে।

এই ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য বলা হয় যে ঘর্ষণের ফলে কাচের বা রাবারের দণ্ডে একটি বৈদ্যুতিক চার্জ সঞ্চারিত হয়। দণ্ড দুটির চার্জ একে অপরের উপর বল প্রয়োগ করে। স্পষ্টতই কাচ দণ্ডের চার্জ এবং রাবার দণ্ডের চার্জ এক রকম নয়। প্রায় ২৫০ বছর পূর্বে বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন কাচ দণ্ডকে সিল্ক দিয়ে ঘর্ষণ করলে কাচ দণ্ডে যে চার্জের সঞ্চার হয় তার নাম ধনাত্মক (+) চার্জ এবং রাবার দণ্ডকে পশম দিয়ে ঘর্ষণ করলে তাতে যে চার্জের সঞ্চার হয় তার নাম ঋণাত্মক (–) চার্জ দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত এই নামই চালু রয়েছে। কোনো অজানা চার্জ ধনাত্মক না ঋণাত্মক তা জানা যায় একটি চার্জিত কাচ দণ্ড অথবা চার্জিত রাবার দণ্ডের সাথে তুলনা করে।

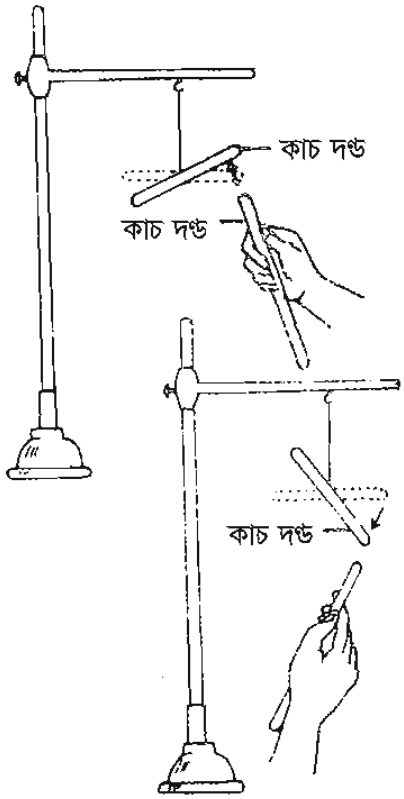

চিত্র ১২.২ চার্জের ধর্ম আকর্ষণ ও বিকর্ষণ

চার্জ আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু চার্জের প্রভাব আমরা দেখতে পাই। যেমন দুটি চার্জিত বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে তা আমরা দেখতে পাই। এই প্রভাব দেখেই চার্জের অস্তিত্ব আমরা বুঝতে পারি।

সুতরাং, আমরা যা জানলাম–

- যার উপস্থিতিতে এক বস্তু অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা লাভ করে অর্থাৎ বস্তুতে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাকে চার্জ বলে।
- ঘর্ষণের ফলে কোনো বস্তুতে চার্জ উৎপন্ন হলে বস্তুটিকে চার্জিত বস্তু বলে।
- বিদ্যুৎ শক্তির কারণ হল চার্জ। চার্জের ফল হল বিদ্যুৎ।
- চার্জ দুই প্রকার–ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জ।

চার্জের ধর্ম–আকর্ষণ ও বিকর্ষণ

উপরের পরীক্ষায় আমরা দেখেছি যে, সিল্ক দিয়ে ঘষার পর দুটি কাচ দণ্ড পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। আবার, পশম দিয়ে ঘষার পর দুটি রাবার দণ্ডও পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। কিন্তু কাচ দণ্ড এবং রাবার দণ্ড পরস্পরকে আকর্ষণ করে। আমরা আরও জেনেছি যে কাচ দণ্ডের চার্জ ধনাত্মক এবং রাবার দণ্ডের চার্জ ঋণাত্মক। অর্থাৎ কাচ দণ্ড দুটির একই জাতীয় ধনাত্মক চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, রাবার দণ্ড দুটির অন্য জাতীয় ঋণাত্মক চার্জও পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। কিন্তু কাচ দণ্ডের ধনাত্মক চার্জ, রাবার দণ্ডের ঋণাত্মক চার্জকে আকর্ষণ করে। সুতরাং সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে–

১। সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।

২। বিপরীতধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

স্থির বিদ্যুৎ ও চল বিদ্যুৎ

তোমরা জেনেছ যে একটি প্লাস্টিকের চিরুনিকে উলের কাপড় দিয়ে ঘষলে তাতে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই স্থির বিদ্যুৎ কি সব সময়ই স্থির ? এ প্রশ্নের জবাব পাবে ছোট একটি পরীক্ষা করে।

পরীক্ষা : একটি প্লাস্টিকের চিরুনিকে উলের কাপড় দিয়ে ঘর্ষণ কর। চিরুনিটি ছোট কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করবে। অর্থাৎ তার মধ্যে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েছে। এবার লোহা বা তামা, পিতল জাতীয় কোনো ধাতব পদার্থ অথবা তোমার হাত দিয়ে চিরুনিটি স্পর্শ কর। কাগজের টুকরোর কাছে চিরুনিটি আবার নিয়ে এসো। দেখবে সেটি আর কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করছে না। এর থেকে কী বোঝা যায়? বোঝা যায় যে চিরুনিতে আর বিদ্যুৎ নেই। বিদ্যুৎ কোথায় গেল? ধাতব পদার্থ বা হাতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এই বিদ্যুৎ চিরুনি থেকে অন্যত্র চলে গেছে। এই রকম যে বিদ্যুৎ কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে চলে যায় তাকে চল বিদ্যুৎ বলে। আমরা সব সময় যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি বাতি জ্বালাতে, পাখা ঘোরাতে, কলকারখানা চালাতে, টর্চলাইট জ্বালাতে তা হচ্ছে চল বিদ্যুৎ।

একটি টর্চ বা বৈদ্যুতিক বাতির সুইচ টিপলে বাল্বের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। ফলে বাতি জ্বলে। যতক্ষণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় ততক্ষণ বাতি জ্বলে। সুইচ বন্ধ করে দিলে বিদ্যুৎ প্রবাহ থেমে যায়। বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হলে বিদ্যুৎ প্রবাহ বজায় রাখতে হবে।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঘর্ষণের ফলে কোনো বস্তুতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ বা চার্জ উৎপন্ন হয়। হাত বা ধাতব পদার্থ দিয়ে স্পর্শ করলে এই চার্জ সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে চলে যায়। চার্জ ফুরিয়ে যাবার ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এভাবে ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহ বজায় রাখার জন্য তাই অবিরাম বিদ্যুৎ সরবরাহের কোনো উৎস থাকতে হবে। চল বিদ্যুতের উৎস সম্পর্কে তোমরা একটু পরেই জানবে।

সুতরাং আমরা জানলাম যে, বিদ্যুৎ দুই প্রকার স্থির বিদ্যুৎ ও চল বিদ্যুৎ।

(১) স্থির বিদ্যুৎ : যে বিদ্যুৎ কোনো বস্তুতে আবদ্ধ বা স্থির থাকে তাকে স্থির বিদ্যুৎ বলে।

(২) চল বিদ্যুৎ : যে বিদ্যুৎ কোনো বস্তুর মধ্য দিয়ে অবিরাম কোনো নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয় তাকে চল বিদ্যুৎ বলে।

বিদ্যুৎ পরিবাহী ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী পদার্থ

সকল পদার্থের ভিতর দিয়েই কি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আর একটি ছোট পরীক্ষা করতে হবে।

পরীক্ষা : প্লাস্টিকের চিরুনিকে উল দিয়ে ঘষে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার পর একটি কাঠ, কাচ, চীনামাটি বা প্লাস্টিকের টুকরা দিয়ে চিরুনিটা স্পর্শ করা হল। চিরুনিটা এখন কাগজের টুকরার কাছে নিলে দেখা যাবে যে সেটা তখনও কাগজের টুকরাকে আকর্ষণ করছে। এর থেকে কী বোঝা যায়? বোঝা যায় যে চিরুনির বিদ্যুৎ চিরুনিতে রয়ে গেছে অর্থাৎ কাঠ, কাচ, চীনামাটি বা প্লাস্টিকের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে অন্য কোথাও চলে যায়নি। এসব পদার্থের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না। অপর পক্ষে এর আগে আমরা দেখেছি যে, লোহা, তামা বা পিতলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে। অর্থাৎ কোনো কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে এবং কোনো কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না। বিদ্যুৎ প্রবাহের উপর ভিত্তি করে পদার্থকে তাই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

১। বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থ : যে সমস্ত পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ সহজেই চলাচল করতে পারে তাদের বিদ্যুৎ

পরিবাহী বলে। যেমন লোহা, তামা, সোনা, রুপা ইত্যাদি ধাতব পদার্থ, মানব দেহ, মাটি, পারদ, আর্দ্র বাতাস এবং পানিও বিদ্যুৎ পরিবহণ করে।

২। বিদ্যুৎ অপরিবাহী পদার্থ : যে সমস্ত পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না তাদের বিদ্যুৎ অপরিবাহী বা অন্তরক বলে। যেমন কাচ, কাঠ, চীনামাটি, প্লাস্টিক, কাগজ, রেশম, রাবার, এবোনাইট, শুকনা বাতাস।

তোমরা এখন একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবে যে ঘর্ষণের ফলে যে সব পদার্থে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সেসব পদার্থ বিদ্যুৎ অপরিবাহী। সেই কারণেই বিদ্যুৎ যেখানে উৎপন্ন হয় সেখানে স্থির থাকে। যদি পরিবাহী হতো তাহলে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হবার পর তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অন্যত্র চলে যেত। সাধারণত হাত দিয়ে বস্তুটি ধরা থাকে। তাই হাত এবং দেহের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ মাটিতে চলে যায়। এই জন্যই কোনো ধাতব পদার্থকে পশম বা রেশম দিয়ে ঘষলে তাতে কোনো বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় না বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন বিজ্ঞানী বেন্‌জামিন ফ্রাঙ্কলিন পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, কাচ বা রাবারের হাতলযুক্ত ধাতব দণ্ডকে পশমী কাপড় দিয়ে ঘষলে তাতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। উপযুক্ত উপায়ে ঘর্ষণ দ্বারা সব বস্তুতেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। স্থির বিদ্যুৎ পরিবাহীর সংস্পর্শে এলে তা চল বিদ্যুতে পরিণত হয়।

চল বিদ্যুৎ এর উৎস

তোমাদের বাড়িতে বা স্কুলে বৈদ্যুতিক সংযোগ থাকলে একটি সুইচ টিপলেই বাতি জ্বলে ওঠে। আবার টর্চ লাইটের সুইচ টিপেও আলো জ্বালানো যায়। উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যুৎ শক্তিকে আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু বাড়ির বিদ্যুতের উৎস এবং টর্চ লাইটের বিদ্যুতের উৎস এক নয়। বাড়িতে অনেক দূর থেকে তার টেনে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেয়া হয়। আর টর্চে হয়ত দুই বা তিনটি ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে। টর্চ লাইটের বিদ্যুতের উৎস হচ্ছে ব্যাটারি বা বৈদ্যুতিক কোষ। আর বাড়ির বিদ্যুৎ আসে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে যে যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তার নাম জেনারেটর। বৈদ্যুতিক জেনারেটর এবং বৈদ্যুতিক কোষ আমাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুতের উৎস। বৈদ্যুতিক কোষে রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা হয়। আর বৈদ্যুতিক জেনারেটরে যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা হয়।

রাসায়নিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করে বিদ্যুৎ প্রবাহ বজায় রাখার কোনো ব্যবস্থাকেই বিদ্যুৎ কোষ বলে।

বিদ্যুৎ কোষে একটি রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে দুটি ধাতব পদার্থ আংশিক ডোবান থাকে। ধাতুর সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে একটি ধাতব পদার্থে ধনাত্মক অন্যটিতে ঋণাত্মক চার্জের আধিক্য ঘটে। একটি বিদ্যুৎ পরিবাহী তার দিয়ে ধাতব পদার্থ দুটি যুক্ত করলে তার দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

অনেক রকম বিদ্যুৎ কোষ রয়েছে। আমরা সচরাচর যে কোষ ব্যবহার করি তাকে বলে শুষ্ক বা নির্জলা কোষ। সাধারণ মানুষের কাছে এই কোষ টর্চ ব্যাটারি নামে পরিচিত। বিভিন্ন আকারের এই কোষ টর্চ লাইট,

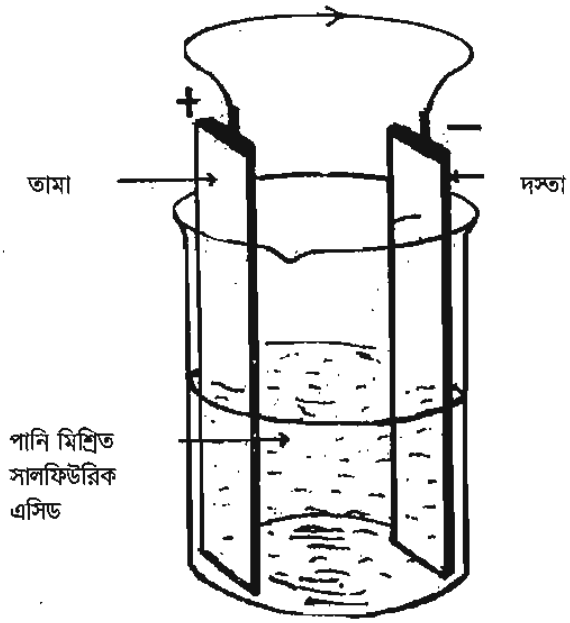

চিত্র ১২.৩: সাধারণ বিদ্যুৎ কোষ

রেডিও, টু–ইন–ওয়ান, ঘড়ি, ক্যালকুলেটর ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়।

মোটর গাড়িতে অথবা মাইক ব্যবহারের সময় আরেক ধরনের কোষ তোমরা দেখেছ। এগুলো টর্চ ব্যাটারি থেকে দেখতে অন্য রকম, আকার বড় এবং ভারী। এদের সঞ্চায়ক কোষ বলে। এই কোষে প্রথমে বাইরের কোনো উৎস থেকে রাসায়নিক পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে বিদ্যুৎ শক্তিকে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে সঞ্চিত করা হয়। এই সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তিকে আবার বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া যায়। এই কোষের সুবিধা এই যে, সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ফুরিয়ে গেলে আবার বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে রাসায়নিক শক্তি সঞ্চয় করা যায়। ফলে একই রাসায়নিক পদার্থ বারবার ব্যবহার করা যায়। বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করাকে ব্যাটারি চার্জ করা বলে। টর্চ ব্যাটারির রাসায়নিক শক্তি ব্যবহৃত হয়ে ফুরিয়ে গেলে তা আর চার্জ করা যায় না। ব্যাটারি ফেলে দিয়ে নতুন ব্যাটারি কিনতে হয়।

বিদ্যুৎ কোষের সুবিধা হচ্ছে তা আকারে ছোট, ফলে বহনযোগ্য। যে কোনো স্থানে তা ব্যবহার করা যায়। হাত ঘড়ি, ক্যালকুলেটর বা মোটর গাড়িতে ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ কোষ আদর্শ। কিন্তু যেখানে বেশি শক্তির প্রয়োজন সেখানে বিদ্যুৎ কোষ ব্যবহার করা যায় না। তখন প্রয়োজন হয় জেনারেটর থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের। বৈদ্যুতিক জেনারেটর দিয়ে লক্ষ লক্ষ ওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা যায়। এই বিদ্যুৎ তারের সাহায্যে শত শত কিলোমিটার দূরে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে হাজার হাজার বাড়ি ঘর এবং কলকারখানায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া যায়। যে নীতির উপর ভিত্তি করে জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় তা তোমরা উপরের ক্লাসে শিখবে।

বিদ্যুৎ চমকান, বজ্রপাত

বর্ষাকাল। আকাশে ঘন কালো মেঘের ঘনঘটা। হঠাৎ আকাশে দেখা গেল এক তীব্র আলোর ঝলকানি। একটু পরেই শোনা গেল কান ফাটানো আওয়াজ। এ অভিজ্ঞতা তোমাদের সকলেরই রয়েছে। আলোর ঝলকানিকে বলে বিদ্যুৎ চমকানো, আর প্রচণ্ড আওয়াজকে বলে মেঘের গর্জন।

বিদ্যুৎ চমকান কী?

বাতাসে রয়েছে পানির কণা, ধূলিকণা এবং বিভিন্ন রকম গ্যাসের কণা। এইসব কণার মধ্যে ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন হয় স্থির বিদ্যুৎ অর্থাৎ কণাগুলো চার্জিত হয়। এরূপ কোটি কোটি চার্জিত পানিকণা মিলে সৃষ্টি হয় মেঘ। এই মেঘ ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত হতে পারে। বাতাসের মধ্যে নানা প্রাকৃতিক কারণেও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে মেঘের জলকণার উপর জমতে থাকে। এভাবে মেঘে বিদ্যুতের পরিমাণ অত্যন্ত বেড়ে যায়। ফলে ধনাত্মক চার্জযুক্ত মেঘ এবং ঋণাত্মক চার্জযুক্ত মেঘের মধ্যে আকর্ষণের ফলে পরস্পরের সাথে প্রবল বেগে ঘর্ষণ হয় এবং একই সাথে তাপ, আলো এবং শব্দের সৃস্টি হয়। আলোর বেগ শব্দের বেগের চাইতে বহুগুণ বেশি বলে আমরা আলো আগে দেখি এবং শব্দ পরে শুনি। এই আলোর ঝলকানিকে বিদ্যুৎ চমকান বলে।

বজ্রপাত

অনেক সময় তীব্র চার্জযুক্ত মেঘ পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসে। তখন বিদ্যুৎক্ষরণ ঘটে বায়ুমণ্ডলকে ভেদ করে মেঘ এবং মাটির মধ্যে। একে বলা হয় বজ্রপাত। মাটির উপর যে জিনিস যত উঁচু সেই জিনিস মেঘের তত কাছে থাকে। তাই বজ্রপাত সাধারণত হয় উঁচু দালান বা গাছের মাথায়। এমনকি মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা কোন মানুষের মাথায়ও বজ্রপাত হতে পারে। বজ্রপাত হলে দালান ভেঙে যায়, গাছ বা মানুষ মরে যায়। ঝড় বৃষ্টির সময় তাই গাছের নিচে দাঁড়ান নিরাপদ নয়। বজ্রপাতের জন্য যে মেঘকে পৃথিবীর খুব কাছাকাছি আসতে হবে তার কোনো মানে নেই। চার পাঁচ কিলোমিটার দূর থেকেও বজ্রপাত হতে পারে। বজ্রপাতের সাথে যে শব্দ শোনা যায় তাকে বলে বজ্রনাদ। বজ্রপাতের কারণ যে মেঘের বিদ্যুৎ তা প্রথম আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন।

বজ্রনিরোধক দণ্ড

উঁচু দালান–কোঠাকে বজ্রপাতের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য দালানের সব চাইতে উঁচু স্থানে একটি ধাতুর তৈরি দণ্ড লাগান থাকে। এই দণ্ডের উপরের প্রান্ত ছাদ থেকে উঁচুতে থাকে এবং তীক্ষ্ম সূঁচাল। অপর প্রান্ত একটি মোটা ধাতুর তার দিয়ে মাটির নিচে পোঁতা থাকে। এই দণ্ডকে বজ্রনিরোধক দণ্ড বলে। দালানের অন্যান্য অংশ থেকে এই দণ্ড মেঘের কাছাকাছি থাকে। ফলে বজ্রপাত হলে তা এই দণ্ডের উপরেই পড়ে। দণ্ডটি ধাতব পদার্থের অর্থাৎ বিদ্যুৎ পরিবাহী। সুতরাং বজ্রপাতের বিদ্যুৎ দণ্ডের মধ্যে দিয়ে সরাসরি মাটিতে চলে যায়। ফলে দালানের ক্ষতি হয় না।

এই অধ্যায়ের নতুন শব্দ

ইলেকট্রন	চল বিদ্যুৎ
ধনাত্মক চার্জ	বিদ্যুৎ পরিবাহী
ঋণাত্মক চার্জ	বিদ্যুৎ অপরিবাহী
স্থির বিদ্যুৎ	বিদ্যুৎ কোষ

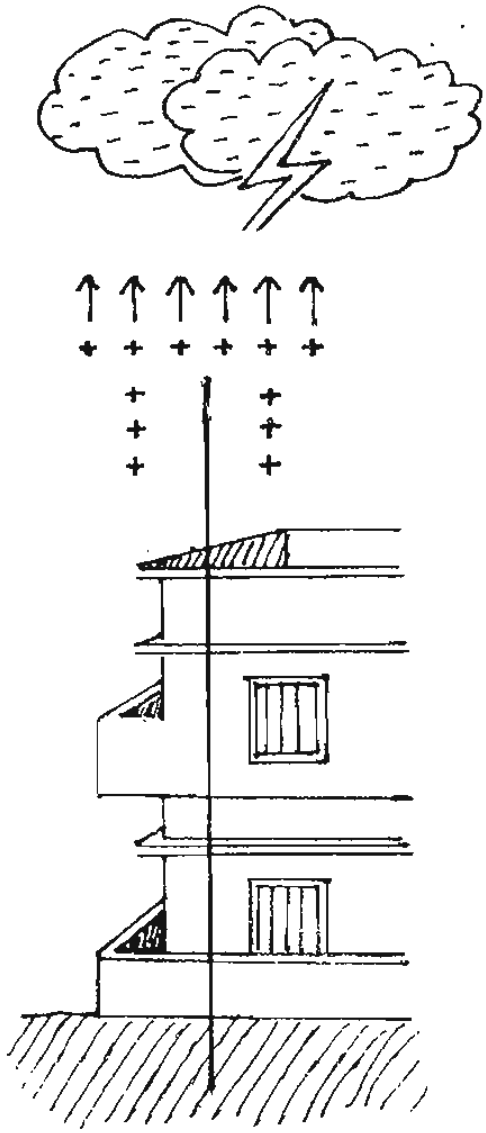

চিত্র নং ১২.৪ বজ্রনিরোধক দণ্ড

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. বিদ্যুৎ কোষে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়

ক. যান্ত্রিক শক্তি থেকে
খ. রাসায়নিক শক্তি থেকে
গ. তাপ শক্তি থেকে
ঘ. সূর্য শক্তি থেকে ।

২. দুটি বস্তুর মধ্যে বিকর্ষণ হলে নিশ্চিত বলা যায় যে

ক. দুটি বস্তুই চার্জিত
খ. একটি বস্তু চার্জিত, অপরটি নয়
গ. একটি বস্তু ধনাত্মক চার্জিত, অপরটি ঋণাত্মক চার্জিত
ঘ. উপরের কোনোটিই নয়।

৩. কোনটি চল বিদ্যুৎতের উৎস নয়

ক. ব্যাটারি
খ. আম্বর
গ. জেনারেটর
ঘ. বিদ্যুৎ কোষ

৪. বিদ্যুৎ চমকানোর কিছু পরে মেঘের গর্জনের শব্দ শোনা যায় কেন ?

ক. বিদ্যুতের বেগ বেশি
খ. শব্দের বেগ বেশি
গ. আলোর বেগ শব্দের বেগের চেয়ে বেশি
ঘ. আলোর বেগ শব্দের বেগের চেয়ে কম

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সিল্ক দিয়ে ঘষার পর দুইটি কাচ দণ্ড পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। আবার পশম দিয়ে ঘষার পর দুটি রাবার দণ্ড ও পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। কিন্তু কাচ দণ্ড ও রাবার দণ্ড পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

৫. কাচ দণ্ড ও রাবার দণ্ড পরস্পরকে আকর্ষণ করে কেন ?

ক. কাচ দণ্ডে ও রাবার দণ্ডে সমধর্মী চার্জ থাকে বলে
খ. কাচ দণ্ড চার্জিত ও রাবার দণ্ড চার্জহীন থাকে বলে
গ. কাচ ও রাবার দণ্ডে বিপরীত ধর্মী চার্জ থাকে বলে
ঘ. কাচ দণ্ড চার্জহীন এবং রাবার চার্জযুক্ত বলে

৬. নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. কাচ দণ্ড ধনাত্মক চার্জ যুক্ত
খ. রাবার দণ্ড ধনাত্মক চার্জ যুক্ত
গ. কাচ ঋণাত্মক চার্জ যুক্ত
ঘ. কাচ ও রাবার উভয়ই ধনাত্মক চার্জ যুক্ত

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

চিত্র ক

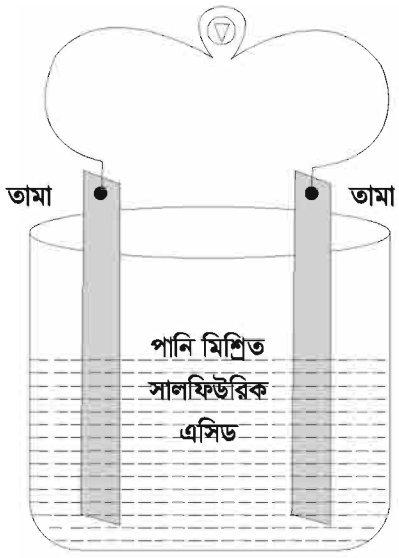

চিত্র খ

উপরের চিত্রের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক. চিত্র ক এর ব্যবস্থাকে কী বলা হয় ?

খ. চিত্র খ এর বাতিটি জ্বলছে না কেন ?

গ. বর্তনীর বিদ্যুৎ প্রবাহ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. গৃহে বিদ্যুৎ প্রবাহের ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যবস্থা কতটুকু উপযোগী তোমার মতামত দাও।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চুম্বক শক্তি

চুম্বক আবিষ্কারের কাহিনী

অনেক অনেক কাল আগেকার কথা। এশিয়া মাইনরের ম্যাগনেসিয়া নামক স্থানে ম্যাগনেস নামে এক রাখাল বালক বাস করত। ইডা নামে সেখানে এক পর্বত ছিল। ম্যাগনেসের একদিন শখ হল এই পর্বতে উঠবে। উঠতে যেয়ে দেখে যে পা আর মাটি থেকে তোলা যাচ্ছে না। জুতার পেরেকগুলি মাটির সাথে আটকে যাচ্ছে। সেই জায়গায় মাটি খুঁড়ে সে এক ধরনের পাথর পেল। দেখলো যে এই পাথর তার জুতার লোহার পেরেককে আকর্ষণ করে।

এভাবেই প্রথম এক অদ্ভুত ধরনের পাথরের সন্ধান পাওয়া যায়, যা লোহা বা লোহা জাতীয় পদার্থকে আকর্ষণ করে। এই পাথরের আরেকটি বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়। তা হল, একটি লম্বাটে পাথরকে শূন্যে ঝুলিয়ে দিলে সেটি সব সময় উত্তর–দক্ষিণ মুখ করে অবস্থান করে। ম্যাগনেসের নাম অনুসারে এই পাথরের নাম দেয়া হয় ম্যাগনেটাইট। কেউ কেউ অবশ্য বলেন ম্যাগনেসিয়া নামক স্থানে প্রথম পাওয়া যায় বলে ম্যাগনেটাইট নাম দেয়া হয়। ম্যাগনেটাইট শব্দ থেকে এসেছে ম্যাগনেট (Magnet) শব্দটি। ম্যাগনেটের বাংলা শব্দ চুম্বক। চুম্বক আবিষ্কারের এটিই প্রচলিত কাহিনী। এ ঘটনা কতদিন পূর্বের তা অবশ্য সঠিক জানা যায়নি। তবে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বেও চীন দেশে দিক নির্ণয়ের জন্য ছোট ছোট চুম্বক ব্যবহার করা হত বলে জানা যায়। চুম্বকের লোহাকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা আছে। আকর্ষণ এক প্রকার বল। বল দিয়ে কাজ করা যায়। অতএব, চুম্বকের কাজ করার সামর্থ রয়েছে। সুতরাং চুম্বক এক প্রকার শক্তি।

স্বাভাবিক ও কৃত্রিম চুম্বক

ম্যাগনেস যে চুম্বক পাথরের সন্ধান পেয়েছিল তা এক প্রকার ধূসর কালো বর্ণের যৌগিক পদার্থ। লোহা আর অক্সিজেনের যৌগ (রাসায়নিক সংকেত Fe_3O_4)। এই পাথর এশিয়া মাইনর ছাড়াও কানাডা, নরওয়ে ও সুইডেনের খনিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতিতে পাওয়া যায় বলে এদের বলা হয় প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক চুম্বক।

স্বাভাবিক চুম্বকের কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই। তাছাড়া এর চুম্বক শক্তি অর্থাৎ আকর্ষণ শক্তি খুব বেশি নয়। তাই কৃত্রিম উপায়েও চুম্বক তৈরি করা হয়। কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা হয় বলে এদের কৃত্রিম চুম্বক বলা হয়। কৃত্রিম চুম্বকের বৈশিষ্ট্য হল তা প্রয়োজন অনুযায়ী শক্তিশালী এবং কাজ করার জন্য সুবিধাজনক আকারের। কতকগুলো বিশেষ পদ্ধতিতে কৃত্রিম চুম্বক তৈরি করা হয়।

সুতরাং চুম্বক সাধারণত দুই প্রকার স্বাভাবিক চুম্বক ও কৃত্রিম চুম্বক।

প্রকৃতিতে যে চুম্বক পাওয়া যায় তাকে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক চুম্বক বলে।

কৃত্রিম উপায়ে তৈরি চুম্বককে কৃত্রিম চুম্বক বলে।

বিভিন্ন প্রকার কৃত্রিম চুম্বক

ব্যবহারের সুবিধার জন্য বিভিন্ন আকার এবং আকৃতির কৃত্রিম চুম্বক তৈরি করা হয়। আকার অনুযায়ী কয়েক প্রকার কৃত্রিম চুম্বক হল :

১। দণ্ড চুম্বক

আয়তাকার ইস্পাত দণ্ডকে চুম্বকে পরিণত করা হলে ঐ চুম্বককে দণ্ড চুম্বক বলে। পরীক্ষাগারে এই ধরনের চুম্বক ব্যবহার করা হয়।

২। শলাকা চুম্বক

এটা খুব হালকা ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরি। এর দুই প্রান্ত সূচাল। এই পাতটির মধ্যবিন্দু একটি পিনের উপর বসানো থাকে। তাই শলাকাটি আনুভূমিক তলে মুক্ত অবস্থায় নড়াচড়া করতে পারে। এর ফলে চুম্বক শলাকা সব সময় উত্তর ও দক্ষিণ মুখ করে অবস্থান করে। শলাকা চুম্বক দিক-নির্দেশক যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়।

৩। অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক

এই চুম্বক দেখতে ঘোড়ার ক্ষুরের মত বাঁকানো ইংরেজি U অক্ষরের মত বলে এর নাম এরূপ। এটি সাধারণত ইস্পাত দণ্ড দিয়ে তৈরি। এর দুটি মেরু পাশাপাশি থাকে। মেরু দুটির মধ্যে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যায়।

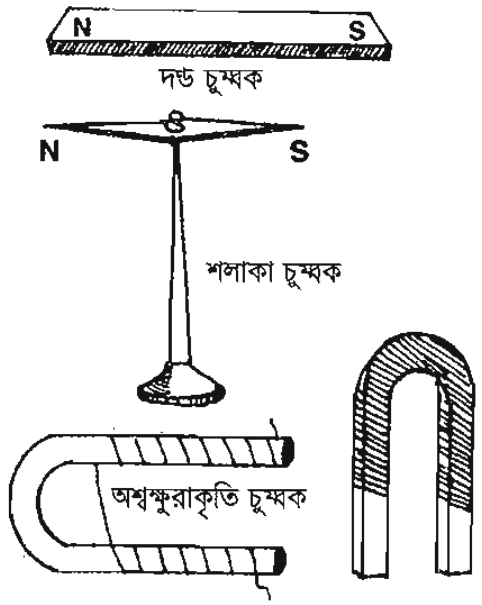

চিত্র ১৩.১: বিভিন্ন প্রকার চুম্বক

চুম্বকের ধর্ম : চুম্বকের মেরু

পরীক্ষা : টেবিলের উপর একটি সাদা কাগজে কিছু লোহার গুঁড়া ঘন করে ছিটিয়ে দাও। লোহার গুঁড়া না পেলে এক বাক্স আলপিন হলেও চলবে। একটি দণ্ড চুম্বক ছড়ানো লোহার গুঁড়া বা আলপিনের উপর রেখে কয়েকবার নাড়াচাড়া করে উঠিয়ে ফেল। দেখবে, লোহার গুঁড়া বা পিন চুম্বকের গায়ে লেগে রয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, চুম্বকের আকর্ষণী ক্ষমতা আছে। চুম্বকের এই আকর্ষণ করার ক্ষমতাকে তার আকর্ষণী ধর্ম বলে। এবার লক্ষ করলে দেখা যাবে লোহার গুঁড়া বা পিন বেশির ভাগ চুম্বকটির দুই প্রান্তে আটকে আছে। প্রান্ত থেকে যতই মাঝখানের দিকে যাওয়া যায় ততই লোহার গুঁড়া কমতে থাকে। মাঝামাঝি জায়গায় লোহার গুঁড়া বা পিন একেবারেই আটকায়নি। এর থেকে বোঝা যায়, চুম্বকের আকর্ষণী ক্ষমতা সব জায়গায় সমান নয়। দুই প্রান্তের কাছাকাছি দুই বিন্দুতে আকর্ষণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। এই দুটি বিন্দুকে চুম্বকের মেরু বলে।

দণ্ড চুম্বকটি থেকে লোহার গুঁড়া বা পিন ঝেড়ে ফেলে দাও। চুম্বকটি তোমার প্লাস্টিকের বলপেন, কাঠের পেন্সিল এবং দাগ তোলা রবারের সাথে একে একে ঠেকাও। দেখবে তাদের মধ্যে কোনো আকর্ষণ নেই। রুপা, তামা বা কাচের টুকরার কাছে চুম্বকটি নিয়ে এলেও দেখা যাবে এগুলো চুম্বকের গায়ে লেগে থাকছে না। এর থেকে বোঝা যায় যে চুম্বক সব ধরনের জিনিসকে আকর্ষণ করে না। চুম্বক লোহা জাতীয় যেমন ইস্পাত, কোবাল্ট ও নিকেল ধাতুকে আকর্ষণ করে। প্লাস্টিক, কাঠ, রবার, কাচ, রুপা বা তামাকে আকর্ষণ করে না।

চুম্বক যেসব পদার্থকে আকর্ষণ করে তাদের বলা হয় চৌম্বক পদার্থ। যেসব পদার্থকে আকর্ষণ করে না সেগুলোকে বলা হয় অচৌম্বক পদার্থ।

যে ধর্মের জন্য চুম্বক কোনো চৌম্বক পদার্থকে আকর্ষণ করে তাকে চুম্বকের আকর্ষণী ধর্ম বলে।

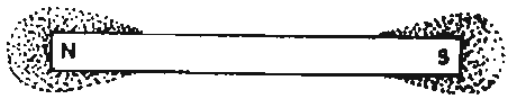

চিত্র ১৩.২: চুম্বকের আকর্ষণ ধর্ম

এবার দণ্ড চুম্বকটির মাঝখানে একটি সুতো দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দাও। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করার পর চুম্বকটি স্থির হবে। দেখা যাবে চুম্বকটি মোটামুটি উত্তর-দক্ষিণ বরাবর স্থির হয়ে আছে। চুম্বকটিকে আবার ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলে এদিক-ওদিক দুলে যখন স্থির হবে তখন আগের মতই উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে দাঁড়াবে। এর থেকে বোঝা যায় যে বাধাহীন ভাবে ঝুলন্ত কোনো চুম্বক সব সময় উত্তর-দক্ষিণ বরাবর মুখ করে থাকে। চুম্বকের এই ধর্মকে দিকদর্শী ধর্ম বলে। প্রাচীনকালে মানুষ ম্যাগনেটাইটের এই ধর্ম জানত। তাই নাবিকেরা সমুদ্রে দিক নির্ণয়ের জন্য ম্যাগনেটাইট পাথর ব্যবহার করত। এজন্য তারা এই পাথরের নাম রেখেছিল লিডিং স্টোন (Leading stone) বা দিকদর্শন পাথর।

চুম্বকের একটি বিশেষ প্রান্ত সব সময় উত্তর দিকে মুখ করে থাকতে চায়। এই প্রান্তকে বলা হয় উত্তর সন্ধানী মেরু বা সংক্ষেপে উত্তর মেরু। যে প্রান্ত সব সময় দক্ষিণ দিক মুখ করে থাকতে চায় তাকে বলা হয় দক্ষিণ সন্ধানী মেরু বা দক্ষিণ মেরু।

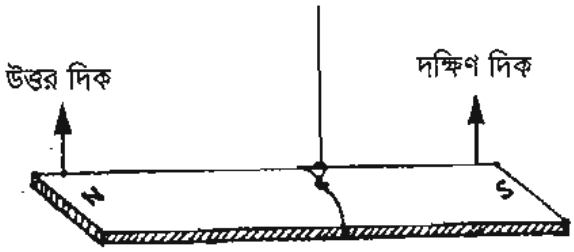

চিত্র ১৩.৩ চুম্বকের দিকদর্শী ধর্ম

এরপর দুটি দণ্ড চুম্বক নাও। একটি চুম্বক আগের মত একটি সুতা দিয়ে ঝুলিয়ে দাও। এবার অপর চুম্বকটির উত্তর মেরু এই চুম্বকের উত্তর মেরুর কাছে আন। দেখবে ঝুলানো চুম্বকটির উত্তর মেরু দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে বিকর্ষণ হচ্ছে। এবার দ্বিতীয় চুম্বকটির দক্ষিণ মেরু ঝুলানো চুম্বকের উত্তর মেরুর কাছে আন। দেখবে তারা একে অপরকে আকর্ষণ করছে। একই ভাবে, ঝুলন্ত চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর কাছে অপর চুম্বকের দক্ষিণ মেরু আনলে দেখা যাবে বিকর্ষণ হচ্ছে, আর উত্তর মেরু আনলে দেখা যাবে আকর্ষণ হচ্ছে।

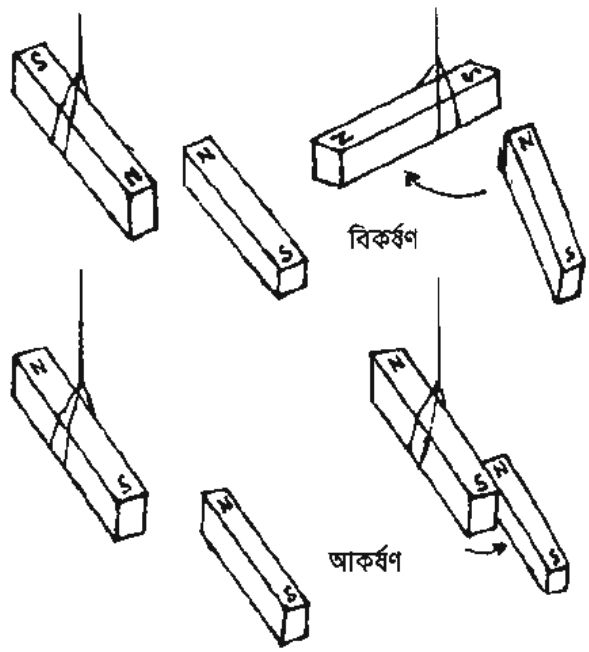

চিত্র ১৩.৪ চুম্বক মেরুর মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ

এবার একটি লোহার বা অন্য কোনো চৌম্বক পদার্থের দণ্ডকে প্রথমে ঝুলন্ত চুম্বকের উত্তর মেরু এবং পরে দক্ষিণ মেরুর কাছে আন। দেখবে উভয় ক্ষেত্রেই আকর্ষণ হচ্ছে। সুতরাং বোঝা গেল যে

- চুম্বকের সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।
- চুম্বকের বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।
- চুম্বকের দুই মেরুই চৌম্বক পদার্থকে আকর্ষণ করে।

চুম্বক প্রস্তুত পদ্ধতি

আগেই জেনেছ যে চুম্বক দুই প্রকার স্বাভাবিক চুম্বক এবং কৃত্রিম চৌম্বক। কৃত্রিম চুম্বক শুধুমাত্র চৌম্বক পদার্থ দিয়ে তৈরি করা যায়। চৌম্বক পদার্থকে কৃত্রিম চুম্বকে পরিণত করার পদ্ধতিকে চুম্বকন বা চুম্বকীকরণ বলে। কৃত্রিম চুম্বক প্রস্তুত করার দুটি সহজ পদ্ধতি এখন তোমরা শিখবে।

ঘর্ষণ পদ্ধতি

একটি ইস্পাতের দণ্ডকে চুম্বক দিয়ে ঘষে চুম্বকে পরিণত করা যায়। কখ একটি ইস্পাতের দণ্ড [চিত্র : ১৩.৫ (ক)]; দণ্ডটি টেবিলের উপর রেখে একটা শক্তিশালী দণ্ড চুম্বক দিয়ে ক প্রান্ত থেকে খ প্রান্ত পর্যন্ত একই দিকে বেশ কয়েকবার ঘষা হলো। প্রতিবারই খ পর্যন্ত ঘষে দণ্ড চুম্বকটি তুলে আবার ক প্রান্ত থেকে ঘষা শুরু করতে হবে।

ইস্পাত দণ্ডটি উল্টিয়ে নিয়ে একই ভাবে ক থেকে খ পর্যন্ত আরো কয়েকবার ঘষা হল। এখন দেখা যাবে যে ইস্পাত দণ্ডটি পিন বা কোনো লোহার টুকরাকে আকর্ষণ করছে। অর্থাৎ চুম্বকে পরিণত হয়েছে। দণ্ডটির ক প্রান্তে ঘর্ষণকারী চুম্বকের মেরুর সমমেরু ও খ প্রান্তে বিপরীত মেরুর সৃষ্টি হয়।

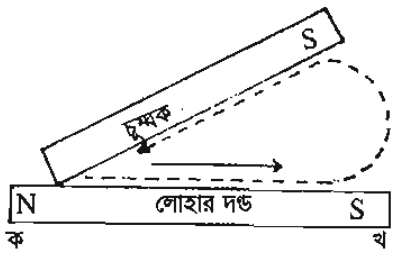

চিত্র ১৩.৫: (ক) ঘর্ষণ প্রক্রিয়ায় চুম্বক প্রস্তুতকরণ

বৈদ্যুতিক পদ্ধতি

একটি বড় লোহার পেরেক নিয়ে বাজারে যে প্লাস্টিকের আবরণ দেওয়া (অর্থাৎ বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থ দিয়ে মোড়া) সাধারণ বৈদ্যুতিক তার পাওয়া যায় সেই তার দিয়ে জড়ান হল। তারের দুই প্রান্ত একটি ব্যাটারির সাথে যুক্ত করলে তার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে। দেখা যাবে পেরেকটি পিন বা লোহার টুকরাকে আকর্ষণ করছে। পেরেকটি চুম্বকে পরিণত হয়েছে। ব্যাটারিটা এখন বিমুক্ত করলে দেখা যাবে যে পেরেকটির আকর্ষণ ক্ষমতা আর নেই। অর্থাৎ যতক্ষণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় পেরেকটির চুম্বকত্ব ততক্ষণ থাকে। যে কোনো কাচা লোহার দণ্ডকে এভাবে তার দিয়ে জড়িয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে অস্থায়ী চুম্বকে পরিণত করা যায়। এ ধরনের চুম্বককে বলে বৈদ্যুতিক চুম্বক। বৈদ্যুতিক চুম্বকের শক্তি বিদ্যুৎ প্রবাহের মাত্রার উপর নির্ভর করে। বিদ্যুৎ প্রবাহ বাড়ালে চুম্বকের শক্তিও বাড়ে।

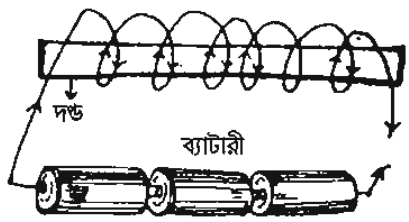

চিত্র ১৩.৫: (খ) বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা চুম্বক প্রস্তুতকরণ

চুম্বকের ব্যবহার

দৈনন্দিন জীবনে তোমরা অনেকেই হয়ত চুম্বক ব্যবহার করছো, কেউ জেনে, কেউ না জেনে। সুইচ টিপলে বৈদ্যুতিক পাখা ঘোরে, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজে। বৈদ্যুতিক পাখা এবং বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় বৈদ্যুতিক চুম্বক ব্যবহার করা হয়। এখানে চুম্বকের আকর্ষণী ধর্মকে কাজে লাগান হয়। চুম্বক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

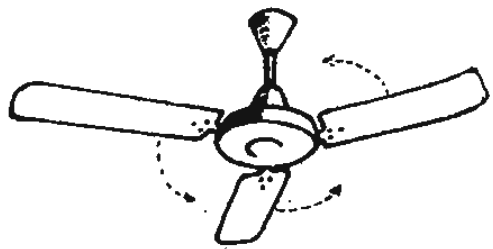

চিত্র ১৩.৬: বৈদ্যুতিক পাখা

প্রাচীনকালে নাবিকেরা চুম্বকের দিকদর্শী ধর্মকে কাজে লাগিয়ে সমুদ্রে দিক নির্ণয় করতো। এখনো তা করা হয়। এর জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় তার নাম দিক নির্ণয় যন্ত্র বা কম্পাস। কম্পাস শলাকা চুম্বক দিয়ে তৈরি করা হয়। বিশাল আকাশের মধ্য দিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় উড়োজাহাজও কম্পাস এর সাহায্যে দিক নির্ণয় করে।

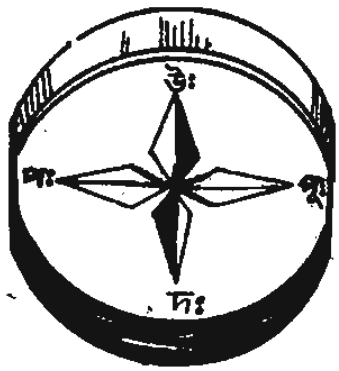

চিত্র ১৩.৭: কম্পাস

সুতরাং, তোমরা জানলে দৈনন্দিন জীবনে বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা এবং কম্পাস যন্ত্রে চুম্বক ব্যবহার করা হয়। চুম্বকের অন্যান্য অনেক ব্যবহার সম্পর্কে তোমরা পরে আরো জানবে।

এ অধ্যায়ের নতুন শব্দ

স্বাভাবিক চুম্বক
কৃত্রিম চুম্বক
অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক
আকর্ষণ
বিকর্ষণ
দিক নির্দেশক যন্ত্র
বৈদ্যুতিক চুম্বক
চৌম্বক পদার্থ
অচৌম্বক পদার্থ

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. চুম্বকের আকর্ষণ ক্ষমতা কোথায় বেশি ?
ক. চুম্বকের উত্তর মেরুতে
খ. চুম্বকের দক্ষিণ মেরুতে
গ. চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় মেরুতে
ঘ. চুম্বকের সকল জায়গাতেই সমান।

২. দুটি দণ্ড কাছাকাছি আনলে তাদের বিকর্ষণ হলে কোনটি ঠিক ?
ক. দুটি দণ্ডই চৌম্বক পদার্থ
খ. একটি চুম্বক, অপরটি চৌম্বক পদার্থ
গ. দুটি দণ্ডই অচৌম্বক
ঘ. দুটি দণ্ডই চুম্বক।

৩. যে সকল পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করে তাদের কী বলে?
ক. স্বাভাবিক চুম্বক
খ. কৃত্রিম চুম্বক
গ. চৌম্বক পদার্থ
ঘ. অচৌম্বক পদার্থ

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
লোহা, নিকেল, ইস্পাত, তামা ও দস্তার পাতকে একটি চুম্বকের নিকট নিলে কোনটিকে আকর্ষণ করে কোনটিকে করে না।

৪. উল্লিখিত ধাতুগুলোর মধ্যে কোনটিকে কৃত্রিম উপায়ে চুম্বকে পরিণত করা যায় না ?
ক. লোহা
খ. নিকেল
গ. তামা
ঘ. ইস্পাত

৫. বৈদ্যুতিক চুম্বক তৈরিতে উপরিউক্ত কোনটি ব্যবহৃত হয় ?
ক. ইস্পাত
খ. দস্তা
গ. নিকেল
ঘ. লোহা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

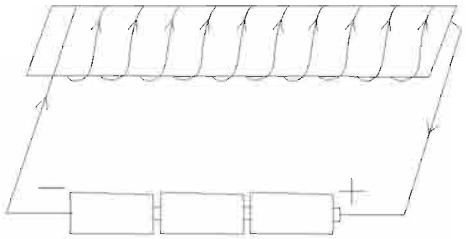

ক

চিত্র ক

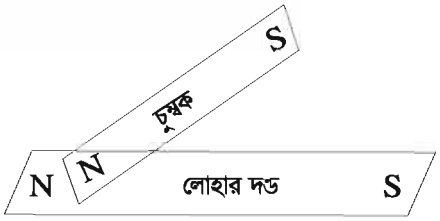

খ

চিত্র খ

ক. 'ক' বর্তনীতে কী ধরনের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে ?

খ. 'খ' চিত্রের কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর।

গ. 'ক' বর্তনীর বিদ্যুৎ প্রবাহ কম করে দিলে সৃষ্ট চৌম্বক ধর্মের কী পরিবর্তন ঘটবে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চুম্বক তৈরিতে উপরের কোন পদ্ধতিকে তুমি অগ্রাধিকার দিবে লিখ।

চতুর্দশ অধ্যায়

ভূপৃষ্ঠ

স্থলভাগ

আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবী প্রথমে উত্তপ্ত বাষ্পীয় অবস্থায় ছিল। পরে ধীরে ধীরে শীতল হয়ে তরল এবং আরও ঠান্ডা হয়ে কঠিন আকার ধারণ করে। এরূপে পৃথিবীর উপরিভাগে কঠিন আবরণের সৃষ্টি হয়। ভূপৃষ্ঠ কঠিন আকার ধারণ করার সময় সংকুচিত হয়ে কোথাও উঁচু আবার কোথাও নিচু হয়ে যায়। ভূপৃষ্ঠের উঁচু অংশকে স্থলভাগ এবং নিচু পানিভর্তি অংশকে জলভাগ বলে।

ভূপৃষ্ঠের ৭ ভাগের ৫ ভাগ (৭১%) পানি এবং ২ ভাগ (২৯%) স্থল। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগের পরিমাণ কম। এই স্থলভাগ আবার কয়েকটি বড় বড় খন্ডে বিভক্ত। এরূপ এক একটি বড় খন্ডকে মহাদেশ বলা হয়। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থান জুড়ে রয়েছে সাতটি মহাদেশ। যেমন, (১) এশিয়া, (২) আফ্রিকা, (৩) ইউরোপ, (৩) উত্তর আমেরিকা, (৫) দক্ষিণ আমেরিকা, (৬) অস্ট্রেলিয়া ও (৭) এন্টার্কটিকা।

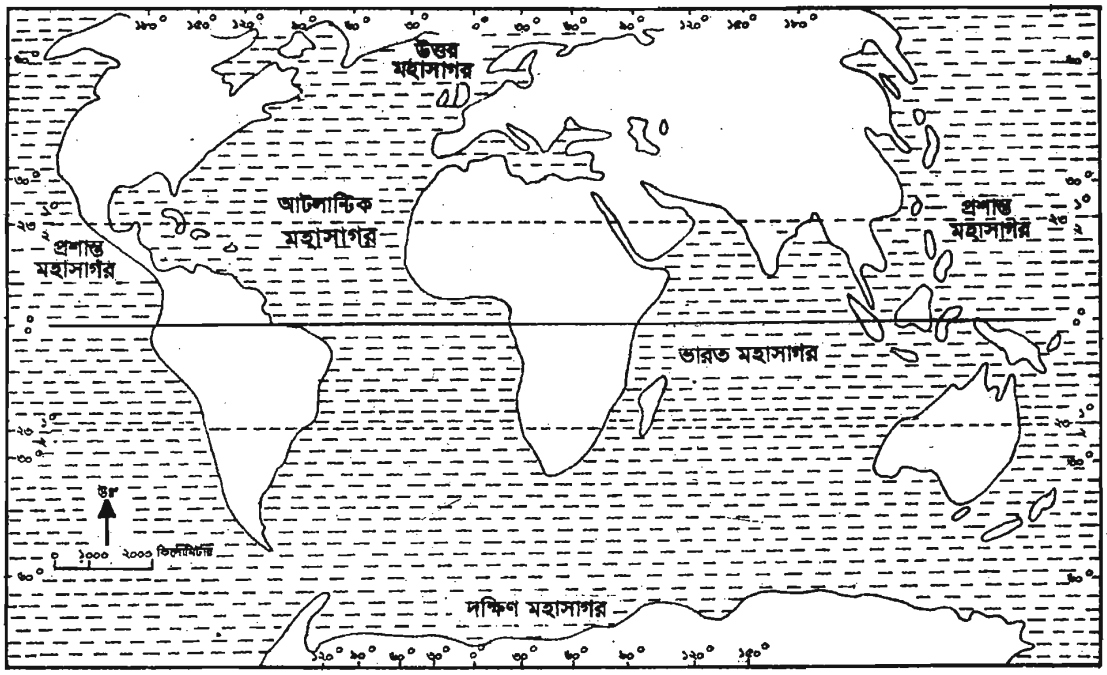

চিত্র ১৪.১ পৃথিবীর মহাসাগরসমূহের অবস্থান

ভূপৃষ্ঠের ভূমিরূপ

ভূপৃষ্ঠের নানা অংশের ভূপ্রকৃতি নানারূপ দেখা যায়। যেমন, কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু আবার কোথাও বিস্তৃত সমতল ভূমি। এছাড়া একই দেশের বিভিন্ন অংশের ভূমির বিভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের পূর্বাংশ পাহাড়িয়া উঁচুভূমি, রাজশাহী বিভাগের পশ্চিম–উত্তরাংশ উঁচু সমভূমি এবং খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দক্ষিণাংশ নিম্নভূমি। ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, উত্তাপ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, তুষার, হিমবাহ, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি ভূমিরূপ পরিবর্তনকারী প্রাকৃতিক শক্তি। এদের একক বা যৌথ কার্যের ফলে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন হয়। এভাবে নানান ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। ভূমিরূপ অনুসারে ভূপৃষ্ঠকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, (ক) পর্বত, (খ) মালভূমি এবং (গ) সমভূমি।

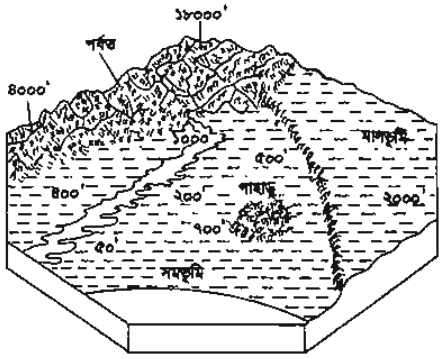

চিত্র ১৪.২ : সমভূমি, মালভূমি, পাহাড় ও পর্বতের তুলনা

ক. পর্বত

ভূপৃষ্ঠের অতি উচ্চ, বহুদূর বিস্তৃত খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে। যেমন, হিমালয় পর্বত। পর্বত অপেক্ষা নিচু আকারে ছোট শিলাস্তূপকে পাহাড় বলে। যেমন, চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড পাহাড়। পার্বত্য এলাকায় সুউচ্চ অংশ ছাড়াও উপত্যকা নামে অপর একটি ভূমিরূপ দেখা যায়।

পর্বতের শ্রেণীবিভাগ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকৃতি ও আয়তনের পর্বত দেখা যায়। এসব পর্বত নানাভাবে সৃষ্টি হয়েছে। গঠন বৈশিষ্ট্য অনুসারে পর্বতকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এছাড়া এসব পর্বত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েও আরও একপ্রকার পর্বত সৃষ্টি করতে পারে। এরূপ পর্বতকে ক্ষয়জাত পর্বত বলে।

১। ভঙ্গিল বা ভাঁজ পর্বত : ভূ–অভ্যন্তরের স্বতাড়িত বৈশিষ্ট্যের কারণে পৃথিবীর অভ্যন্তরে আলোড়ন হয়। এই আলোড়নকে ভূআলোড়ন বলে। এই আলোড়নের ফলে পৃথিবীর পর্বত ও মহাদেশসমূহ গঠিত হয়। ভূআলোড়নের ফলে

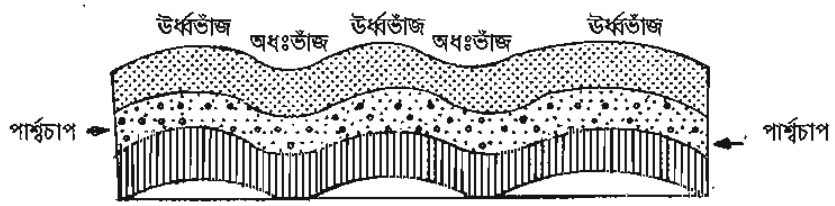

ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা

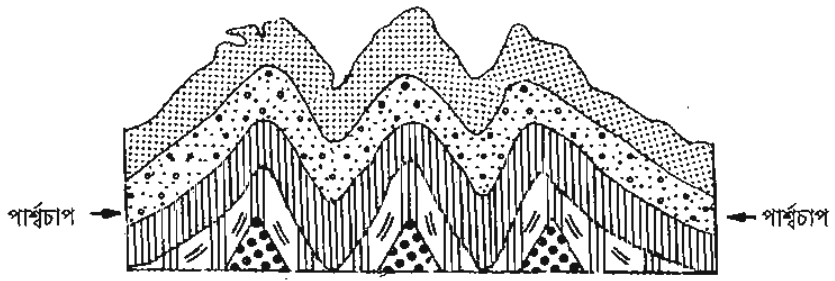

চিত্র ১৪.৩ : চূড়ান্ত অবস্থায় গঠিত ভঙ্গিল বা ভাঁজ পর্বত

ভূপৃষ্ঠের পার্শ্বচাপে কোনো স্থান বসে যায় আবার কোনো স্থান উঁচু হয়ে যায়। যদি ভাঁজ হয়ে কোনো স্থানের শিলা স্তর উঁচু হয়ে ওঠে তখন ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি হয়। ভাঁজ হয়ে এই পর্বত সৃষ্টি হয় বলে একে ভঙ্গিল বা ভাঁজ পর্বত বলে (চিত্র ১৪:৩)। এশিয়ার হিমালয়, ইউরোপের আল্পস, আফ্রিকার আটলাস, উত্তর আমেরিকার রকি, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ প্রভৃতি ভঙ্গিল পর্বত।

২। স্তূপ পর্বত : ভূআলোড়নের ফলে অনেক সময় ভূপৃষ্ঠ খাড়াভাবে ফেটে যায় এবং অনেক সময় একদিকের অংশ নিচে বসে যায়। এ বসে যাওয়া অংশকে চ্যুতি বলে। কখনও কখনও দুইটি চ্যুতির দুই পাশের অংশ নিচে দেবে যায়। কিন্তু মাঝখানের অংশটি যথাস্থানে অবস্থান করে। মাঝের এই অংশটিকে স্তূপ পর্বত বলে (চিত্র ১৪.৪)। আর যদি নিচের দিকে বসে যায় তবে যে নিচুভূমির সৃষ্টি হয় তাকে স্রস্ত উপত্যকা বলে। পাকিস্তানের পাঞ্জাবের লবণ পর্বত ও ভারতের দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমঘাট পর্বত স্তূপ পর্বতের উদাহরণ।

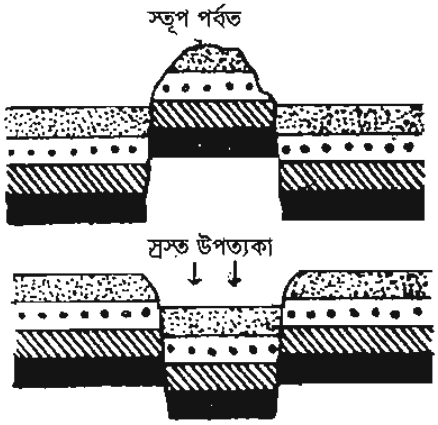

চিত্র ১৪.৪: স্তূপ পর্বত ও স্রস্ত উপত্যকা

৩। আগ্নেয় বা সঞ্চয়জাত পর্বত : ভূপৃষ্ঠের কোনো ফাটল দিয়ে নির্গত উত্তপ্ত লাভা, ভস্ম, গ্যাস ইত্যাদি পদার্থ শীতল ও কঠিন হয়ে যে পর্বত সৃষ্টি হয় তাকে আগ্নেয় বা সঞ্চয়জাত পর্বত বলে (চিত্র ১৪.৫)। যেমন, জাপানের ফুজিয়ামা, ইতালির ভিসুভিয়াস, আফ্রিকার কিলিমানজারো প্রভৃতি সঞ্চয়জাত পর্বত।

চিত্র ১৪.৫: আগ্নেয় বা সঞ্চয়জাত পর্বত

৪। ল্যাকোলিথ পর্বত : ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে যে উত্তপ্ত গলিত পদার্থ থাকে তাকে ম্যাগমা বলে। কখনও কখনও পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে ম্যাগমা উর্ধ্ব চাপের ফলে ভূপৃষ্ঠের ওপর বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ভূত্বকের নিচে জমাট বেঁধে গম্বুজ আকার ধারণ করে। এভাবে যে পর্বত গঠিত হয় তাকে ল্যাকোলিথ পর্বত বলে (চিত্র ১৪.৬)। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের উতাহ্ প্রদেশের হেনরী পর্বত।

ক্ষয়জাত পর্বত : উপরে বর্ণিত চার প্রকার পর্বত এবং সুউচ্চ মালভূমি বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মূল পর্বতের এবং মালভূমির অনেক অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার পর পর্বত ও মালভূমির অবনমিত অংশ পর্বতের আকৃতিতে দাঁড়িয়ে থাকে। একে ক্ষয়জাত পর্বত বলে। যেমন, ভারতের বিন্ধ্যা পর্বত ও আফ্রিকার কং পর্বত।

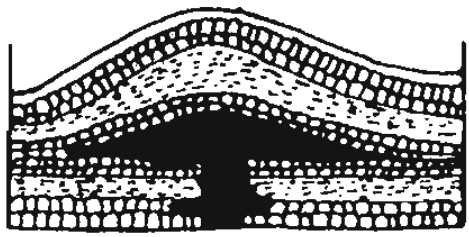
চিত্র ১৪.৬: ল্যাকোলিথ পর্বত

উপত্যকা

দুইটি পাহাড় বা পর্বতের মধ্যবর্তী নিম্নভূমিকে উপত্যকা বলে। এই উপত্যকা চার প্রকারে গঠিত হয়ে থাকে। যথা

১। পার্বত্য উপত্যকা : দুইটি পর্বতের মধ্যবর্তী নিম্নভূমিকে পার্বত্য উপত্যকা বলে। ভঙ্গিল পর্বতের দুইটি ভাঁজের মধ্যে এ ধরনের উপত্যকা দেখা যায়।

২। হিমবাহ উপত্যকা : পর্বতের খুব উঁচু অংশে জমাট বাঁধা বরফের বিশাল স্তূপ প্রধানত মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে ধীরে ধীরে নিচের দিকে গড়িয়ে আসে। এই চলমান বরফের স্তূপকে হিমবাহ বলে। পার্বত্য অঞ্চলের চলাচলের পথে হিমবাহের ঘর্ষণে যে উপত্যকা সৃষ্টি হয়, তাকে হিমবাহ উপত্যকা বলে। হিমবাহের কঠিন বরফ সোজা চলে, তাই দুই পাশের ঢাল ইংরেজি ইউ (U) অক্ষরের মত খুব খাড়া হয়।

৩। স্রস্ত উপত্যকা : ভূআলোড়নের ফলে ভূপৃষ্ঠে দুইটি সমান্তরাল চ্যুতির মধ্যবর্তী স্থান নিচের দিকে বসে গেলে যে উপত্যকার সৃষ্টি হয় তাকে স্রস্ত উপত্যকা বলে। (চিত্র ১৪.৪)

৪। নদী উপত্যকা : নদীর প্রবল স্রোতের ফলে গতিপথে গভীর খাতের সৃষ্টি হয়। এরূপ খাতকে নদী উপত্যকা বলে। কালক্রমে নদীর স্রোতের ফলে উভয় পার্শ্বের ভূমি ক্ষয় হয়ে যায়। ফলে নদীর খাত ক্রমশ প্রশস্ত ও অগভীর হয়।

খ. মালভূমি

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সুউচ্চ ও বহুদূর বিস্তৃত সমতল ভূমিকে মালভূমি বলে। যেমন, ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমি। মালভূমি সাধারণত ভূআন্দোলন, পার্বত্য ভূমির ক্ষয় এবং লাভা সঞ্চিত হয়ে গঠিত হয়।

মালভূমির শ্রেণীবিভাগ

অবস্থান অনুসারে মালভূমি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা (১) পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি, (২) পাদদেশীয় মালভূমি এবং (৩) মহাদেশীয় মালভূমি।

১। পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি : যে সকল মালভূমি পর্বত দ্বারা বেষ্টিত সেগুলোকে পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি বলে। তিব্বতের পামীর মালভূমি এর একটি উদাহরণ। পামীর মালভূমি পৃথিবীর সর্বোচ্চ মালভূমি। এর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪,৮৭৭ মিটার। সে কারণে পামীর মালভূমিকে পৃথিবীর ছাদ বলা হয়।

২। পাদদেশীয় মালভূমি : বৃষ্টিপাত, নদীপ্রবাহ, হিমবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি পর্বতকে ক্ষয় করে। লক্ষ লক্ষ বছরের ক্ষয়কার্যের ফলে পর্বত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মালভূমির সৃষ্টি হয়। এই ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থ পর্বতের পাদদেশে জমা হয়ে যে মালভূমির সৃষ্টি হয় তাকে পাদদেশীয় মালভূমি বলে। উত্তর আমেরিকার কলোরাডো এরকম একটি পাদদেশীয় মালভূমি।

৩। মহাদেশীয় মালভূমি : যে মালভূমি সাধারণত সাগর কিংবা নিম্নভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে কিন্তু পর্বতের সঙ্গে কোনো সংযোগ থাকে না তাকে মহাদেশীয় মালভূমি বলে। ভারতীয় উপদ্বীপ, আরব উপদ্বীপ এবং স্পেন মহাদেশীয় মালভূমি।

মালভূমির পরিবেশ

যে সকল মালভূমিতে বৃষ্টিপাত হয় সেখানে গাছপালা জন্মে ও কৃষিকাজ হয়। শুষ্ক মালভূমির অধিবাসীরা পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে। মালভূমি অঞ্চল মেষপালনে বেশি উপযোগী। বর্তমানে কৃত্রিম সেচ দিয়ে মালভূমিতে চাষাবাদ করা হচ্ছে।

গ. সমভূমি

সমুদ্রপৃষ্ঠের সঙ্গে প্রায় একই সমতলে অবস্থিত বিশাল স্থলভাগকে সমভূমি বলে। সমভূমির উপরিভাগ সমতল বা সামান্য উঁচু নিচু থাকে। ভূপৃষ্ঠস্থ সমভূমি নানাভাবে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন,

১। উপকূলীয় সমভূমি : স্থলভাগের বালি, কাঁকর ও সূক্ষ্ম পদার্থ নানা উপায়ে বাহিত হয়ে সমুদ্রের অগভীর অংশে জমে যে সমভূমি গঠিত হয় তাকে উপকূলীয় সমভূমি বলে। যেমন, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ভারতের চেন্নাইয়ের উপকূলীয় সমভূমি।

২। প্লাবন সমভূমি : বন্যার সময় নদীবাহিত পলি সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমি গঠিত হয় তাকে প্লাবন সমভূমি বলে। যেমন, বাংলাদেশের যমুনা ও পাকিস্তানের সিন্ধুর প্লাবন সমভূমি।

৩। বদ্বীপ সমভূমি : নদীয় মোহনায় পলিমাটি জমে মাত্রাহীন 'ব' অক্ষরের ন্যায় যে সমভূমি গঠিত হয় তাকে বদ্বীপ সমভূমি বলে। যেমন, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে গঙ্গার বদ্বীপ সমভূমি।

৪। হিমবাহ সমভূমি : হিমবাহ খুবই ধীর গতিতে প্রবাহিত বরফ স্তূপ। প্রবাহিত হওয়ার সময় হিমবাহ বড় পাথর, কাঁকর, নুড়ি ইত্যাদি বহন করে। হিমবাহ বাহিত এসব সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমি গঠিত হয় তাকে হিমবাহ সমভূমি বলে। যেমন, কানাডার প্রেইরী একটি হিমবাহ সমভূমি।

৫। লোয়েস সমভূমি : বায়ু বাহিত ধূলিকণার সাহায্যে লোয়েস সমভূমি গঠিত হয়। উত্তর চীনের লোয়েস নামক স্থানের নামানুসারে লোয়েস সমভূমির নাম হয়েছে।

৬। লাভা সমভূমি : ভূঅভ্যন্তরের ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠের ওপরে যখন বের হয়ে আসে, তখন তাকে লাভা বলে। আগ্নেয়গিরির লাভা সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমি সৃষ্টি হয়েছে তাকে লাভা সমভূমি বলে। যেমন, দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণ মৃত্তিকার সমভূমি একটি লাভা গঠিত সমভূমি।

৭। ক্ষয়জাত সমভূমি : প্রাকৃতিক শক্তি বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, সূর্যের তাপ প্রভৃতি দ্বারা পর্বত, মালভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সমভূমি সৃষ্টি হয় তাকে ক্ষয়জাত সমভূমি বলে। যেমন, রাশিয়ার সাইবেরিয়ার সমভূমি।

এছাড়া আরও নানান উপায়ে সমভূমি গঠিত হয়ে থাকে।

সমভূমির প্রভাব

পলিমাটি দ্বারা গঠিত সমভূমির মাটি উর্বর হওয়ায় কৃষিকাজ সহজে করা যায় এবং শস্যের উৎপাদনও বেশি হয়। সমভূমিতে জীবন নির্বাহ সহজ এবং কৃষ্টি ও সভ্যতা বিকাশের সুযোগ বেশি। সমভূমিতে মানুষ সহজে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে পারে। বিভিন্ন দ্রব্য, যেমন, কৃষিজ পণ্য, একস্থান থেকে অন্যস্থানে পরিবহণ করতে পারে।

প্রাচীনকাল থেকে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছে সমভূমিতে। সমভূমিতে রাস্তাঘাট, বাজার, বন্দর, শহর ও শিল্প কারখানা নির্মাণ করা সহজ। সমভূমিতে বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতা যেমন মিসরের নীল নদ সভ্যতা গড়ে উঠেছে পর্যাপ্ত মিঠা পানি এবং উর্বর মাটি থাকার কারণে। তাই পৃথিবীর শতকরা ৯০ জন লোক সমভূমি অঞ্চলের অধিবাসী। বাংলাদেশের প্রায় পুরো অঞ্চল সমভূমি।

জলভাগ

তোমরা আগেই জেনেছ যে, ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তনের প্রায় শতকরা ৭১ ভাগ পানি বেষ্টিত। অবস্থান অনুসারে পৃথিবীর সমগ্র জলভাগকে বড় বড় পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, এর প্রত্যেকটিকে মহাসাগর বলে। মহাসাগর অপেক্ষা ছোট আকারের জলভাগকে সাগর বলা হয়। আর তিন দিক স্থলভাগ বেষ্টিত বৃহৎ জলভাগকে উপসাগর বলে। চতুর্দিকে স্থলভাগ বেষ্টিত জলভাগকে হ্রদ বলে।

মহাসাগর

পৃথিবীতে মোট পাঁচটি মহাসাগর আছে। (১) প্রশান্ত মহাসাগর আয়তন ও গভীরতায় সবচেয়ে বড়। (২) আটলান্টিক মহাসাগর আয়তনে দ্বিতীয় কিন্তু গভীরতায় তৃতীয়। (৩) ভারত মহাসাগর আয়তনে তৃতীয় কিন্তু গভীরতায় দ্বিতীয়। (৪) উত্তর মহাসাগর–আয়তন ও গভীরতায় চতুর্থ এবং (৫) দক্ষিণ মহাসাগর আয়তন ও গভীরতায় পঞ্চম।

মহাসাগর তলদেশের ভূমিরূপ

মহাসাগরের তলদেশের সর্বত্র ভূমিরূপ একরকম নয়। কোথাও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল যেখানে জোয়ার–ভাটার পানি ওঠানামা করে। সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপকে গভীরতা অনুসারে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন,

১। মহীসোপান : মহাদেশের যে অংশ উপকূল থেকে ধীরে ধীরে সাগরের পানির মধ্যে বিস্তৃত হয়েছে। মহাদেশের ক্রমনিম্ন স্বল্প গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত অংশকে মহীসোপান বলে। (চিত্র ১৪.৭)। উপকূলের সমভূমি যত বেশি বিস্তৃত মহীসোপান তত বেশি প্রশস্ত। আফ্রিকার মহীসোপান অল্প বিস্তৃত কিন্তু ইউরোপ ও এশিয়ার মহীসোপান বহুদূর বিস্তৃত।

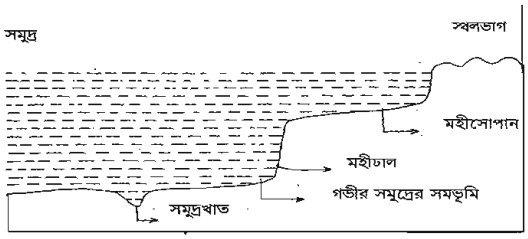

চিত্র ১৪.৭: মহাসাগর তলদেশের ভূমিরূপ

২। মহীঢাল : মহীসোপানের পর থেকে অধিক খাড়া ঢালবিশিষ্ট মহাসাগরের তলদেশকে মহীঢাল বলে। (চিত্র ১৪.৭)। সমুদ্রে মহীঢালের গভীরতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৮৩ থেকে ৩,৬০০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৩। গভীর সমুদ্রের সমভূমি : মহীঢালের পর থেকে সমুদ্রের তলদেশে যে বিশাল সমভূমি রয়েছে তাকে গভীর সমুদ্রের সমভূমি বলে (চিত্র ১৪.৭)। এ অঞ্চলের গভীরতা ৩,৬৬০ থেকে ৫,৪৯০ মিটার।

৪। সমুদ্রখাত : সমুদ্রের তলদেশে যেসব গভীর খাত থাকে সেগুলোই সমুদ্রখাত নামে পরিচিত। এসব খাত খুব অল্প জায়গা জুড়ে থাকে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ম্যারিয়ানা খাত সবচেয়ে গভীর খাত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০,৮৭০ মিটার।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. তিন দিক স্থলভাগ বেষ্টিত বৃহৎ জলভাগ হল
   ক. উপসাগর খ. উপদ্বীপ
   গ. হ্রদ ঘ. বদ্বীপ।

২. ভঙ্গিল পর্বত কোনটি ?
   ক. রকি খ. কং
   গ. বিন্ধ্যা ঘ. পশ্চিম ঘাট।

৩. সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সুউচ্চ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমির নাম কী ?
   ক. কং খ. মালভূমি
   গ. হিমবাহ সমভূমি ঘ. হেনরী পর্বত

৪. কানাডার প্রেইরী একটি
   ক. সমভূমি খ. হিমবাহ সমভূমি
   গ. ক্ষয়জাত সমভূমি ঘ. উপকূলীয় সমভূমি

৫. সিন্দু ও গঙ্গার উপত্যকা কোন শ্রেণীভুক্ত উপত্যকা ?
   ক. পার্বত্য উপত্যকা খ. স্রস্ত উপত্যকা
   গ. হিমবাহ উপত্যকা ঘ. নদী উপত্যকা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

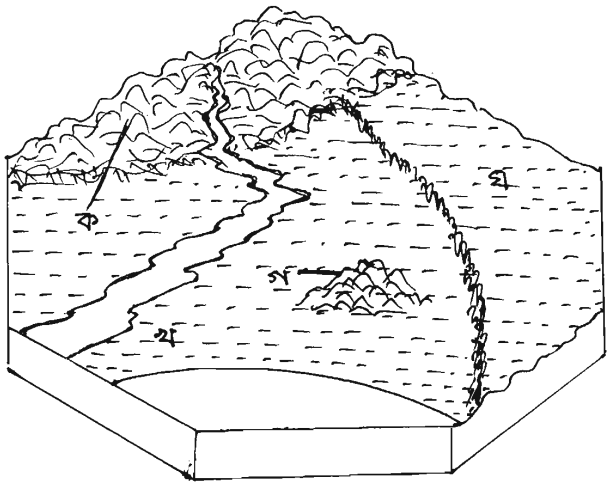

চিত্র ১

ক. চিত্রের 'ক' অংশের নাম কী ?
খ. চিত্রের 'গ' এবং 'ঘ' অংশের ভূমিরূপের ২টি পার্থক্য লেখ।
গ. 'ঘ' অঞ্চল কীভাবে সৃষ্টি হয়।
ঘ. মানব সভ্যতার বিকাশে 'গ' অংশের অবদান ব্যাখ্যা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অমেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি

চিংড়ি

পৃথিবীতে বিভিন্ন রকমের প্রাণী আছে। তোমরা দেখেছ গরু, ছাগল, হাতি, ঘোড়া, মানুষ পায়ে হেঁটে চলে। দোয়েল, কাক, বক, চিল ডানা মেলে আকাশে উড়ে বেড়ায়। হাঁস, পানকৌড়ি, মাছ পানিতে সাঁতার কাটে এবং সাপ, টিকটিকি, কুমির বুকে ভর দিয়ে চলে। কোনো কোনো প্রাণী যেমন ম্যালেরিয়ার জীবাণু এত ক্ষুদ্র যে খালি চোখে দেখা যায় না। আবার কোনো কোনোটি খুবই বড়। যেমন নীল তিমি, যার ওজন প্রায় ১৫০ টন পর্যন্ত হয়ে থাকে। অপর দিকে কোনো কোনো প্রাণীর দেহে হাড় বা অস্থি ও মেরুদণ্ড নেই। আবার কোনোটির দেহে হাড় ও মেরুদণ্ড বা একটি শিরদাঁড়া আছে। প্রাণীর মেরুদণ্ড আছে বা নেই এর ভিত্তিতে সমস্ত প্রাণিজগতকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণী।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা মেরুদণ্ডী প্রাণী কাকে বলে এবং কোন কোনটি মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী তা জেনেছি। কিন্তু এই অধ্যায়ে আমরা অমেরুদণ্ডী প্রাণী সম্পর্কে বিশদভাবে জানব।

আমরা আগেই জেনেছি যে অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া নেই। যেমন কেঁচো, চিংড়ি, প্রজাপতি, মাছি, মশা, মাকড়সা, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি। এ পৃথিবীতে অমেরুদণ্ডী প্রাণীর সংখ্যা অধিক। প্রাণিজগতের দশটি পর্বের মধ্যে নয়টি পর্বই অমেরুদণ্ডী প্রাণী।

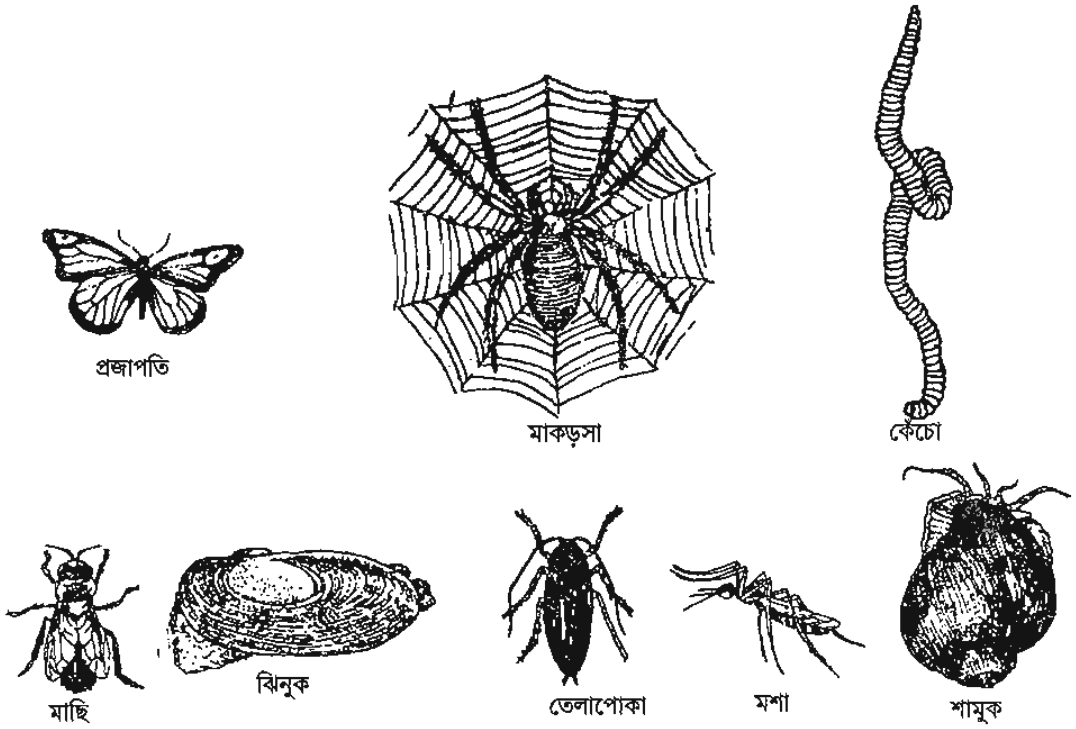

অমেরুদণ্ডী প্রাণীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য

মেরুদণ্ডী প্রাণীর মত অমেরুদণ্ডী প্রাণীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে অমেরুদণ্ডী প্রাণীর কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দেওয়া হল :

১। অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড থাকে না।

২। এদের দেহ এককোষ (অ্যামিবা) দ্বারা বা বহুকোষ দ্বারা গঠিত।
৩। এদের শ্বসন অঙ্গ প্রধানত ত্বক (কেঁচো), ফুলকা (চিংড়ি)।
৪। এদের খাদ্যানালী সোজা প্রকৃতির।
৫। কতকগুলো অমেরুদন্ডী প্রাণীর রক্ত বর্ণহীন অথবা রক্ত লাল এবং এদের দেহে রক্তনালী থাকে।

অমেরুদন্ডী প্রাণীর পরিচিতি

তোমরা আগেই জেনেছ যে প্রাণী জগতের দশটি পর্বের মধ্যে নয়টি পর্ব হল অমেরুদন্ডী প্রাণীদের। নিচে এই নয়টি পর্বের সাধারণ পরিচিতি সংক্ষেপে দেওয়া হল:

পর্বের নাম	পর্বভুক্ত কয়েকটি প্রাণীর নাম	সাধারণ পরিচিতি
১। প্রোটোজোয়া	অ্যামিবা, ম্যালেরিয়ার পরজীবি (ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট)	প্রোটোজোয়া প্রাণীগুলো এককোষী এবং এরা প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল। এরা একাকী অথবা দলবদ্ধভাবে বাস করে। ম্যালেরিয়া ও আমাশয়ের জীবাণু পরজীবী। কারণ এরা অন্য প্রাণীর দেহে বাস করে।
২। পরিফেরা	সাইকন, স্পনজিলা ইত্যাদি।	এরা জলজ প্রাণী। এ জাতীয় প্রাণীর দেহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্র দিয়ে পানির সাথে খাদ্য দেহে প্রবেশ করে। দেহ স্পঞ্জের মত নরম। অধিকাংশ প্রাণী এক জায়গায় স্থির থাকে।
৩। নিডারিয়া	হাইড্রা, জেলীফিস, প্রবাল ইত্যাদি।	অধিকাংশ প্রাণী সমুদ্রে বাস করে। দেহের ভিতরে একটি ফাঁকা গহ্বর থাকে। এই গহ্বরকে সিলেন্টেরন বলে। দেহে একটি মাত্র ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্র দিয়েই খাদ্য গ্রহণ করে এবং দেহ থেকে বর্জ্য পদার্থ বের করে দেয়। এদের পৃথক পায়ুছিদ্র নেই। মুখের চারদিকে কর্ষিকা বা টেন্টাকল আছে।
৪। প্লাটিহেলমিনথেস (চ্যাপ্টা কৃমি)	ফিতা কৃমি ও যকৃৎ কৃমি ইত্যাদি।	দেহ পাতা বা ফিতার মত চ্যাপ্টা। দেহ নরম। মুখ ছিদ্র আছে ও পায়ুছিদ্র নেই। এরা অধিকাংশ পরজীবী।
৫। নেমাটোডা	বক্রকৃমি, গোলকৃমি (কেঁচো কৃমি) সুতা কৃমি ইত্যাদি।	দেহ নলাকৃতি ও অখন্ডিত। মুখ ও পায়ু আছে। মানুষ ও পশুর দেহে পরজীবী হিসেবে বাস করে এবং দেহে রোগের সৃষ্টি করে।
৬। অ্যানিলিডা	কেঁচো, জোঁক ইত্যাদি।	দেহ নরম। দেহে মুখ ও পায়ু আছে। দেহ রিং বা বলয়ের মত খন্ড খন্ড অংশে বিভক্ত।
৭। আর্থ্রোপোডা	চিংড়ি, কাঁকড়া, মাছি, তেলাপোকা ইত্যাদি।	দেহ শক্ত আবরণে ঢাকা। মুখ ও চোয়াল আছে। দেহে সন্ধিযুক্ত পা থাকে। পুঞ্জাক্ষী আছে।

পর্বের নাম	পর্বভুক্ত কয়েকটি প্রাণীর নাম	সাধারণ পরিচিতি
৮। একাইনোডার্মাটা	সি–লিলি, তারা মাছ ইত্যাদি।	দেহ কাঁটাযুক্ত। সামুদ্রিক প্রাণী, নালী (টিউবফিট) থাকে।
৯। মলাস্কা	ঝিনুক, শামুক, অক্টোপাস সেপিয়া ইত্যাদি।	দেহ শক্ত খোলক দ্বারা আবৃত। পেশীবহুল পা আছে।

একটি অমেরুদণ্ডী প্রাণী–চিংড়ি

চিংড়ি আর্থ্রোপোডা পর্বের একটি প্রাণী। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৬০ রকমের চিংড়ি রয়েছে। এদের মধ্যে গলদা চিংড়ি উল্লেখযোগ্য। মিঠা পানির গলদা চিংড়ি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। বর্তমানে আমাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলের দশটি জেলায় চিংড়ি চাষ হচ্ছে।

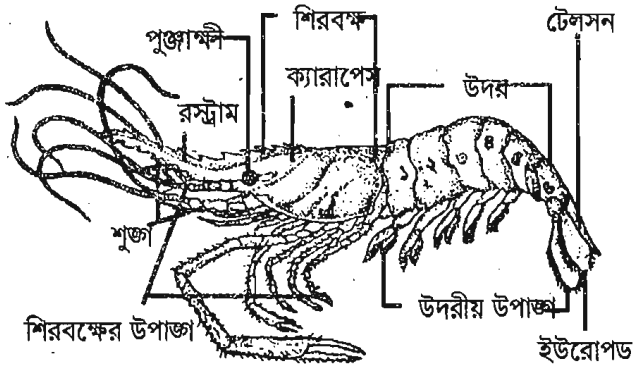

চিত্র ১৫.১: চিংড়ির বাহ্যিক গঠন

চিংড়িকে মাছ বলা হলেও চিংড়ি কিন্তু মাছ নয়। এরা ছোট থেকে বড় বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। নদী–নালা, খাল–বিল, পুকুর ইত্যাদির মিঠা পানিতে এবং সমুদ্রের লোনা পানিতে এরা বাস করে। চিংড়ির দেহ পুরু খোলস দিয়ে আবৃত এবং দেহ শুধু মাত্র বাইরের দিকে খন্ডায়িত।

এদের দেহ দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত। যথা–শিরোবক্ষ এবং উদর। মস্তক ও বক্ষ একত্রে সংযুক্ত হয়ে শিরোবক্ষ গঠিত। শিরোবক্ষ অঞ্চলটি শক্ত আবরণে ঢাকা থাকে। একে কৃত্তিকাবর্ম বা ক্যারাপেস বলে। সমান আকৃতির কয়েকটি খন্ড দ্বারা দেহের এক একটি অঞ্চল গঠিত। প্রতিটি দেহ খন্ডের দুই পাশে সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ থাকে। তাই এদেরকে সন্ধিপদী প্রাণী বলে।

চিংড়ির শিরোবক্ষ অঞ্চলে ১৩ জোড়া এবং উদরে ৬ জোড়া উপাঙ্গ থাকে। উপাঙ্গগুলো ছোট ও বড় বিভিন্ন আকৃতির এবং এদের কাজও বিভিন্ন ধরনের। যেমন অনুভূতি, খাদ্য গ্রহণ, খাদ্য শিকার, হাঁটা ও সাঁতার কাটা ইত্যাদি।

পিঠের মধ্যরেখা বরাবর মাথার সম্মুখে করাতের মত অঙ্গ আছে। একে রস্ট্রাম বলে। এই অঙ্গটিকে চিংড়ি আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহার করে। মস্তক অঞ্চলের উপাঙ্গগুলোকে শুঙ্গ বলা হয়। এই শুঙ্গাগুলো অনুভূতির অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। শিরোবক্ষ অঞ্চলের অগ্রভাগে রস্ট্রামের উৎপত্তিস্থলের দুই পাশে ১ জোড়া চোখ বোঁটায় সংযুক্ত থাকে। এই চোখকে পুঞ্জাক্ষী বলা হয়।

শিরোবক্ষের পরের অংশ উদর। মোট ৬টি দেহ খন্ডক নিয়ে উদর গঠিত। উদরের শেষ প্রান্তে একটি সূচাল কণ্টক আছে। একে পুচ্ছক বা টেলসন বলে। টেলসনের অঙ্কীয় দেশে একটি লম্বালম্বি চেরা ছিদ্রকে পায়ু বলা হয়। তাছাড়া দ্বিতীয় জোড়া উপাঙ্গ বা শুঙ্গের গোড়ার ভেতরের দিকে ১ (এক) জোড়া ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রকে রেচন ছিদ্র বলে। রেচন ছিদ্রের মাধ্যমে দেহ থেকে বর্জ্য পদার্থ বের করে দেয়।

চিংড়ির বাসস্থান, খাদ্য ও বৃদ্ধি

চিংড়ি মিঠা ও লবণাক্ত উভয় প্রকার পানিতে বসবাস করে। এরা পানির তলদেশে মাটির উপরিভাগে চলাফেরা করে। আবার প্রয়োজন হলে পানিতে সাঁতার কেটে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে। চিংড়ি দিনের বেলায় কম চলাফেরা করে কিন্তু রাতে খাদ্যের সন্ধানে বের হয়।

চিংড়ি জৈব ও অজৈব উভয় প্রকার খাদ্য গ্রহণ করে। জলজ উদ্ভিদ যেমন শৈবাল, পোকামাকড়, ছোট ছোট শামুক, ব্যাঙাচি, ছোট মাছ ইত্যাদি এবং মাটিতে দ্রবীভূত জৈব ও অজৈব উপাদান চিংড়ির খাদ্য। সকল প্রকার খাদ্য গ্রহণের জন্য রস্ট্রামের অক্ষীয়দেশে একটি মুখছিদ্র থাকে। চিংড়ির দেহ শক্ত আবরণ দ্বারা ঢাকা থাকে। এই শক্ত আবরণ বা খোলক এদের দেহের কাঠামো বজায় রাখে এবং বাইরে আঘাত থেকে দেহকে রক্ষা করে। সন্ধিপদী পর্বের প্রাণীদের বৃদ্ধি অন্যান্য পর্বের প্রাণীদের মত নয়। চিংড়ির বৃদ্ধি একটি বিশেষ পদ্ধতিতে হয়। কিছুদিন পর পর এরা দেহের শক্ত আবরণটি ত্যাগ করে। একই সাথে পাতলা নতুন খোলস তৈরির অন্তবর্তীকালীন সময়ে এদের দেহের বৃদ্ধি ঘটে।

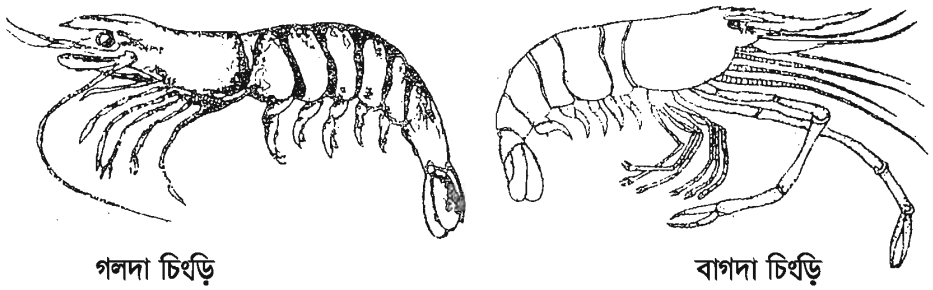

গলদা চিংড়ি বাগদা চিংড়ি

চিত্র ১৫.২ : গলদা ও বাগদা চিংড়ি

চিংড়ির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

১। আমরা আমিষ জাতীয় সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে চিংড়ি খাই।

২। বিদেশে চিংড়ির অনেক চাহিদা রয়েছে। চিংড়ি রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। এজন্য চিংড়িকে বাংলাদেশের রুপালি ফসল বলা হয়। বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৭.৮ ভাগ আসে চিংড়ি রপ্তানি আয় থেকে।

৩। বাংলাদেশের বহুলোক চিংড়ির চাষ ও ব্যবসা–বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এর মাধ্যমে আমাদের দেশের বহু লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে।

৪। এছাড়াও চিংড়িকে কেন্দ্র করে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থানের এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনা আছে।

এ অধ্যায়ের নতুন শব্দ

অস্থি
পর্ব
উপাঙ্গ
শিরোবক্ষ
খন্ডায়িত
সন্ধিপদ
গলদা
বাগদা
সন্ধিযুক্ত
শিরদাঁড়া বা মেরুদন্ড
ফুলকা
পরজীবী
কর্ষিকা ও টেন্টাকল
কণ্টক
পুঞ্জাক্ষী
টেলসন
রেচনছিদ্র
পায়ু
ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট
শুঙ্গা
কৃত্তিকাবর্ম বা ক্যারোপেস
রস্ট্রাম।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. চিংড়ি কোন পর্বের প্রাণী ?

ক. পরিফেরা
খ. আর্থ্রোপোডা
গ. অ্যানিলিডা
ঘ. মলাস্কা

২. চিংড়ির বক্ষ অঞ্চলে উপাঙ্গের সংখ্যা

ক. ১১ জোড়া
খ. ১৩ জোড়া
গ. ১৬ জোড়া
ঘ. ১৯ জোড়া

৩. চিংড়ির মাথার সম্মুখের করাতের মত অঙ্গের নাম

ক. ক্যারাপেস
খ. টেলসন
গ. রস্ট্রাম
ঘ. কৃত্তিকাবর্ম

৪. চিংড়ির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

i. মৎস্য শ্রেণীভূক্ত প্রাণী
ii. সুস্বাদু আমিষ জাতীয় খাদ্য
iii. দেহ শক্ত খোলস দ্বারা আবৃত থাকলেও চোখ সরল প্রকৃতির

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

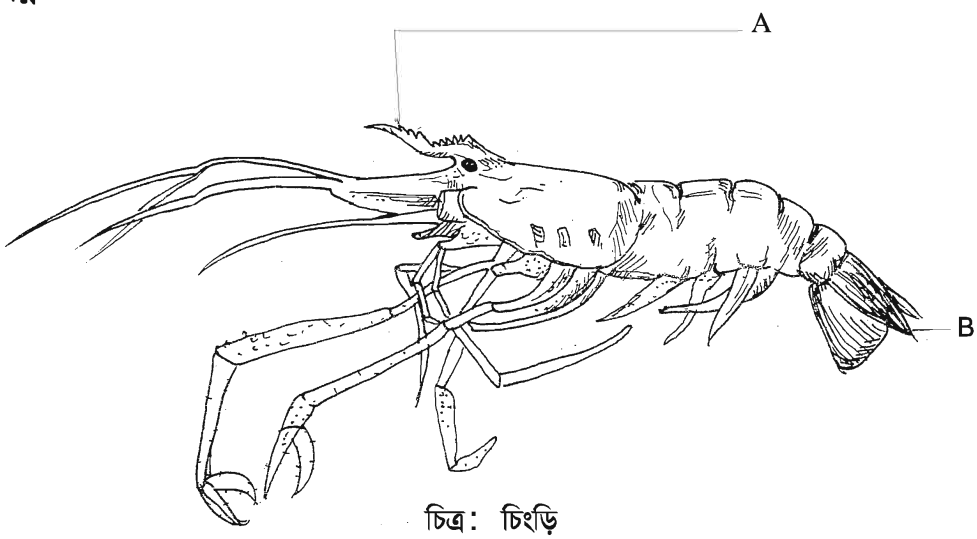

চিত্র: চিংড়ি

১. ক. চিংড়ি কোন পর্বের প্রাণী ?

খ. চিংড়ি কেন মাছ নয় ব্যাখ্যা কর।

গ. চিংড়ির সাথে বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে এমন একটি প্রাণীর ছবি একে দুটি অংশ চিহ্নিত কর।

ঘ. চিংড়ির A এবং B চিহ্নিত অংশের মধ্যে কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কর।

ষোড়শ অধ্যায়

মানব দেহ : বাহ্যিক গঠন, ত্বক
পেশী, অস্থি (কঙ্কাল)

বাহ্যিক গঠন

মানব দেহ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা মাথা, গলা এবং ধড়। সমগ্র দেহে রয়েছে লোম। হাত, পা, চোখ, কান, নাক ইত্যাদি দেহের প্রধান অঙ্গ। অঙ্গ হচ্ছে টিস্যুর সমষ্টি। টিস্যু হচ্ছে কোষগুচ্ছ। এ কোষগুচ্ছের কোষগুলো একই উৎস থেকে সৃষ্টি হয়ে একই কাজ করে। আবার বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত হয় তন্ত্র। যেমন খাদ্য হজমের জন্য রয়েছে পরিপাকতন্ত্র এবং দেহ কাঠামো গঠনের জন্য কঙ্কালতন্ত্র। এছাড়া আরো তন্ত্র আছে যা তোমরা উপরের শ্রেণীতে জানতে পারবে।

কঙ্কাল আমাদের দেহের কাঠামো। এ কাঠামোর উপর পেশী যুক্ত হয়ে দেহের আকার দান করে। এ পেশী ত্বকের আবরণে আবৃত হয়ে সৃষ্টি করে দেহের বাহ্যিক গঠন। ত্বক, পেশী, অস্থি, তরুণাস্থি, রক্ত, স্নায়ু ইত্যাদি মিলে গড়ে ওঠে আমাদের দেহের মূল কাঠামো।

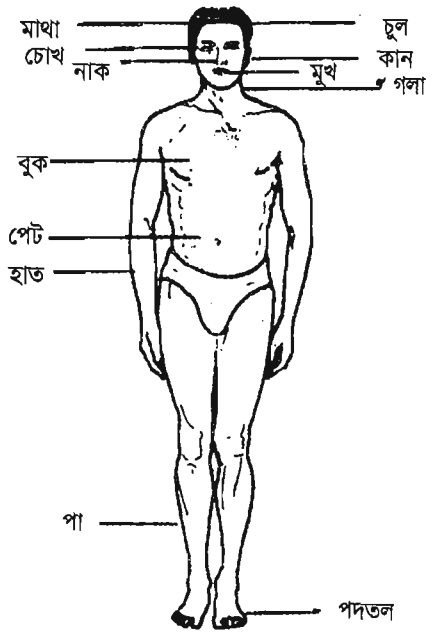

চিত্র ১৬.১: মানব দেহের বাহ্যিক গঠন

ত্বক বা চর্ম

যে সব অঙ্গ দিয়ে আমাদের দেহ গঠিত সেগুলো যাতে রোগ জীবাণু বা বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা পায় সেজন্য সমস্ত দেহ চামড়া বা ত্বক দিয়ে ঢাকা থাকে। এ ত্বকই হচ্ছে আমাদের দেহের আবরণ। ত্বকের দুইটি স্তর আছে, একটি উপচর্ম বা বহিঃত্বক এবং অন্যটি অন্তঃচর্ম বা অন্তঃত্বক।

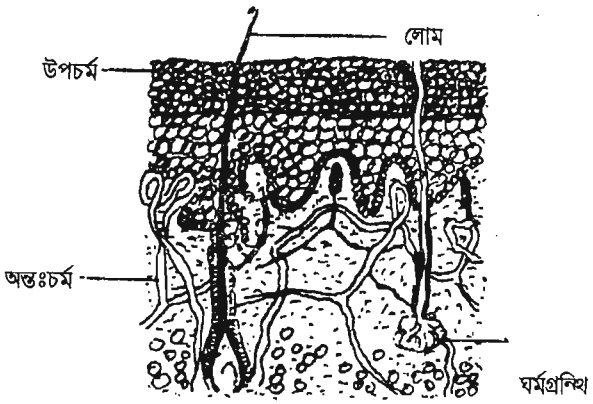

চিত্র ১৬.২: ত্বকের বিভিন্ন স্তর

উপচর্ম বা বহিঃত্বক

উপচর্ম হচ্ছে ত্বকের বাহিরের আবরণ। করতল ও পদতলের চামড়া বা ত্বক খুব পুরু আবার ঠোঁটের চামড়া বা ত্বক পাতলা। এ উপচর্ম থেকেই লোম, চুল ও নখের উৎপত্তি হয়। উপচর্মে লোমকূপও রয়েছে।

অন্তঃচর্ম বা অন্তঃত্বক

অন্তঃত্বকে রয়েছে রক্তনালী ও স্নায়ু। এছাড়াও রয়েছে লোমের মূল, ঘর্মগ্রন্থি, তেলগ্রন্থি, স্বেদগ্রন্থি ইত্যাদি। লোমহীন স্থানে অর্থাৎ করতল ও পদতলে স্বেদগ্রন্থির সংখ্যা বেশি।

ত্বকের সাধারণ কাজ

১) দেহের ভেতরের কোমল অংশকে বাইরের আঘাত, ঠান্ডা, গরম, রোদ ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে।

২) দেহে রোগজীবাণু ঢুকতে বাধা দেয়।

৩) ঘাম বের করে দিয়ে শরীর ঠান্ডা ও সুস্থ রাখে।

৪) দেহের ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয়।

৫) ত্বকের মেলানিন সূর্য রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করে।

ত্বকের বিশেষ বিশেষ কাজ

ত্বকের অন্তঃচর্মে রয়েছে অসংখ্য স্নায়ু কোষ। ত্বকের লোমের গোড়ায় রয়েছে স্নায়ু প্রান্ত। ত্বকের সংবেদী স্নায়ুর কারণেই ঠান্ডা, গরম, স্পর্শ, চাপ, ব্যথা ইত্যাদি বোঝা যায়।

হাতের আঙুলের মাথায় স্পর্শ অনুভূতি সবচেয়ে বেশি। আঙুলের স্পর্শ দ্বারা ঠান্ডা বা গরম অনুভব করা যায়। যে বস্তুকে স্পর্শ করা হয় তার তল নরম না শক্ত, খসখসে না মসৃণ তাও অনুভব করা যায়। এছাড়া ধারণা করা যায় বস্তুটির আকার আকৃতি কেমন।

ত্বকে মেলানিন নামে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ তৈরি হয়। পৃথিবীর সব দেশের মানুষের চামড়াতে মেলানিন সমপরিমাণে থাকে না। দেহের সৌন্দর্য রক্ষাতে এ মেলানিনের অবদান রয়েছে। যে সব মানুষের ত্বকে মেলানিনের পরিমাণ কম থাকে তাদের শরীরের রং ফর্সা হয়। আবার গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলোর মানুষের ত্বকে মেলানিনের পরিমাণ বেশি থাকায় সেসব দেশের মানুষের শরীরের রং কালো হয়। এছাড়া ত্বকের চর্বি স্তরও দেহের সৌন্দর্য রক্ষায় সহায়তা করে। ঘর্মগ্রন্থি থেকে ঘাম লোমকূপের মাধ্যমে উপচর্ম দিয়ে বের হয়। ঘামের সাথে দেহের ভেতর থেকে দূষিত পদার্থ বের হয়ে যায়। ত্বকে ময়লা জমলে লোমকূপ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দেহের দূষিত পদার্থ বের হতে পারে না। সে কারণে আমরা বিভিন্ন চর্মরোগে আক্রান্ত হই। এজন্য প্রত্যহ গোসল করে ত্বক পরিষ্কার রাখা দরকার।

ত্বকের অন্য আর একটি কাজ হচ্ছে দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করা। আমাদের দেহের ত্বকের কৈশিকনালী গ্রীষ্মকালে স্ফীত হয় এবং শীতকালে সংকুচিত হয়। এজন্য গ্রীষ্মকালে রক্ত সঞ্চালন বেশি হয়। ফলে রক্ত দেহের ত্বকে বেশি পরিমাণে আসে এবং রক্তের সাথে দেহের ভেতরের তাপ ত্বকে এসে যায়। তখন ত্বক তাপ ছেড়ে দেয়। তাই শরীর ঠান্ডা হয়।

শীতকালে ত্বকের কৈশিকনালী সংকুচিত হয় বলে ত্বকে রক্ত কম আসে। তখন ত্বক তাপও কম পরিমাণে ছাড়ে ফলে শীতকালে দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে।

পেশী

কঙ্কালের অস্থিকে পেশী ঢেকে রাখে। এই পেশীকে মাংস বলা হয়। পেশী দেহের ত্বক ও চর্বি স্তরের নিচে থাকে। পেশী দেখতে অনেকটা লাল রঙের এবং স্তরে স্তরে সাজানো থাকে। পেশীর প্রান্তভাগ রশির ন্যায় শক্ত হয়ে হাড়ের সাথে যুক্ত থাকে। দেহে পেশীর পরিমাণ বেড়ে গেলে দেহ মোটা দেখায়। পেশীতে পানির পরিমাণ শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ।

পেশীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রয়োজনমত সংকুচিত ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরত আসা। এছাড়া দেহের চলাফেরা, শ্বাস–প্রশ্বাস পেশীর সঞ্চালনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

পেশীর শ্রেণী বিভাগ

দেহের কোনো কোনো পেশী আমরা ইচ্ছামত চালনা করতে পারি। যেমন, হাত–পায়ের পেশী। এ পেশীগুলো আমরা যেভাবে চালাতে চাই সেভাবেই চলে। আবার দেহের কোনো কোনো পেশী আমরা ইচ্ছামত চালনা করতে পারি না। এ ধরনের পেশী তাদের নিজ ইচ্ছামত চলে। যেমন পাকস্থলির পেশী।

এ আলোচনা থেকে আমরা জানলাম পেশী দুই প্রকার। যথা ঐচ্ছিক পেশী এবং অনৈচ্ছিক পেশী।

ঐচ্ছিক পেশী

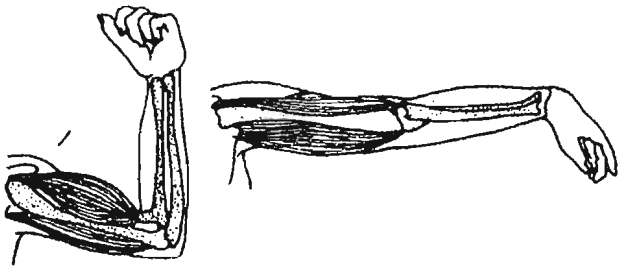

চিত্র ১৬.৩ : ঐচ্ছিক পেশী সংকোচন ও প্রসারণ

আমরা যখন কনুই বাঁকা করি তখন উর্ধ্ব বাহুর সামনের দিকে পেশী সংকুচিত হয়ে নিম্ন বাহুকে টেনে বাঁকা করে। আবার যখন কনুই সোজা করি তখন উর্ধ্ব বাহুর পেছনের পেশী সংকুচিত হয়ে নিম্ন বাহু টেনে সোজা করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে হাত সোজা করা বা বাঁকানো এটা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আমাদের ইচ্ছাতেই এসব পেশী সংকুচিত হয় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। অর্থাৎ যে পেশী আমরা ইচ্ছামত সংকুচিত করে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারি তাকে ঐচ্ছিক পেশী বলে। মানব দেহে ঐচ্ছিক পেশীর সংখ্যা বেশি। এ পেশী হাড়ের সাথে লেগে থেকে আমাদের অঙ্গ চালনাকে সাহায্য করে।

অনৈচ্ছিক পেশী

চিত্র ১৬.৪: অনৈচ্ছিক পেশী

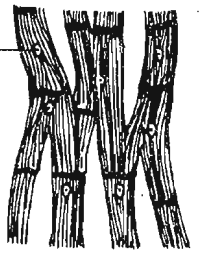

চিত্র ১৬.৫: হৃদপেশী

আমাদের খাদ্য নালীতে খাদ্য পরিবহনের দায়িত্ব পালন করছে অন্ত্রের পেশী। এ ধরনের পেশীর উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। অর্থাৎ যেসব পেশী আমাদের ইচ্ছামত সংকুচিত হয় না তাদের অনৈচ্ছিক পেশী বলে। হৃদপেশী নামে আর এক ধরনের বিশেষ অনৈচ্ছিক পেশী আছে। এ পেশী নিজ ছন্দে পর্যায়ক্রমে সংকুচিত ও স্বাভাবিক হয়ে দেহে রক্ত সঞ্চালন করছে। শুধু হৃৎপিন্ড এ পেশী দ্বারা গঠিত।

কীভাবে পেশী সবল রাখা যায়?

ঘাড়, হাত–পা, পেট ইত্যাদির পেশী বিভিন্নভাবে কাজ করছে। কাজ করলে পেশী সুস্থ ও সবল থাকে। যাঁরা শারীরিক পরিশ্রম কম করেন যেমন অফিসে কাজ করেন তাঁদের পেশী সবল রাখার জন্য ব্যায়াম করা দরকার। সাঁতার হচ্ছে সবচেয়ে ভাল ব্যায়াম। এতে দেহের সব অঙ্গের পেশী চালনা হয় বলে শরীরের সব অঙ্গের পেশী কর্মক্ষম থাকে। ব্যায়াম করলে পেশী সবল হয় ও মজবুত থাকে।

পেশীর কাজ

১) দেহের আকৃতি দান করে ও অস্থি সঞ্চালনে সহায়তা করে।
২) নড়াচড়া ও চলাচলে সাহায্য করে।
৩) দেহের ভেতরের অঙ্গাগুলোকে রক্ষা করে।
৪) হৃদপেশী দেহে রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করে।

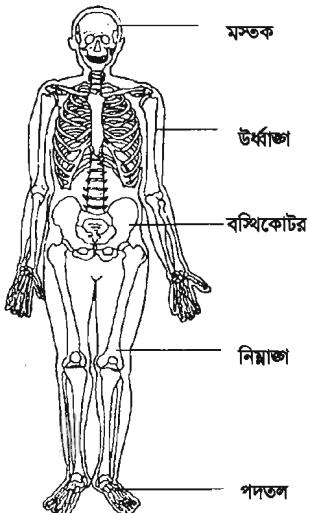

চিত্র ১৬.৬ : নর কঙ্কাল

কঙ্কাল

তোমরা অনেকেই ছোট বেলায় মাটি, পাটের আঁশ বা তুলার তৈরি পুতুল নিয়ে খেলেছো। পুতুল কীভাবে তৈরি করা হয় তা কি জান? বলছি শোন। পুতুল তৈরির জন্য প্রথমে প্রয়োজনীয় মাপের দুটি শক্ত কাঠি আড়াআড়িভাবে বেধে নিয়ে একটি মজবুত কাঠামো তৈরি করা হয়।

তারপর এর উপর পরিমাণমত মাটি, পাটের আঁশ বা তুলো লাগিয়ে ইচ্ছামত আকৃতি দেয়া হয়। তারপর এতে রং লাগিয়ে আকর্ষণীয় করা হয়।

পুতুলের দেহকাঠামো তৈরিতে যেমন কাঠি ব্যবহার করা হয় তেমনই আমাদের দেহকাঠামো তৈরির জন্য রয়েছে কাঠির পরিবর্তে হাড় বা অস্থির তৈরি কঙ্কাল। এ কঙ্কালের সাথেই লেগে রয়েছে চামড়ায় আবৃত মাংসপেশী।

কঙ্কালের কাজ

১। কঙ্কাল আমাদের দেহের কাঠামো ঠিক রাখে। কঙ্কাল না থাকলে দেহ একটি মাংস পিণ্ডাকার হত।
২। কঙ্কালের জন্য আমরা সোজা হয়ে থাকতে পারি এবং নড়াচড়া করতে পারি।
৩। কঙ্কাল আমাদের অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গাগুলো যেমন হৃদপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদিকে ঢেকে রাখে। ফলে এগুলো বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা পায়।
৪। কঙ্কাল দেহের ভার বহন করে।
৫। কঙ্কাল পেশী আটকে থাকার তল সৃষ্টি করে।
৬। কঙ্কাল পেশীর সংকোচনের মাধ্যমে চলাচলে সহায়তা করে।

মানুষের কঙ্কাল ২০৬ খানা হাড় বা অস্থি নিয়ে গঠিত। এ হাড়গুলোর আকৃতি সব একরকম নয়। কোনটি লম্বা, কোনটি খাট আবার কোনটি বা চ্যাপ্টা। কঙ্কালের সবচেয়ে বড় অস্থি হলো ফিমার এবং সবচেয়ে ছোট হলো কানের ভেতরের অস্থি। তার নাম স্টেপস।

মানব কঙ্কাল চার ভাগে বিভক্ত। যথা মাথার খুলি বা করোটি, দেহকাণ্ড, উর্ধ্বাঙ্গ এবং নিম্নাঙ্গ।

মাথার খুলি বা করোটি : এটা অস্থির আবরণ। বাইরের আঘাত থেকে মস্তিষ্ককে রক্ষা করে। মাথার খুলিতে আরো সুরক্ষিত থাকে নাক, কান ও চোখ।

দেহকাণ্ড : মেরুদণ্ড, বক্ষপিঞ্জর ইত্যাদি নিয়ে দেহকাণ্ড গঠিত। আমাদের মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়াতে রয়েছে তেত্রিশ খানা অস্থি। মেরুদণ্ড দেহকে সোজা রাখে এবং মস্তিষ্কের ভার বহন করে।

বক্ষপিঞ্জর : এটা অনেকটা খাঁচার মত। বার জোড়া অস্থি দ্বারা গঠিত। এটা আমাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদিকে বেস্টন করে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে।

উর্ধ্বাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গ : উর্ধ্বাঙ্গ ৬৪টি এবং নিম্নাঙ্গ ৬২টি অস্থি দ্বারা গঠিত। এরা নড়াচড়া ও হাঁটা চলাতে সাহায্যে করে।

অস্থিগুলো একটির সঙ্গে আর একটি সংযুক্ত হয়ে আমাদের দেহ কঙ্কাল গঠন করে। অস্থির জোড়াকে অস্থিসন্ধি বলে। অস্থিসন্ধি দুই প্রকার। যথা সচল অস্থি সন্ধি এবং অচল অস্থি সন্ধি।

সচল অস্থিসন্ধি : সচল অস্থিসন্ধির অস্থিগুলো প্রয়োজন মত নড়াচড়া করতে পারে। যথা হাতের কব্জি, কনুই ইত্যাদি।

অচল অস্থিসন্ধি : এ ধরনের অস্থি সন্ধি খুব মজুবত। তাই অচল অস্থিসন্ধির অস্থিগুলো নড়াচড়া করে না। মাথার খুলিতে এ ধরনের অস্থি সন্ধি আছে।

হাড়ের গঠন

হাড় বা অস্থি অসংখ্য অস্থিকোষ দিয়ে গঠিত। অস্থি খুব শক্ত। এতে ক্যালসিয়াম জাতীয় লবণ ও পানি রয়েছে। হাড়ের প্রান্তভাগ এক ধরনের মসৃণ আবরণে ঢাকা থাকে। এ আবরণকে বলা হয় তরুণাস্থি। তরুণাস্থি নরম কোষ দিয়ে তৈরি। আমাদের নাকের ডগা, বহিঃকর্ণ ইত্যাদি তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত। হাড় ও তরুণাস্থি দ্বারাই কঙ্কাল গঠিত। অস্থির বাইরে পাতলা এক ধরনের আবরণ থাকে। একে অস্থি আবরণী বলে। অস্থির ভেতরে রয়েছে রক্তনালী ও স্নায়ু।

অস্থির দু প্রান্তে অবস্থিত স্পঞ্জের মতো ছিদ্রযুক্ত অংশকে স্পঞ্জি অস্থি বলে। অস্থির নলাকার অংশের ভেতর রয়েছে

অস্থি মজ্জা। অস্থির প্রান্তদেশে তরুণাস্থি ও স্পঞ্জি অস্থির মাঝের অংশকে বলে নিরেট অস্থি। এটাই অস্থির শক্ত অংশ।

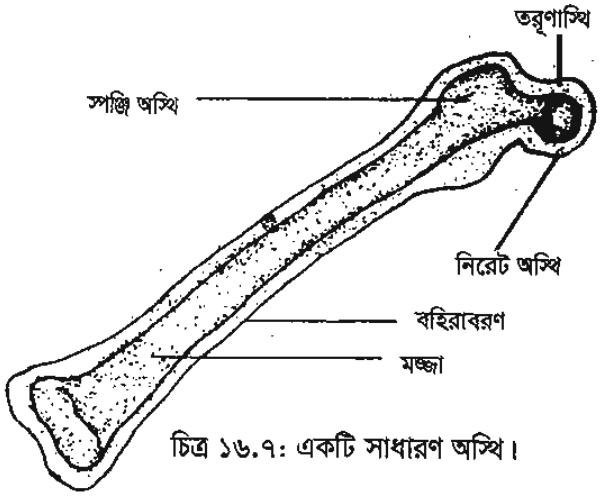

চিত্র ১৬.৭: একটি সাধারণ অস্থি।

এ অধ্যায়ের নতুন শব্দ

ত্বক	অনৈচ্ছিক পেশী	বক্ষপিঞ্জর	অস্থিসন্ধি
মেলানিন	হৃদপেশী	শিরদাঁড়া	ঊর্ধ্বাঙ্গ
ঘর্মগ্রন্থি	কঙ্কাল	অস্থি	নিম্নাঙ্গ
ঐচ্ছিক পেশী	করোটি	তরুণাস্থি	অস্থি মজ্জা

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. বহি:ত্বকে কোনটি আছে ?

ক. লোম খ. তেলগ্রন্থি
গ. ঘর্মগ্রন্থি ঘ. স্বেদগ্রন্থি

২. কোন অঙ্গের পেশীর উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই ?

ক. হাতের খ. চোয়ালের
গ. পায়ের ঘ. পাকস্থলি

৩. অস্থিতে কোন লবণের পরিমাণ বেশি ?

ক. ক্যালসিয়াম খ. সালফার
গ. লোহা ঘ. ফসফরাস

৪. তরুণাস্থি হাড়ের কোথায় থাকে ?

ক. ভিতরে
খ. বাইরে
গ. প্রান্তে
ঘ. সব জায়গাতেই

নিচের চিত্র থেকে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

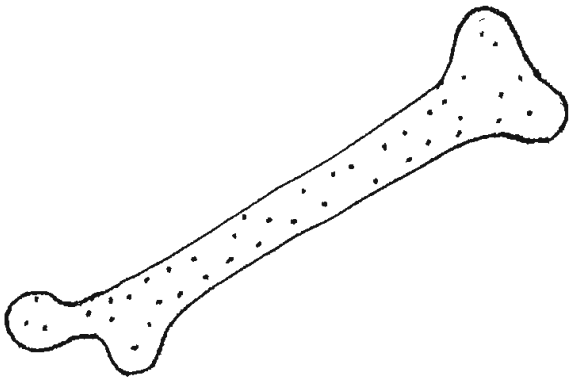

চিত্র

৫. চিত্রটি হচ্ছে

i. ঊর্ধ্বাঙ্গের একটি অস্থির
ii. নিম্নাঙ্গের একটি অস্থির
iii. একটি সাধারণ অস্থির

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৬. উপরের চিত্রটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

i. অসংখ্য অস্থিকোষ দিয়ে গঠিত
ii. এতে ক্যালসিয়াম ও লবণ আছে
iii. এর ভিতরে অস্থিমজ্জা আছে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

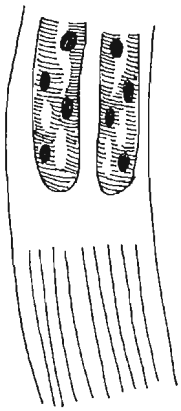

চিত্র A

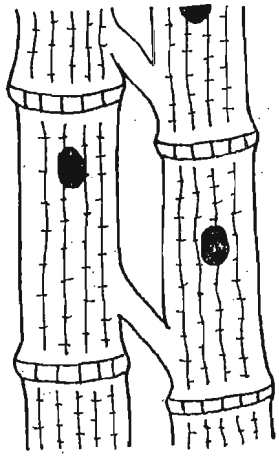

চিত্র B

ক. চিত্র A কোন ধরনের পেশী ?
খ. চিত্র A এর পেশী কীভাবে কাজ করে ?
গ. চিত্র B এর পেশী এক বিশেষ ধরনের পেশী ব্যাখ্যা কর।
ঘ. আমাদের দেহে পেশী দুই রকম না হয়ে একরকম হলে কী হত আলোচনা কর।

২.

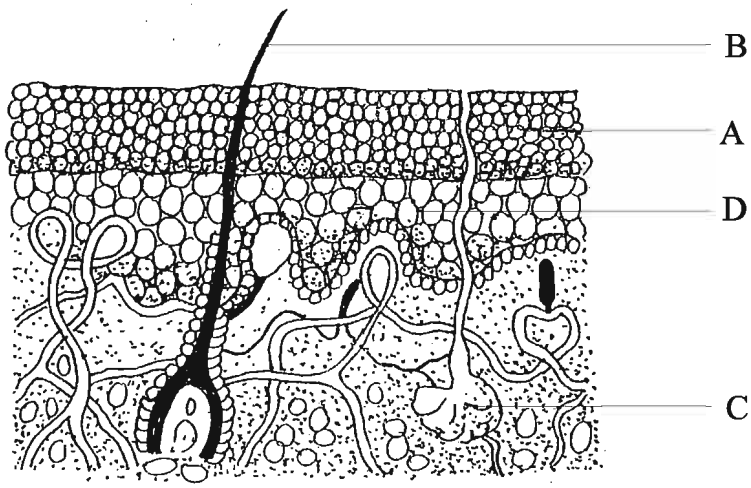

চিত্র : ত্বক

ক. A অংশটির নাম কী ?
খ. চিত্রের B অংশটি কাটলে ব্যাথা লাগে না কেন?
গ. দেহে C চিহ্নিত অংশটির কাজ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. A এবং D চিহ্নিত অংশ দুটির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

সপ্তদশ অধ্যায়

স্বাস্থ্য বিধি : চর্মরোগ

আমাদের চারপাশে নানা রোগজীবাণু ছড়িয়ে আছে। এসব জীবাণু খাদ্য, পানি, শ্বাস-প্রশ্বাস, হাত-পা এমনকি চর্মের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে রোগের সৃষ্টি করে। কলেরা, ডায়রিয়া, আমাশয় ও ক্রিমি উদরের মধ্যে হয় বলে এদেরকে উদরাময় রোগ বলে। আবার খোস-পাঁচড়া, দাদ, বিখাউজ, কুষ্ঠ চর্মের মধ্যে হয়ে থাকে বলে এদেরকে চর্মরোগ বলে। চর্মরোগের মধ্যে বিখাউজ, খোস-পাঁচড়া, দাদ ইত্যাদি অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। এসব রোগের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। সাধারণত এ রোগ তেমন মারাত্মক নয় বলে আমরা এদেরকে অগ্রাহ্য করে থাকি। কিন্তু কোনো রোগকেই অবহেলা করা উচিত নয়। অতএব রোগ ছোট হোক আর বড় হোক সব রোগেরই চিকিৎসা করা একান্ত প্রয়োজন।

ক. খোস-পাঁচড়া

খোস-পাঁচড়ার কারণ

খোস-পাঁচড়া এক প্রকার চর্মরোগ। তাছাড়া খোস-পাঁচড়া খুবই ছোঁয়াচে রোগ। খোস-পাঁচড়া সাধারণত অপরিচ্ছন্নতার জন্য হয়ে থাকে। যারা অতি ঘন বসতিতে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এবং স্বল্প জায়গায় অনেক লোক একত্রে বাস করে তাদের খোস-পাঁচড়া বেশি হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এ রোগের নাম স্ক্যাবিস। খোস-পাঁচড়া সারকপটিক স্ক্যাবি নামক অতি ক্ষুদ্র কীটের মাধ্যমে উৎপত্তি হয়। এই কীট মানুষের চামড়ার ওপরে ও ভেতরে বাস করতে পারে। খোসের কীট চর্ম ভেদ করে চর্মের নিচের সুড়ঙ্গের মধ্যে গর্ত করে বাসা বাঁধে। গর্তের মধ্যে স্ত্রী কীট এক সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০টি ডিম পাড়ে। ডিমগুলো ফুটে সপ্তাহে বড় কীটে পরিণত হয়। এই নতুন কীটগুলো শরীরের অন্যান্য স্থানে চর্মে গর্ত করে ডিম পাড়ে। কীট যেখানে বাসা বাঁধে সেখানের চর্মে ছোট ফুসকুড়ি হয়। এই ফুসকুড়ি খুব চুলকায়। নখ দিয়ে খোস চুলকানোর পর এই নখ দিয়ে শরীরের অন্যান্য স্থান চুলকালে সেখানে কীটের ডিম লেগে যায়। এভাবে দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খোস ছড়িয়ে পড়ে। বাচ্চা ও বয়স্কদের শীতকালে খোস-পাঁচড়া বেশি হয়।

খোস-পাঁচড়ার লক্ষণ

খোস-পাঁচড়া অতিশয় কষ্টদায়ক রোগ। এ রোগের লক্ষণ প্রথমত হাতের দুই আঙুলের মধ্যবর্তী স্থানে, হাতের কব্জি, কনুই, বগল, কোমর, নাভির কাছে, উরু প্রভৃতি স্থানে বেশি দেখা যায়। খোস-পাঁচড়া প্রথমে বাড়ে। রাতে খোস-পাঁচড়ার চুলকানি বেশি হয়। কারণ বিছানায় শোয়ার পর গরম পরিবেশে খোস-পাঁচড়ার কীটের চলাফেরা বাড়ে। যখন ক্ষত পুঁজে ভরে ওঠে তখন ব্যথা হয় এবং শরীরে জ্বর হয়।

খোস-পাঁচড়া কীভাবে বিস্তার লাভ করে?

খোস-পাঁচড়া আক্রান্ত রোগীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে থাকলে রোগীর শরীর থেকে কীট বেরিয়ে অন্যের দেহে প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া রোগীর ব্যবহৃত বিছানা, কাপড়-চোপড়, থালা-বাসন ইত্যাদিতেও খোস-পাঁচড়ার কীট ছড়িয়ে থাকতে পারে। রোগীর এসব ব্যবহার্য জিনিসপত্র, কাপড়-চোপড়, থালা বাসন এমনকি তার বিছানায় বসলে এবং ঘুমালেও খোস-পাঁচড়ায় আক্রান্ত হতে পারে। রোগীর হাতের নখে পাঁচড়ার পোকা লেগে থাকে। সে যদি অন্যের কাপড়-চোপড়, থালাবাসন, বিছানাপত্র ও অপরাপর জিনিসপত্র ব্যবহার করে তাহলে অন্যেরাও খোস-পাঁচড়ায় আক্রান্ত হবে।

প্রতিরোধ

খোস-পাঁচড়ায় আক্রান্ত রোগী দ্বারা যেন পরিবারের অন্য সদস্যরা আক্রান্ত না হতে পারে সে জন্য নিম্নলিখিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া যায়:

১। আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত রোগীর সাথে মেলামেশা না করা।
২। রোগীকে আলাদা রাখা এবং পৃথক বাসনপত্র ব্যবহার করতে দেওয়া।
৩। রোগীর কাপড়, বিছানাপত্র, বাসনপত্র, প্রতিদিন সোডা পানিতে সিদ্ধ করা এবং রোদে ভালভাবে শুকানো।
৪। রোগীর নখ ছোট করে কেটে ফেলা।
৫। রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

প্রতিকার

১। রোগীকে সাবান দিয়ে ভাল করে ঘষে গরম পানি দিয়ে গোসল করাতে হবে।
২। শরীর শুকানোর পর ২৫% বেনজাইল বেনজয়েট লোশন ২ ভাগ পানির সঙ্গে মিশিয়ে পর পর তিন দিন গলার নিচে থেকে সমস্ত শরীরে লাগাতে হবে। তিন দিন পর সাবান দিয়ে শরীর ঘষে উত্তমরূপে গোসল করাতে হবে। সে সঙ্গে রোগীর ব্যবহার্য সকল কাপড়–চোপড় সোডা দিয়ে সিদ্ধ করে ধুতে হবে এবং রোদে শুকাতে হবে।
৩। চুলকানোর জন্য ক্লোরফিনারামিন ট্যাবলেট দিনে ৩ বার সেবন করতে হবে এবং জীবাণু সংক্রমিত হলে পেনিসিলিন বা অ্যামপিসিলিন গ্রুপের ওষুধ বয়স অনুসারে দিতে হবে।
৪। চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

খ. দাদ রোগ

দাদ এক প্রকার চর্মরোগ। এই রোগ ছোটদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। রোগীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার ফলে এই রোগ অন্যের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। অর্থাৎ দাদ একটি সংক্রামক রোগ।

কারণ

দাদ মাইক্রোস্পোরন এবং ট্রাইকোফাইটন নামক দুই প্রকার ফাংগাস দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

লক্ষণ

দাদ শরীরের খোলা ও আবৃত অংশে প্রথমে দেখা দেয়। পরবর্তীতে শরীরের বিভিন্ন অংশে বিস্তার লাভ করে। যেমন হাতে, পায়ে, পেটে, পিঠে, কোমরে ও উরুর উপরিভাগে দেখা যায়।

প্রথমে দানার মত ফুসকুড়ি ও আঁশ দেখা যায়। এই দানার ভেতরে ফাংগাস বড় হয়ে চাকা বা রিং এর মত আকার ধারণ করে এবং পরে এক বা একাধিক স্থানে বিস্তার ঘটায়। চাকার চারপাশের চামড়া ফুলে উঠে। তখন খুব চুলকানি হয়। দাদ মাথায়, গায়ে ও নখেও সংক্রমিত হতে দেখা যায়।

বিস্তার

দাদের ক্ষতস্থান থেকে পুঁজের সঙ্গে ফাংগাস নির্গত হয় এবং সেগুলো রোগীর কাপড়–চোপড়, বিছানাপত্রে ছড়িয়ে পড়ে। দাদ আক্রান্ত ব্যক্তির বিছানা, পোশাক–পরিচ্ছদ, বাসন–পত্র অন্যেরা ব্যবহার করলে দাদে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। রোগীর সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে তারাও দাদে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। দাদ চুলকানোর দরুন ফাংগাস রোগীর নখে ঢুকে যায়। পরে এই হাত দিয়ে অন্যের জামাকাপড়, থালাবাসন, বিছানাপত্র ধরলে তাতে ফাংগাস লেগে গিয়ে সুস্থ ব্যক্তিকে দাদে আক্রান্ত করে ফেলে।

প্রতিরোধ

১। দাদ রোগীর জামাকাপড়, বিছানাপত্র প্রতিদিন সোডা পানি দিয়ে সিদ্ধ করে ধৌত করা।

২। রোগীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা না করা, তার জামাকাপড়, থালাবাসন অন্যকে ব্যবহার করতে না দেওয়া এবং অন্যের ব্যবহৃত জিনিসপত্র রোগীকে ব্যবহার করতে না দেওয়া।

৩। সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা।

৪। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে চলা, পথ্য এবং ওষুধ নিয়মিত খাওয়া ও ব্যবহার করা।

প্রতিকার

১। মাথায় দাদ হলে প্রথমে মাথা ন্যাড়া করে সেলিসাইলিক এসিড ঘটিত মলম দিনে ২ বার প্রয়োগ করা, যত দিন চুল গজিয়ে বড় না হয়।

২। শরীরের অন্যান্য স্থানে দাদ হলে আয়োডিন বা সেলিসাইলিক এসিড, বেনজায়িক এসিড ওয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করা।

৩। নখে দাদ হলে নখের মরা অংশ তুলে ফেলে তাতে ক্রমাগত টিনচার আয়োডিন প্রয়োগ করা। অধুনা ফাংগাস ধ্বংসকারী অ্যান্টিবায়োটিক গ্রাইসোফুলবিন নামক ওষুধেও দাদ সেরে যায়।

গ. কুষ্ঠ রোগ

কুষ্ঠ রোগের কারণ

কুষ্ঠ এক প্রকার মারাত্মক রোগ। এটি ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়। কুষ্ঠ রোগের জীবাণুর নাম মাইক্রোব্যাকটেরিয়া লেপ্রী। এই রোগ দুই প্রকার। যথা সংক্রামক এবং অসংক্রামক। সংক্রামক রোগীর শরীরে অসংখ্য রোগ জীবাণু পাওয়া যায়। কিন্তু অসংক্রামক রোগীর শরীরে অল্প সংখ্যক রোগ জীবাণু পাওয়া যায়। কুষ্ঠ রোগ কোনো অভিশাপের ফল নয়। তাছাড়া কুষ্ঠ রোগ কোনো বংশগত রোগও নয়। এই রোগ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে সম্পূর্ণভাবে সেরে যায়।

কুষ্ঠ রোগ কীভাবে ছড়ায়?

কুষ্ঠ রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস, হাঁচি, কাশির মাধ্যমে জীবাণু বাতাসে ছড়িয়ে যায়। সুস্থ মানুষের শরীরে শ্বাস-প্রশ্বাসে কুষ্ঠ রোগের জীবাণু প্রবেশ করে রোগের উৎপত্তি করে।

কুষ্ঠ রোগের লক্ষণ

কুষ্ঠ রোগের আক্রমণ অতি ধীরে ধীরে আরম্ভ হয়। তাছাড়া এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবার আগে সামান্য জ্বর, বেদনা এবং দুর্বলতা দেখা দেয়। কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত রোগীর শরীরে বিশেষ করে কানের লতি, মুখমণ্ডল ও শরীরের অন্যান্য স্থানে অসংখ্য গুটি দেখা যায়। আবার কোনো কোনো স্থানে চামড়া মোটা হয়ে যায়। এছাড়া শরীরের বিভিন্ন অংশের চামড়ায় ফ্যাকাশে বা লালচে অনুভূতিহীন দাগও দেখা যায়। বিভিন্ন অঙ্গের বিকলাঙ্গতা এই রোগের অন্যতম লক্ষণ। যেমন হাত ও পায়ের আঙুল বেঁকে যাওয়া, হাতের মাংসপেশী শুকিয়ে যাওয়া, হাত-পা ও অন্যান্য স্থানে ঘা হওয়া, চোখ বন্ধ না হওয়া, হাত ও পা নেতিয়ে পড়া, শরীরের বিশেষ অংশ অবশ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

কুষ্ঠ রোগের নিদর্শন

অনুভূতিহীন দাগ, গুটি বা দানা শরীরে দেখা দিলে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। রোগীর দেহের টিস্যু থেকে রস নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করে জীবাণু পেলে নিশ্চিতভাবে বলা হয় যে কুষ্ঠ রোগ হয়েছে।

কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা

কুষ্ঠ রোগ আধুনিক চিকিৎসায় সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হয়। দেশের প্রতিটি থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, টিবি হাসপাতালে এবং কুষ্ঠ হাসপাতালে বিনামূল্যে এই রোগের চিকিৎসা করা হয়।

বাংলাদেশে ৩টি সরকারি কুষ্ঠ হাসপাতাল আছে। এই তিনটি হাসপাতাল হল

(১) কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা।

(২) নীলফামারী কুষ্ঠ হাসপাতাল, নীলফামারী।

(৩) সিলেট কুষ্ঠ হাসপাতাল, সিলেট।

এছাড়া বেসরকারিভাবে ১১টি প্রতিষ্ঠান কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমানে কুষ্ঠ রোগ অন্যান্য রোগের মত সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য একটি ব্যাধি।

ঘ. ত্বকের যত্ন

আমাদের শরীর ত্বক বা চর্ম দিয়ে আবৃত। ত্বক শরীরের কোমল অংশগুলোকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। তাছাড়া ত্বক শরীরের তাপের সমতা রক্ষা করে। দেহের অতিরিক্ত তাপ ত্বক দিয়ে বিকিরিত হয় বলে দেহের তাপ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। ত্বকের স্পর্শশক্তি আছে তাই কোনো জিনিস গরম কী ঠান্ডা, ভারী কী হালকা বুঝতে পারি। শরীরের ত্বক বা চামড়ায় ছোট ছোট ছিদ্র আছে, এ ছিদ্রগুলোকে লোমকূপ বলে। এসব লোমকূপ দিয়ে ঘাম ও দেহের ভেতরের কিছু দূষিত পদার্থ বের হয়ে যায়। শরীরে ধুলাবালি লেগে ঘামের সাথে মিশে ত্বকের উপর ময়লার আবরণের সৃষ্টি হয়। এই ময়লা প্রতিদিন পরিষ্কার না করলে লোমকূপ বন্ধ হয়ে যায়। শরীরের দূষিত পদার্থ বের হতে পারে না। পরিণামে দেহে খোস–পাঁচড়া, দাদ, বিখাউজ প্রভৃতি চর্ম রোগের সৃষ্টি হয়। অতএব আমাদের সকলের ত্বকের যত্ন করা একান্ত প্রয়োজন। ত্বক পরিষ্কার রাখার জন্য প্রতিদিন গোসল করা দরকার। গোসলের সময় গামছা দিয়ে ভালভাবে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে যেন গায়ের ময়লা উঠে যায়। তাছাড়া সপ্তাহে কমপক্ষে দুদিন সাবান ব্যবহার করা উচিত। কাপড় কাচার সাবান গায়ে মাখা ঠিক নয়। কারণ এ সাবানে ক্ষারের পরিমাণ বেশি থাকে বলে চামড়া রুক্ষ করে ফেলে।

গোসল ছাড়াও প্রত্যহ কমপক্ষে তিন/চার বার হাত পা, মুখ ঠান্ডা ও পরিষ্কার পানি দিয়ে ধোয়া একান্ত প্রয়োজন। সে সঙ্গে হাত–পা, মুখ মোছার গামছা বা তোয়ালে এবং ব্যবহার্য বিছানাপত্র, কাপড় চোপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত প্রয়োজন।

এ অধ্যায়ের নতুন শব্দ

স্ক্যাবিস

ফুসকুড়ি

ট্রাইকোফাইটন

অ্যামপিসিলিন

ফাংগাস

গ্রাইসোফুলবিন

বেনজয়িক এসিড

টিস্যু

মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম

সারকপটিস

বেনজাইল–বেনজয়েট

ক্লোরাফিনারামিন

মাইক্রোস্পোরন

সেলিসাইলিক এসিড

আয়োডিন

ওয়েন্টমেন্ট

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কোনটি ত্বকের কাজ ?
   ক. কুষ্ঠ হতে দেওয়া
   খ. লোমকূপ দিয়ে ঘাম বের হতে না দেওয়া
   গ. বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করা
   ঘ. শরীর নিরোগ রাখা

২. কাপড় কাচার সাবান গায়ে মাখা ঠিক নয় কারণ ?
   ক. এ সাবানে গন্ধ নেই
   খ. এ সাবানে ফেনা হয় না
   গ. এ সাবানে চর্বির পরিমাণ বেশি
   ঘ. এ সাবানে ক্ষারের পরিমাণ বেশি

৩. দাদ রোগে খাওয়া ওষুধের নাম
   ক. গ্লাইসোফুলবিন
   খ. রিফামপিসিন
   গ. টেট্রাসাইক্লিন
   ঘ. আয়োডিন

৪. দানার মত ফুসকুড়ি ও আঁশ দেখা যায়
   ক. কুষ্ঠ রোগ হলে
   খ. খোস পাঁচড়া হলে
   গ. দাদ হলে
   ঘ. বমি হলে

৫. কুষ্ঠ রোগের লক্ষণ হল
   ক. গায়ে চাকার মত ফুলে ওঠা
   খ. হাত পা নেতিয়ে পড়া
   গ. চুলকানি হওয়া
   ঘ. হাতের দুই আঙ্গুলের মধ্যবর্তী স্থানে গুটি হওয়া

৬. দাদ রোগের লক্ষণ
   i. ফুসকুড়ি ও আঁশ হয়
   ii. মাংসপেশী শুকিয়ে যায়
   iii. চাকা বা রিং এর চারপাশের চামড়া ফুলে যায়

নিচের কোনটি সঠিক ?
   ক. i
   খ. i ও ii
   গ. i ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

সোহেল গ্রীষ্মের ছুটিতে ঢাকা থেকে গ্রামে তার দাদার বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখানে সে তার চাচাতো ভাইবোনদের সাথে খেলাধূলা হৈ চৈ ও আমোদ প্রমোদে ৭ ৮ দিন সময় কাটায়। কিন্তু সেখান থেকে বাসায় ফেরার পর তার মা দেখল তার হাতে, পায়ে চুলকানি হয়েছে। তার মা এগুলোকে চর্মরোগ বলে চিহ্নিত করলো।

ক. চর্মরোগ কী ?
খ. সোহেলের চর্মরোগটিকে কী বলা হবে এবং কেন ?
গ. সোহেলের চর্মরোগ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সোহেল কীভাবে অতি দ্রুত এ রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারে, তা আলোচনা কর।

২. আনিস প্রায় একমাস ধরে জ্বরে ভোগে। অতঃপর দেখে শরীরের বিভিন্ন স্থানে কালো কালো দাগ পড়ে গেছে। কোথাও কোথাও ঘা হয়েছে এবং শরীর বেশ দুর্বল। তার প্রতিবেশীরা এ অবস্থাকে কুষ্ঠরোগ বলে চিহ্নিত করে এবং তার সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দেয়।

ক. কুষ্ঠরোগ কাকে বলে ?
খ. কুষ্ঠরোগকে সংক্রামক রোগ বলা হয় কেন ?
গ. আনিসের কুষ্ঠরোগ প্রকাশের জন্য উপরের লক্ষণগুলো কতটুকু সঠিক তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. আনিসের প্রতি তার প্রতিবেশীদের আচরণ ঠিক কিনা তোমার মতামত দাও।

অষ্টাদশ অধ্যায়

খাদ্য ও পুষ্টি

খাদ্য ছাড়া কোনো জীব বাঁচতে পারে না। বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য অপরিহার্য। তাছাড়া খাদ্য গ্রহণ করা বিশ্বের সকল জীবের একটি সহজাত অভ্যাস। খাদ্য সকল জীবের কর্মশক্তি যোগায় অর্থাৎ খাদ্য শক্তির উৎস। আমরা যা খাই তা হজম হয়ে শরীরে শক্তি হিসেবে জমা হয়। আবার যখন কোনো কাজ করি তখন দেহের কিছু শক্তি ক্ষয় হয়। এই ক্ষয় আমরা খাদ্য গ্রহণ করে পূরণ করি। বলা যায় শরীর সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম, নীরোগ রাখা এবং শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন ইত্যাদি সব কিছুর মূল হল খাদ্য।

তোমরা পূর্ববর্তী শ্রেণীতে পড়েছ শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য যা খাওয়া হয় তাই খাদ্য। এ কথা থেকে আমরা খাদ্য সম্পর্কে পুরোপুরি জানতে পারি না। কারণ মানুষ সব কিছু খেতেও পারে না আবার খেলেও তা হজম করতে পারে না। সুতরাং যে সকল দ্রব্য মানুষ খেয়ে হজম করতে পারে এবং যে সকল দ্রব্য গ্রহণ করলে শরীরের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, তাপ উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তাকেই খাদ্য বলা হয়।

এ আলোচনা থেকে আমরা এও বুঝলাম যে, খাদ্য গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য হল শরীরকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখা। শরীরের সুস্থতা নির্ভর করে দেহের পুষ্টি সাধন প্রক্রিয়ার উপর। আমরা যত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করি না কেন পুষ্টিসাধন যদি ঠিক মত না হয় তবে শরীর ভাল হবে না। তাই আমাদেরকে পুষ্টি কী তা ভালভাবে জানতে হবে। যে প্রক্রিয়ায় দেহের খাদ্য পরিপাক হয়ে শক্তিতে পরিণত হয় এবং কোষের মাধ্যমে শরীরে ছড়িয়ে গিয়ে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও তাপ শক্তি উৎপাদন করে তাকে পুষ্টি বলে।

খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

খাদ্য আমাদের দেহের অনেক প্রয়োজন মেটায় এবং অনেক রকম কাজ করে। নিচে সংক্ষেপে তা উল্লেখ করা হল :

১। দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধনের জন্য খাদ্য প্রয়োজন।

২। ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য দরকার।

৩। কাজ কর্মের ফলে দেহে প্রতি মুহূর্তে যে ক্ষয় হয় তা পূরণের জন্য খাদ্য দরকার।

৫। খাদ্য দেহকে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

৬। খাদ্য দেহকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখে।

খাদ্যের প্রকারভেদ

খাদ্য তিন প্রকার। যথা শ্বেতসার, আমিষ, চর্বি। তবে খাদ্যের উপাদান ৬টি। যথা

(ক) শ্বেতসার (খ) আমিষ (গ) চর্বি

(ঘ) ভিটামিন (ঙ) লবণ এবং (চ) পানি।

(ক) শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাদ্য

আটা, ময়দা, চাল, আলু, গুড় চিনি ইত্যাদি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য।

কাজ

১। দেহের কাজ করার শক্তি যোগায় ও তাপ উৎপন্ন করে।

২। সেলুলোজ জাতীয় শর্করা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

৩। প্রয়োজনের অতিরিক্ত শর্করা দেহে মেদ বৃদ্ধি করে এবং শরীর মোটা হয়। ফলে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের অভাবে শরীরের ওজন কমে যায়, ক্ষুধা বাড়ে ও শরীরে দুর্বলতা দেখা দেয়।

চিত্র ১৮.১: শর্করা জাতীয় খাদ্য

(খ) আমিষ বা প্রোটিন

মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য (যেমন ছানা, পনির ইত্যাদি) শিম, বরবটির বীজ, বিভিন্ন প্রকার ডাল (যেমন মসুর, মুগ, ছোলা, অড়হর ইত্যাদি) আমিষ জাতীয় খাদ্য।

কাজ

১। আমিষ দেহের বৃদ্ধিসাধন ও ক্ষয়পূরণ করে।

২। দেহে শক্তি উৎপন্ন করে।

৩। দেহে রোগ প্রতিরোধকারী এন্টিবডি আমিষ থেকে তৈরি হয়।

আমিষের অভাবে দেহের মাংসপেশী দুর্বল হয়ে পড়ে ফলে কর্মক্ষমতা কমে যায়। রক্তস্বল্পতা ও অজীর্ণ রোগ হয়।

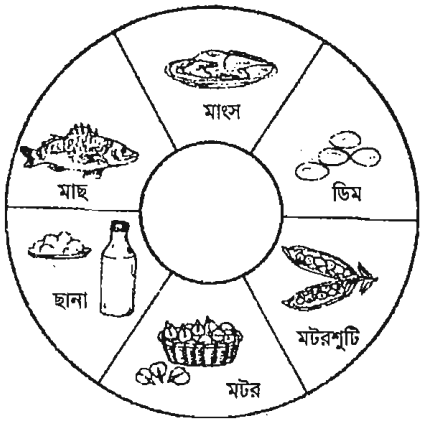

চিত্র ১৮.২: আমিষ জাতীয় খাদ্য

(গ) চর্বি বা স্নেহ জাতীয় খাদ্য

ঘি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি স্নেহ জাতীয় খাদ্য।

কাজ

১। দেহের তাপ ও কর্মশক্তি বাড়ায়।

২। দেহের আমিষকে ক্ষয় হতে রক্ষা করে।

৩। দেহে ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে এর যোগান দেয়।

৪। দেহের সৌন্দর্য বাড়ায়

৫। চর্ম রোগ প্রতিরোধ করে।

চর্বি জাতীয় খাদ্যের অভাবে দেহে নানারকম চর্ম রোগ দেখা দেয়।

চিত্র ১৮.৩: চর্বি জাতীয় খাদ্য

(ঘ) ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ

আমাদের খাদ্যে এমন কিছু জৈব পদার্থ আছে যা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। এ প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থগুলোকে খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন বলে।

দ্রবণীয়তার উপর ভিত্তি করে ভিটামিনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা

১। **পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন যেমন** (ক) ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং (খ) ভিটামিন সি।

২। **চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন যেমন** ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, ভিটামিন ই এবং ভিটামিন কে।

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন

ভিটামিন বি কমপ্লেক্স–এর উৎস

ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অন্তর্ভুক্ত ভিটামিন হল:

ভিটামিন বি–১

চালের উপরের পাতলা আবরণে, অঙ্কুরিত ছোলায় ও তাজা ভাঙা আটায় প্রচুর পরিমাণে থাকে। এর অভাবে বেরিবেরি রোগ হয়।

ভিটামিন বি–২

দুধ, ডিম, যকৃত, বৃক্ক, নানা ধরনের শস্য ও সবুজ শাকপাতায় পাওয়া যায়। এর অভাবে ঠোঁটের কোণায় ঘা হয়, চোখে ছানি পড়ে, মাথার চুল পড়ে যায়।

ভিটামিন বি–৬

যকৃত, বৃক্ক, ডিম, নানা ধরনের শস্য, শাকসবজি ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। এর অভাবে দেহের ওজন কমে যায়, স্নায়ুবিক ক্ষয়, ক্রোধপ্রবণতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ভিটামিন বি–১২

যকৃত, বৃক্ক, ডিম, শাকসবজি ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। বর্তমানে এক প্রকার ব্যাঙের ছাতা থেকেও প্রস্তুত করা হচ্ছে। এর অভাবে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

ভিটামিন সি

সকল প্রকার লেবু, টমেটো, আম, পেয়ারা, আমলকি, আনারস, পেঁপে, বাঁধাকপি, ফুলকপি, লেটুস, পালং শাক, অঙ্কুরিত ছোলা ইত্যাদিতে ভিটামিন সি পাওয়া যায়। এর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়। এর ফলে ত্বকের নিচে রক্তজালক থেকে রক্তক্ষরণ হয়। মাড়ি ফুলে যায় এবং মাড়ি থেকে রক্ত পড়ে, অস্থি ও দন্তের গঠন বিকৃত হয়, ক্ষত শুকাতে দেরি হয়।

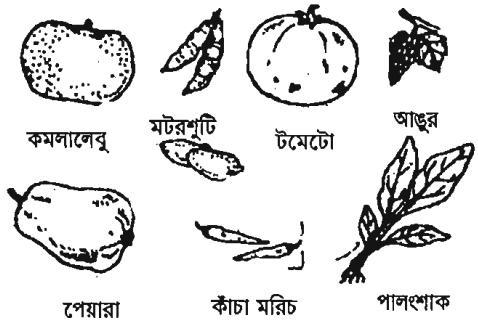

চিত্র ১৮.৪: ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাদ্য

চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন

ভিটামিন এ

দুধ, মাখন, ডিম, মাছ, কড মাছ, গাজর, শাক, হলুদ ফল ইত্যাদিতে বিদ্যমান। এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়।

চিত্র ১৮.৫: একটি রাতকানা রোগী

ভিটামিন ডি

ডিম, দুধ, দুগ্ধজাত খাদ্য, মাছের তেল ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। এর অভাবে শিশুদের রিকেট রোগ হয়।

চিত্র ১৮.৬: ভিটামিন–ডি

ভিটামিন ই

সবুজ শাকসবজি, পালংশাক, বাঁধাকপি, লেটুস ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

এর অভাবে স্বাভাবিক প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায় ও অকালে গর্ভপাত ঘটে।

চিত্র ১৮.৭: ভিটামিন-ই

ভিটামিন কে

বাঁধাকপি, টমেটো, সয়াবিন, পালংশাক ইত্যাদিতে অধিক পরিমাণে থাকে।

এর অভাবে রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা কমে যায়।

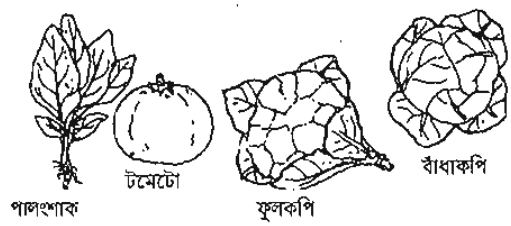

চিত্র ১৮.৮: ভটামিন-কে

(ঙ) খনিজ লবণ

দেহ গঠনে ও অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণে খনিজ লবণ অপরিহার্য। সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়োডিন, লোহা, তামা, ক্লোরিন, সালফার ইত্যাদি লবণ যকৃত, দুধ, ডিম, মাছ, সবুজ শাকসবজি ও ফল থেকে পাওয়া যায়।

আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড, লোহার অভাবে রক্তশূন্যতা এবং ক্যালসিয়ামের অভাবে রিকেট রোগ হয়।

চিত্র ১৮.৯: একজন গলগণ্ড রোগী

(চ) পানি

পানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান। সব খাদ্যে কমবেশি পানি থাকে। এছাড়া পানি পান করে পানির চাহিদা মেটান হয়। খাদ্য গলধঃকরণ, পরিপাক ও শোষণ করতে পানি দরকার। পানি রক্ত তরল রাখে এবং মলমূত্রের সাথে দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেয়। আমাদের দেহের ওজনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পানি। পানির অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয় এবং দেহে বিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে।

সুষম খাদ্য ও অসুষম খাদ্য

সুষম খাদ্য

যে খাদ্যের মধ্যে শর্করা, চর্বি, আমিষ, ভিটামিন, লবণ ও পানি এই ছয়টি উপাদান শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমাণমত ঠিক অনুপাতে থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে। দুধ একটি সুষম খাদ্য।

যে কোনো খাদ্য খেলে ক্ষুধা মেটানো যায় ঠিকই কিন্তু সব রকম খাদ্য উপাদান পরিমাণ মত না থাকলে স্বাস্থ্য গঠন হয় না। অর্থাৎ খাদ্যে এ ছয়টির যে কোনো একটির পরিমাণ কম হলে বা না থাকলে এর অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়। ফলে শরীর অকেজো হয়ে পড়ে। তাই শরীরের স্বাভাবিক গঠন ও বর্ধনের জন্য সুষম খাদ্য অত্যাবশ্যক।

অসম বা অসুষম খাদ্য

যে খাদ্যে এই ছয়টি খাদ্য উপাদানের এক বা একাধিক কম থাকে বা থাকে না তাকে অসম বা অসুষম খাদ্য বলে। আমাদের দেশে বেশির ভাগ লোকের খাদ্যই অসম। সাধারণ মানুষের খাদ্যে প্রায় সম্পূর্ণটাই শর্করা। প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমিত চর্বি, আমিষ, খনিজ লবণ ও ভিটামিনের অভাবে পুষ্টির অভাব হয় এবং রক্তশূন্যতায় ভোগে।

স্বল্পমূল্যে সুষম খাদ্য গ্রহণের উপায়

১। খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান লাভ করা।

২। পরিবারের আয় বা সামর্থ্য অনুযায়ী সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরি করা।

৩। খাদ্য তালিকায় কম দামের সুষম খাদ্য নির্বাচন করা।

বাসি, পচা বা ভেজাল খাদ্য গ্রহণের কুফল

রান্না করা খাদ্য ঢেকে না রাখলে ধূলিকণা পড়ে। মাছি, আরশোলা, ইঁদুরে খেলে নানা রকম জীবাণু মিশে গিয়ে খাদ্য দূষিত হয়। রান্না করা খাদ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে পচে যায়। পরে এ বাসি ও পচা খাবার খেলে নানা রকম অসুখ হয়। দূষিত, পচা, বাসি ইত্যাদি খাদ্য খেলে ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগ হয়। এসব রোগ জীবাণু খাদ্যের মধ্য থেকে নতুবা বাহির থেকে ধূলিকণার সঙ্গে খাদ্যে মিশে থাকে। সাধারণত ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা খাদ্য দুষিত বা নষ্ট হয়ে থাকে।

এছাড়া অসাধু ব্যবসায়ীরা বেশি লাভের আশায় খাদ্য দ্রব্যের সাথে নানা রকম নিকৃষ্ট মানের খাদ্য বা অখাদ্য মিশ্রিত করে বিক্রি করে থাকে। ভাল খাদ্যের সাথে এরূপ নিচুমানের খাদ্য ও অখাদ্য মিশ্রিত করাকে ভেজাল দেওয়া বলা হয়। এসব ভেজাল খাদ্য খেলে অজীর্ণ, ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয়, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি রোগ হয়। এতে স্বাস্থ্যহানি ঘটে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

খাদ্যমূল্য ও মান বজায় রেখে খাদ্যকে পচন রোধ করে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় সঞ্চয় করাকে খাদ্য সংরক্ষণ বলে। খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হল :

১। পচনশীল খাদ্যদ্রব্যকে পচন থেকে রক্ষা করে টাটকা ও তাজা রাখা।

২। ভবিষ্যতের খাদ্য নিশ্চয়তার জন্য সংরক্ষণ করা।

৩। খাদ্য সংরক্ষণ করে পরিবারের ও দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা।

৪। খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবারের খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র্য আনা।

৫। সংরক্ষিত খাদ্য বিদেশে রপ্তানি করে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যবস্থা করা।

৬। খাদ্যের অপচয় রোধ করা।

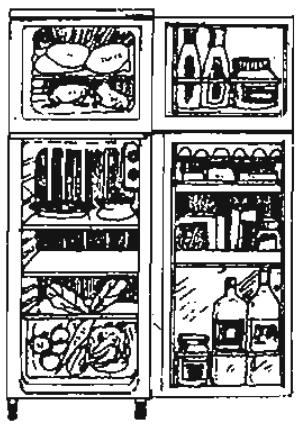

চিত্র ১৮.১০: রেফ্রিজারেটর

খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি

খাদ্যদ্রব্য সাধারণত নিচে বর্ণিত পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যায় :

১। খাদ্যদ্রব্য রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা। যেমন ধান, চাল, মাছ ইত্যাদি শুকিয়ে সংরক্ষণ করা।

২। তাপমাত্রা কমিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ করা। যেমন হিমাগারে, বরফে, ফ্রিজ ইত্যাদিতে খাদ্য সংরক্ষণ করা।

৩। লবণ, চিনি ও সিরকার মাধ্যমে খাদ্য সংরক্ষণ করা। যেমন মাছ, জলপাই, বড়ই, মটরশুটি ইত্যাদি।

৪। টিনে আবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা। উচ্চ তাপে রান্না করা খাদ্য টিনে বন্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত থাকে।

৫। পাস্তুরাইজেশন করে সংরক্ষণ করা। যেমন দুধকে ১৪০° ফা: থেকে ১৬০° ফা: উত্তাপে ১৫–২০ মিনিট রাখলে টিবি, কলেরা, টাইফয়েড, জীবাণু নষ্ট হয়।

এ অধ্যায়ের নতুন শব্দ

পুষ্টি	আমিষ	শর্করা	ভিটামিন
বেরিবেরি	রক্তশূণ্যতা	স্কার্ভি	গলগন্ড
ক্যালসিয়াম	আয়োডিন	কোষ্ঠকাঠিন্য	ডায়রিয়া
খাদ্য সংরক্ষণ	রেফ্রিজারেটর	হিমাগার	

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কোন ভিটামিন পানিতে দ্রবণীয় ?

ক. ভিটামিন এ	খ. ভিটামিন ডি
গ. ভিটামিন সি	ঘ. ভিটামিন কে

২. পানি আমাদের দেহের ওজনের কত অংশ ?

ক. ৩ ভাগের ১ অংশ	খ. ৩ ভাগের ২ অংশ
গ. ৪ ভাগের ১ অংশ	ঘ. ৫ ভাগের ২ অংশ

৩. কোনটি শরীরে শক্তি উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা রাখে ?

ক. ইলিশ মাছ	খ. মুরগির মাংস
গ. গোল আলু	ঘ. মিষ্টি কুমড়া

৪. শিশুদের চর্বি জাতীয় খাদ্যের অভাবে

ক. শরীরের ওজন কমে যায়	খ. চামড়া খসখসে হয়ে যায়
গ. এন্টিবডি তৈরিতে বিঘ্ন ঘটে	ঘ. কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ হয়

৫. পাস্তুরাইজেশনের ফলে খাদ্য বস্তু

i. ঠাণ্ডা থাকে
ii. জীবানু মুক্ত থাকে
iii. শুকনো থাকে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i	খ. ii
গ. i ও ii	ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

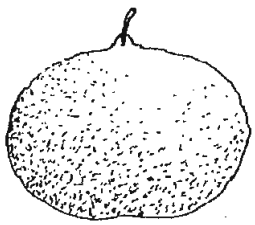

A

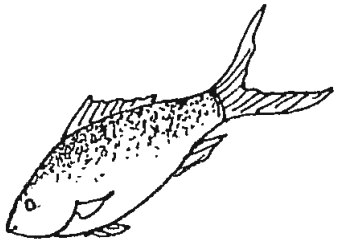

B

C

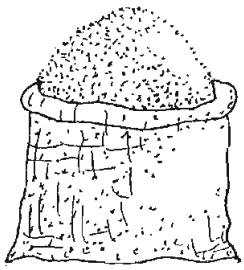

D

ক. শাকে কী জাতীয় খাদ্য উপাদান আছে ?

খ. A চিহ্নিত খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. 'D' চিহ্নিত খাদ্যটি কীভাবে শরীরের ওজন বৃদ্ধি করে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সুষম খাদ্য হিসেবে চিত্রের খাদ্যগুলো উপযোগী কিনা মতামত দাও।

২. বাসুদের বাড়ি বরিশালে। এ অঞ্চলের মানুষ হিসেবে তারা সামুদ্রিক মাছ বেশি খায়। একবার বাসু কয়েকদিনের জন্য তার মামার সাথে রংপুর বেড়াতে গেল। ঐ অঞ্চলে সে কিছু লোক দেখতে পেল যাদের গলার দিকটা ফোলা। বরিশালে সে এ ধরনের লোক দেখেছে বলে মনে করতে পারে না।

ক. বাসুর দেখা রোগটির নাম কী ?

খ. সাধারণত উত্তরাঞ্চলের মানুষের এ রোগটি বেশি হয় কেন ?

গ. কীভাবে এ অঞ্চলের লোকজন রোগটি থেকে মুক্ত হতে পারে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাসু বরিশালে এ ধরনের রোগ কেন দেখেনি কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঊনবিংশ অধ্যায়

জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ। এই দেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। এখানে অনেক লোক বাস করে। আগে এ দেশে এত লোক ছিল না। তোমরা নিচের সারণি–১ মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে বাংলাদেশে বিগত ৬০ বছরের কোন সময় কত লোক ছিল।

সারণি–১

সাল	লোকসংখ্যা
১৯৪১	৪ কোটি ২০ লক্ষ
১৯৫১	৪ কোটি ১৯ লক্ষ
১৯৬১	৫ কোটি ৫২ লক্ষ
১৯৭৪	৭ কোটি ৬৪ লক্ষ
১৯৮১	৮ কোটি ৯৯ লক্ষ
১৯৯১	১২ কোটি ১৪ লক্ষ
২০০১	১২ কোটি ৯৩ লক্ষ*

উপরের সারণি থেকে জানা যায় ১৯৫১ সালে এদেশের জনসংখ্যা কমে যায়। কারণ ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ায় কিছু লোক এদেশ থেকে চলে যায়। কিন্তু ১৯৬১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সময়ে জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। অর্থাৎ এই ৪০ বছরে এদেশের জনসংখ্যা হয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি।

পরিবেশের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

বাংলাদেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর খারাপ প্রভাব পড়েছে। এ প্রভাব গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে।

(ক) গ্রাম অঞ্চল

খাদ্যের কথাই ধরা যাক। যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে সে হারে খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে না। বাড়তি জনসংখ্যার জন্য ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, হাটবাজার, স্কুল কলেজের সংখ্যা বাড়াতে হচ্ছে। ফলে আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ কমছে। পরিণামে মাথাপিছু খাদ্যের উৎপাদন ও পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।

বেশি করে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসল উৎপাদনের জন্য জমিতে সার ও কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ কৃষক নিরক্ষর। তাই সঠিক মাত্রায় তাঁরা সার ও কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করতে পারেন না। ফলে শস্যের ও জমির ক্ষতি হয়। আবার এসব ওষুধের কিছু অংশ বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে পুকুর, খালবিল ও নদীনালায় পতিত হওয়ার ফলে মাছের পোনা মারা যাচ্ছে। এ কারণে দিন দিন আমাদের দেশে মাছ কমে যাচ্ছে। কীট ও রোগনাশক ওষুধ ব্যবহারের দরুন অন্যান্য উপকারী পোকামাড়সহ ব্যাঙের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। ফলে শস্যের জন্য ক্ষতিকর পোকামাকড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতিরিক্ত মানুষের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগানের জন্য পতিত জমি আবাদ করা হচ্ছে। তার জন্য দেশে চারণভূমি ও বনজঙ্গালের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। গো–মহিষ ও ছাগল

---

* বাংলাদেশের আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট ২০০১।

ভেড়ার খাদ্যের অভাব দেখা দিচ্ছে। ফলে এদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশে আমিষের অভাবের এটা একটা বড় কারণ। ধান উৎপাদনে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়ার জন্য ডালের চাষাবাদ কমে গিয়ে আমিষের অভাব আরও বাড়িয়ে তুলছে।

অধিক জনসংখ্যার জন্য বেশি বেশি ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাটের দরকার হচ্ছে। তাই বাগান, বনজঙ্গল কেটে সেখানে নতুন নতুন ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ইত্যাদি তৈরি করতে হচ্ছে। ফলে মাটি আচ্ছাদনহীন হয়ে যাচ্ছে। বন্যা ও বৃষ্টির পানি এই আচ্ছাদনহীন মাটি ক্ষয় করে নদীনালায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বর্ষা শেষ হতে না হতেই এসব নদীনালা, খালবিলের পানি শুকিয়ে যাচ্ছে। তাই পানির অভাবে আশপাশের জমিতে শস্য উৎপাদন ভাল হচ্ছে না।

শীতকালে খালবিলে পানি না থাকায় শস্য উৎপাদনের জন্য গভীর নলকূপের সাহায্যে সেচ দিতে হয়। ফলে মাটির নিচের পানির স্তর দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে। সাধারণ টিউবওয়েলে পানি উঠছে না। গাছপালা প্রয়োজনীয় পানি পাচ্ছে না। এর ফলে গাছপালার সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না। জ্বালানি, ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র তৈরি এবং ইট পোড়ানোর জন্য গাছপালার ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। পরিবেশ ভাল রাখার জন্য প্রয়োজনমত বনায়ন হচ্ছে না। তাছাড়া বনভূমি সৃষ্টির সুষ্ঠু পরিকল্পনাও নেই। উপরন্তু বনভূমি ও অন্যান্য গাছপালা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ফলে বনের পোকামাকড় এখন শস্য খেতে চলে এসেছে। বন্য প্রাণী ও পাখি দিন দিন কমে যাচ্ছে। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি আমাদের দেশের সাধারণ ঘটনায় পরিণত হচ্ছে। অতিবৃষ্টির ফলে বন্যা হয়। বন্যায় ঘরবাড়ির ক্ষতি হয় এবং ফসল নষ্ট হয়। অনাবৃষ্টির জন্য শস্য উৎপাদন সম্ভব হয় না। দেশে খাদ্যভাব দেখা দেয়। মানুষ অর্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটায়। খড় ও ঘাসের অভাবে গো–মহিষ দুর্বল হয়ে যায়। ফলে চাষাবাদের ক্ষতি হয় এবং গাভীর দুধ কমে যায়।

বাংলাদেশে অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে এবং এরা কৃষিজীবী। দিন দিনই জনসংখ্যা বাড়ছে কিন্তু জমি বাড়ছে না। পিতার মৃত্যুর পর তার জমি সন্তানদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হয়ে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে। একই বসত বাড়ি বিভিন্ন অংশীদারের মধ্যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। ফলে পুরানো একটি ঘরের পাশে নতুন নতুন ঘর তৈরি করতে হচ্ছে বা নতুন বসতি তৈরি হচ্ছে। এতে কম জায়গায় বেশি ঘরবাড়ি করতে হচ্ছে ফলে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দিন দিন খারাপ হচ্ছে। বসতি ঘন হলে মুক্ত আলো বাতাসের অভাব হয়। অধিক সংখ্যক লোকের জন্য মলমূত্র ত্যাগের সুব্যবস্থা করা যায় না। এর ফলে লোকেরা যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে। এতে পরিবেশ দূষিত হয়। গ্রামের মানুষ রান্নাবান্না ও গোসলের কাজে সাধারণত পুকুরের পানি ব্যবহার করে। একই পুকুরের পানি অধিক মানুষের গোসল ও গবাদিপশুর গোসলে ব্যবহার করা হয়। ফলে পুকুরের পানি দ্রুত দূষিত হয়ে পড়ে। এই দূষিত পানি দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের কারণে বিভিন্ন প্রকার রোগ ছড়ায়।

(খ) শহর অঞ্চল

জনসংখ্যা বৃদ্ধি কারণে গ্রামের লোকজনের কাজকর্মের অভাব দেখা যায়। তাই গ্রামের মানুষ খাদ্য ও কাজকর্মের খোঁজে আজকাল অধিক হারে শহরে ভিড় জমাচ্ছে। ফলে শহরের জনসংখ্যা দিন দিনই দ্রুত গতিতে বাড়ছে। গ্রাম থেকে কাজের খোঁজে চলে আসা মানুষগুলো শহরে যেখানে সেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিচ্ছে। ফলে শহরে গড়ে উঠছে ঘিঞ্জি ও অস্বাস্থ্যকর বস্তি। তাই আজকাল শহরে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস ইত্যাদি বাড়ছে। পরিণামে শহরের আইন–শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে। অপরদিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করছে বলে তাদের নানা প্রকার রোগবালাই লেগেই আছে।

গত ৪০ বছরে দেশের বড় বড় শহরগুলোতে কী হারে জনসংখ্যা বাড়ছে তার বিবরণ নিচের সারণিতে দেওয়া হল। এই বিবরণ থেকে আমরা শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারি।

সারণি*

শহর	লোকসংখ্যা					মন্তব্য
	১৯৬১ সন	১৯৭৪ সন	১৯৮১ সন	১৯৯১ সন	২০০১ সন	
ঢাকা	৫,২১,৯৪১	১৬,৭৯,৯৭২	৩৪,৪০,১৪৭	৬১,০৫,১৬০	৯৯,১২,৯০৮	৪০ বছরে ১৯ (প্রায়) গুণ বৃদ্ধি
চট্টগ্রাম	৩,৫৪,২০৬	৮,৮৯,৭৬০	১৩,৯০,৬৮০	২০,৪০,৬৬৩	৩২,০২,৭১০	৪০ বছরে ১০ (প্রায়) গুণ বৃদ্ধি
খুলনা	১,২৭,৯৭০	৪,৩৭,৩৪৪	৬,৫২,০০০	৮,৭৭,৩৮৮	১২,২৭,২৩৯	৪০ বছরে ১০ (প্রায়) গুণ বৃদ্ধি
রাজশাহী	৫৬,৮৮৫	৯০,৯০৯	২,৫৩,৭২৬	৫,১৭,১৩৬	৫,৪৬,৭১৬	৪০ বছরে ১২ (প্রায়) গুণ বৃদ্ধি

জনমিতির মৌলিক ধারণা

জনসংখ্যার ঘনত্ব

জনসংখ্যা বলতে কী বোঝায় তা আমরা পূর্বের শ্রেণীতে জেনেছি। কোনো দেশে যত লোক বাস করে তার সংখ্যাকে ঐ দেশের জনসংখ্যা বলে। সব দেশের জনসংখ্যা সমান নয়। সমআয়তনের কোনো এলাকায় বেশি লোক বাস করে, আবার কোনো এলাকায় কম লোক বাস করে। অর্থাৎ লোকবসতি কোথাও ঘন কোথাও পাতলা। ঘন বা পাতলা লোকবসতি বোঝার জন্য একটি এলাকার প্রতি বর্গকিলোমিটারে কত লোক বাস করে তার হিসেব নেওয়া হয়। মনে কর, কোনো গ্রামে ৪০০০ লোক বাস করে এবং ঐ গ্রামের আয়তন ৪ বর্গকিলোমিটার। তাহলে ঐ গ্রামে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কত লোক বাস করবে? ৪ বর্গকিলোমিটারে ৪ হাজার লোক বাস করলে ১ বর্গকিলোমিটারে এক হাজার লোক বাস করে। আবার ৪০০০ লোকের ঐ গ্রামটির আয়তন যদি ৫ বর্গ কিলোমিটার হয় তবে প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোক সংখ্যা দাঁড়ায় গড়ে (৪০০০ ÷ ৫) বা ৮০০ জন। এভাবে কোনো দেশে গড়ে প্রতি বর্গকিলোমিটারে যত লোক বাস করে সে সংখ্যাকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে। মোট লোকসংখ্যাকে মোট আয়তন দিয়ে ভাগ করে জনসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যায়।

$$\text{জনসংখ্যার ঘনত্ব} = \frac{\text{দেশের মোট জনসংখ্যা}}{\text{দেশের মোট আয়তন}}$$

কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব জানতে হলে সে এলাকার জনসংখ্যাকে ঐ এলাকার আয়তন (ক্ষেত্রফল) দ্বারা ভাগ করতে হয়।

উদাহরণ : কোনো এলাকার লোকসংখ্যা ১,২০,০০০ জন এবং ঐ এলাকার আয়তন ১৫০ বর্গকিলোমিটার (১৫ কি.মি. দৈর্ঘ্য ও ১০ কি.মি. প্রস্থ)। ঐ এলাকার ঘনত্ব কত?

সমাধান : জনসংখ্যার ঘনত্ব $= \frac{\text{মোট জনসংখ্যা}}{\text{মোট আয়তন}} = \frac{১২০০০০}{১৫০ \text{ বর্গকিলোমিটার}} =$ ৮০০ জন প্রতি বর্গ কি.মি.

অর্থাৎ ঐ এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮০০ জন। তোমার এলাকার লোকসংখ্যা ও আয়তন জেনে নিয়ে জনসংখ্যার ঘনত্ব বের করতে পার।

* বাংলাদেশের আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট ২০০১।

মাথাপিছু ভূমি

কোনো এলাকায় যতটি পরিবার বাস করে তাদের সবার ভূমি বা জমির পরিমাণ সমান থাকে না। কারও জমি বেশি কারও জমি কম থাকে। ধরা যাক তোমাদের পরিবারের লোকসংখ্যা ১০ জন এবং তোমাদের জমির পরিমাণ মোট ১০ বিঘা। তোমাদের পরিবারের মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ কত? এক্ষেত্রে সহজেই হিসেব করা যায় যে দশ জন লোকের পরিবারের দশ বিঘা ভূমি থাকলে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ হয় এক বিঘা। কোনো এলাকা বা দেশের সমস্ত ভূমি সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন বা ভাগ করে দিলে প্রতি জন মানুষের ভাগে যে পরিমাণ ভূমি পড়বে তাই ঐ এলাকা বা দেশের মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ। মাথাপিছু ভূমিকে গড় ভূমিও বলা হয়। মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ সাধারণত একরে বা হেক্টরে নির্ণয় করা হয়। এক একর সমান ১০০ শতক বা ৪৩৫৬০ বর্গফুট এবং ২.৪৭ একরে এক হেক্টর।

$$\text{মাথাপিছু ভূমি} = \frac{\text{এলাকার মোট ভূমি (একরে)}}{\text{এলাকার মোট জনসংখ্যা}}$$

ধরা যাক, তোমার এলাকার লোকসংখ্যা ২,৪০,০০০ জন এবং মোট ভূমির পরিমাণ ৭২,০০০ একর। তোমার এলাকার মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে।

$$\text{মাথাপিছু ভূমি} = \frac{\text{মোট ভূমি (একরে)}}{\text{মোট লোকসংখ্যা)}} = \frac{\text{৭২০০০ একর}}{\text{২৪০০০০ জন}} = \text{০.৩০ একর বা ৩০ শতক}$$

অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ খুবই কম। ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের মাথাপিছু ভূমি ছিল ০.৩৩ একর। ১৯৯১ সালে তা কমে হয়েছে ০.২৯ একর। ২০০১ সালে ভূমির পরিমাণ কমে হয়েছে ০.২৮ একর। এভাবে কমতে থাকলে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ ভবিষ্যতে আরও কমে যাবে। মাথাপিছু এভাবে কমার কারণ কী? দেশে ভূমির পরিমাণ স্থির থাকছে কিন্তু জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। তাই মাথাপিছু ভূমি কমছে। তোমার বাড়ি বা পাড়ার লোকজনের মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ নির্ণয় করে দেখ এবং অন্য পাড়ার সাথে তা তুলনা কর।

মাথাপিছু আয়

একটি পরিবারের যত লোক থাকে সকলেই উপার্জন করতে পারে না। পরিবারের দুই একজন উপার্জন করলেও সকল সদস্যই তা ভোগ করে। কাজেই পরিবারে দুই একজনের উপার্জিত অর্থ সকলের উপার্জন বলেই বিবেচনা করা হয়। পরিবারের মোট আয় পরিবারের সকল সদস্যের মাঝে সমান ভাগে ভাগ করলে প্রতি জনের ভাগে যা পড়বে তাই ঐ পরিবারের মাথাপিছু আয় বা গড় আয়। এক বছরের আয়ের উপর মাথাপিছু আয় হিসেব করা হয়। তাই মাথাপিছু আয় বলতে বার্ষিক মাথাপিছু আয় বোঝায়। অতএব কোনো এলাকা বা দেশের জনগণের এক বছরের মোট আয়কে সকল জনগণের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিলে প্রতি জনের ভাগে যে আয় পড়বে তাই মাথাপিছু আয়।

$$\text{মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{বার্ষিক মোট আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

ধরা যাক, কোনো পরিবারের চাকরিজীবীর বেতন, ব্যবসায়িক লাভ, জমিজমা বা কৃষিখাত, হাঁসমুরগি, গরুছাগল পালন ইত্যাদি সম্ভাব্য সকল খাত হতে বার্ষিক আয় মোট ১,২০,০০০ টাকা। ঐ পরিবারে ১০ জন সদস্য থাকলে সদস্যদের মাথাপিছু আয় কত?

$$\text{মাথাপিছু আয় (গড় আয়)} = \frac{\text{মোট আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা)}} = \frac{\text{১২০,০০০}}{\text{১০}} \quad \text{টাকা} = \text{১২,০০০ টাকা}$$

তোমার পরিবারের সকল খাতের মোট বার্ষিক আয় জেনে নিয়ে তোমার পরিবারের মাথাপিছু আয় বের কর। এভাবে তোমার পাড়া প্রতিবেশী ধনী–গরিব সকল শ্রেণীর পরিবারের মোট বার্ষিক আয় এবং লোকসংখ্যা জেনে নিয়ে তোমরা পাড়া বা মহল্লার মাথাপিছু আয় বের করতে পার। তাছাড়া শ্রেণীর সকল ছাত্রছাত্রীর পরিবারের মাথাপিছু আয়ের গড় করে তোমাদের এলাকার আয়ের একটা ধারণা পেতে পার।

---

* বাংলাদেশের আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট ২০০১।

তুলনার সুবিধার্থে আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু আয় ডলারে হিসাব করা হয়। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২০০১ সালের হিসাব অনুযায়ী ৩৭৭ ডলার। ২০০১–এ এক ডলার=৫৭.৩৩ টাকা ধরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় টাকায় নির্ধারণ কর। গড় আয় স্থিতিশীল নয়। তা বাড়ে ও কমে। গরিব ও ধনী সকলের মিলিত আয়ের গড়ই কোনো দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়। বর্তমানে দেশের জনগণের মাথা পিছু আয় (জিডিপি) বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭৭ ইউএস ডলার।

এ অধ্যায়ের নতুন শব্দ

আচ্ছাদনহীন
রাহাজানি
মাথাপিছু ভূমি
মাথাপিছু আয়
জনসংখ্যা
জনসংখ্যার ঘনত্ব
আদমশুমারি

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. ১৯৫১ সালে এদেশের জনসংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ কোনটি ?

ক. দেশ ভাগ হওয়া
খ. যুদ্ধ হওয়া
গ. মহামারী হওয়া
ঘ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে অসচেতনতা।

২. কোনো দেশে গড়ে প্রতিবর্গ কিলোমিটারে যত লোক বাস করে সে সংখ্যাকে

ক. জনসংখ্যা বলে
খ. মোট জনসংখ্যা বলে
গ. জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে
ঘ. গড় জনসংখ্যা বলে

৩. এক একর সমান

i. .৪০ শতক
ii. ১০০ শতক
iii. ৪৩৫৬০ বর্গফুট

নিচের কোনটি ঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. i ও iii
ঘ. ii ও iii

৪. মাথাপিছু আয় সমান

i. $\frac{\text{মোট আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$

ii. $\frac{\text{বার্ষিক মোট আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$

iii. দেশে মোট জনগণের বার্ষিক আয় ÷ মোট জনসংখ্যা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

৫. কোন এলাকার লোকসংখ্যা ৩,৬০,০০০ জন এবং মোট ভূমির পরিমাণ ৯৬,০০০ একর হলে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ প্রায় কত একর ?

ক. ০.২৭ খ. ০.২৮

গ. ০.২৯ ঘ. ০.৩০

সৃজনশীল প্রশ্ন

সারণি ১

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

১৯৬১	প্রায়	৫,৫২,০০০০০
২০০১	প্রায়	১২,৯৩, ০০০০০

সারণি ২

শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা			বৃদ্ধি
শহর	১৯৬১	২০০১	
ঢাকা	৫২১৯৪১	৯৯১২৯০৮	১৯ গুণ
চট্টগ্রাম	৩৫৪২০৬	৩২.০২৭১০	১০ গুণ
খুলনা	১,২৭,৯৭০	১২,২৭,২৩৯	১০ গুণ
রাজশাহী	৫৬,৮৮৫	৬,৪৬,৭১৬	১২ গুণ

ক. জনসংখ্যা কী ?

খ. শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বেশি হওয়ার কারণ কী ?

গ. ৪০ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে নির্ণয় কর ?

ঘ. সারণি ২ অনুযায়ী শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব আলোচনা কর।

২. শুভ এবং নাফিজের বাবা একই অফিসে একই পদে সরকারি চাকুরি করেন এবং তাঁরা পাশাপাশি বাসায় থাকেন। শুভর ছোট এক বোন থাকলেও নাফিজের ভাইবোনের সংখ্যা ছয়জন। নাফিজের দাদীও তাদের সাথে থাকে। শুভ ও নাফিজের বাবা প্রত্যেক মাসে ১৬,০০০/ টাকা বেতন পেলেও দেখা যায় মাঝে মাঝে নাফিজের স্কুলে বেতন পরিশোধ করতে অসুবিধা হয়।

ক. নাফিজের পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত

খ. নাফিজের বিদ্যালয়ের বেতন পরিশোধ করতে অসুবিধা হয় কেন ?

গ. নাফিজের বাবার মাথাপিছু আয় নির্ণয় কর।

ঘ. শুভর পরিবারের মাথাপিছু আয় নির্ণয় করে দুইটি পরিবারের পারিবারিক সাদৃশ্য তুলনা কর ?

বিংশ অধ্যায়

এইডস পরিচিতি

আমরা অনেকেই বেশ কিছু কঠিন রোগের কথা শুনেছি। যেমন, যক্ষা একটি কঠিন রোগ। এ রোগে অনেকের মৃত্যু ঘটে। তবে সময়মত চিকিৎসা করালে একজন যক্ষা রোগী সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে যায়। এছাড়া যক্ষার জন্য টিকা আছে, এই টিকা দিলে যক্ষা হয় না। কিন্তু আজ আমরা এমন একটি নতুন রোগ সম্বন্ধে জানবো যার কোনো টিকা বা চিকিৎসা আজও আবিষ্কৃত হয়নি। এ রোগ সারা পৃথিবীতে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। এর নাম এইডস (AIDS)।

এইচআইভি (HIV) নামক একটি ভাইরাস মানুষের শরীরে প্রবেশ করে শরীরের রোগ–প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে ফেলে। এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের রোগ–প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব কমে গেলে সে ব্যক্তি অতি সহজেই নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। এইচআইভি সংক্রমণের এই অবস্থাকেই এইডস বলে। এইডস–এর এখনও কোনো চিকিৎসা নেই বলে কোনো ব্যক্তির এইডস হলে মৃত্যুই তার একমাত্র পরিণতি। এ কারণেই এইডসকে ঘাতক ব্যাধি বলা হয়।

এইডস কীভাবে ছড়ায়, কীভাবে ছড়ায় না এবং আমরা কীভাবে এ রোগ থেকে রক্ষা পেতে পারি সেগুলো সম্বন্ধে আমাদের সকলের ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বিভিন্ন উপায়ে মানবদেহে এইচআইভি ছড়াতে পারে। যেমন:

১) এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করলে

২) ইনজেকশনের একই সুচ ও সিরিঞ্জ একাধিক ব্যক্তি ব্যবহার করলে

৩) এইচআইভি সংক্রমিত মায়ের দুধ পানের মাধ্যমে।

শিক্ষার্থীদের করণীয় (বাড়ির কাজ):

শিক্ষার্থী তার বন্ধু–বান্ধব, আত্মীয়–স্বজন, পাড়া–প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা কখনো স্কুলে যাননি, এইডস সম্পর্কে জানেনা এমন কয়েকজনকে চিহ্নিত করবে। তাদের সাথে এইডস সম্পর্কে আলোচনা করবে এবং তাদের মতামত লিপিবদ্ধ করবে। শ্রেণীতে সহপাঠীদের সাথে এ অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে।

এইডস ছোঁয়াচে নয়। বায়ু অথবা পানির মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায় না। তাই একজন এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা করলে তার সাথে কথা বললে, চলাফেরা বা করমর্দন করলে অথবা একই সাথে খাবার গ্রহণ করলে কারও এইডস হয় না। আরও মনে রাখতে হবে যে, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি মেনে চললে এইডস–এ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

প্রতিদিন সারাবিশ্বে অসংখ্য মানুষ এইডস–এ আক্রান্ত হচ্ছে এবং অসংখ্য মানুষ মারাও যাচ্ছে। নানা কারণে বাংলাদেশের মানুষেরও এইডস–এ আক্রান্ত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সময় থাকতেই আমাদের সবাইকে সতর্ক হতে হবে।

আমরা আমাদের বন্ধু–বান্ধব, সঙ্গী সাথী, পরিবারের সদস্য ও পরিচিতজনদের এইডস সম্পর্কে জানাবো। যেসব উপায়ে এইডস ছড়ায় সেগুলো সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করব এবং অন্যদেরও সতর্ক থাকতে বলব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. একটি ঘাতক ব্যাধি

ক. ইনফ্লুয়েঞ্জা
খ. যক্ষ্মা
গ. এইডস
ঘ. এইচআইভি

২. এইডস আক্রান্ত হওয়ার কারণ

ক. ব্যাকটেরিয়া
খ. দূষিত পানি পান
গ এইচআইভি
ঘ. এইডস রোগীর ছোঁয়া

৩. এইচআইভি/এইডস ছড়ায়

ক. খাদ্যের মাধ্যমে
খ. এইচআইভি সংক্রমিত রক্তের মাধ্যমে
গ. বায়ুর মাধ্যমে
ঘ. এইডস রোগীর সাথে করমর্দনের মাধ্যমে

৪. এইচআইভি (HIV)

i. কয়েকটি রোগের সৃষ্টি করে
ii. শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নষ্ট করে ফেলে
iii. AIDS রোগ সৃষ্টি করে।

নিচের কোনটি ঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

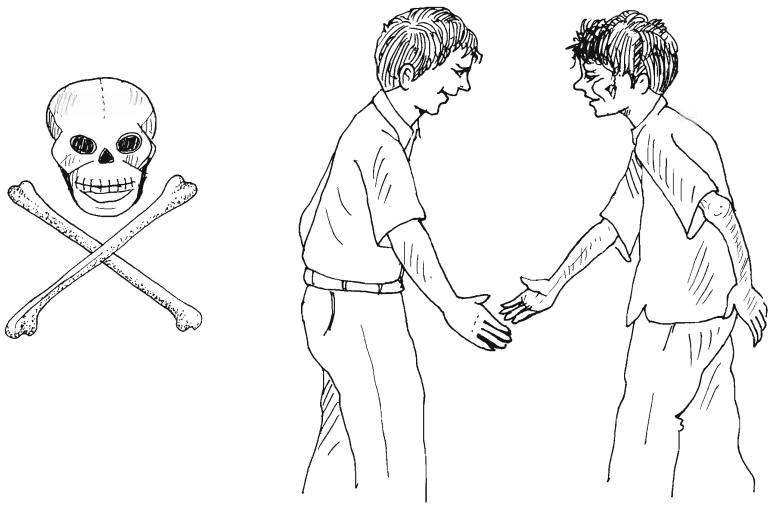

চিত্র

ক. HIV কী ?
খ. 'AIDS' এর নিচে এ ধরনের সংকেত কেন ব্যবহার করা হয়েছে ?
গ. পোস্টারের সুস্থ লোকটির HIV (AIDS) আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. AIDS রোগ সম্পর্কে পোস্টারটির উপযোগিতা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

২০০৯
শিক্ষাবর্ষ

মিতব্যয়ী হওয়া ভালো

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা